অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস: বিংশ শতক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পি. এইচ.ডি
উপাধি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অমিয় কুমার বাউল

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: JU/PHD/History/A00HI0501716

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২২

<u>Certified that the Thesis entitled</u>

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস : বিংশ শতক (Abibhokto Medinipur Jelar Kaibartta Jatir Itihas : Bingsho Satak) submitted by me for the Award of 'Doctor of Philosophy in Arts' at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Mahua Sarkar, Professor, Department of History, Jadavpur University; and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree/diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor	Candidate
___________________	____________________
(Dr. Mahua Sarkar)	(Amiya Kumar Baul)
Professor	PhD Scholar
Department of History	Department of History
Jadavpur University	Jadavpur University
Kolkata 700032	Kolkata 700032

Dated

মুখবন্ধ

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফসল হিসাবে উপস্থাপন করা হল **"অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস : বিংশ শতক"** শিরোনামে। বাংলার জাতি কাঠামোয় কৈবর্তরা এমন একটি জাতি যাদের কর্মকান্ডের একটা দীর্ঘকালীন ইতিহাস আছে। যারা প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় রাজদণ্ড হাতে শাসন করেছে। আবার ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিশেষত বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেও এই জাতি ঔপনিবেশিক তথা তার আগে থেকেই মেদিনীপুর তথা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সেই বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলায় কৈবর্তদের সংখ্যা আনুমানিক মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু এই জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। এখনও এই জাতির বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত। এমনকি এই জাতি আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে এখনও পিছিয়ে পড়া একটি জাতি। তারা তাদের নিজেদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ততটা সচেতন নয়, একইসঙ্গে সংগঠিতও নয়। ঐতিহাসিক, গবেষক মহলও তাদের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তবে অতি সম্প্রতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছে এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে। তাই এই সন্দর্ভে কৈবর্ত জাতির কর্মকান্ডের অনালোচিত, অ-চর্চিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে কৈবর্ত জাতির একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস পুনর্লিখন ও পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাংলার কৈবর্ত জাতি বিশেষত মেদিনীপুর জেলার

কৈবর্তদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমার এই গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণের জন্য যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত সুদূর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর নিকটস্থ বিদ্যুৎহীন প্রত্যন্ত একটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবার থেকে দীর্ঘ দুই দশক পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতকোত্তর পাঠ করতে আসা। তখনই ইতিহাস বিভাগে পড়বার সুবাদে স্নেহ পেয়েছিলাম বিভাগীয় সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-সহ পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দ্বিধায় কথা বলার জায়গা আমাদের প্রিয় অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার ও শুভাশিস বিশ্বাসের সাথে। সেই স্নাতকোত্তর পাঠের প্রায় দুই দশক পরে গবেষণা করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা মহুয়া সরকারের প্রতি। তিনি আমার পছন্দের এমন একটি বিষয় নিয়ে আমাকে গবেষণা করবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে নানান সুপরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণার কাজটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করানোর ব্যবস্থা করেছেন, এজন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

এরপরে প্রথমেই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যকে যিনি আমার মানস সরোবরে গবেষক চিন্তাভাবনার সোপান গড়ে দিয়ে এই গবেষণা কাজের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি করে দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে তিনি আমার গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস ও গবেষণা কর্মের সুচিন্তিত উপদেশ দিয়েছিলেন। আমার সুযোগ ঘটেছিল তাঁর জীবনের অন্তিমকালে দীর্ঘ দশ বছর তাঁর অধীনে অন্যান্য গবেষণাকাজে যুক্ত থাকার। এমনকি তাঁর অবর্তমানে আমার গবেষণা

কাজে সর্বদা মানসিক সাহস এবং আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মহীয়সী অধ্যাপিকা মালবিকা ভট্টাচার্য, তাই তাঁকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বর্তমান গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাসের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ছাড়াও আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, লেখ্যাগার, প্রতিষ্ঠান, জাতি সংগঠনের কার্যালয়ে যেতে হয়েছে। সেগুলি হল- জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী, নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ পাবলিক লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরী, নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ লাইব্রেরী, সেন্টার ফর সোশাল সায়েন্সেস কলকাতা (যদুনাথ ভবন), ডায়মন্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের কার্যালয় ও লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও লাইব্রেরী ও পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এবার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই ঝাড়খন্ড লোক-সংস্কৃতি পরিষদ ও তার কর্ণধার শ্রীমান নবারুণ মল্লিককে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, উদার মনের মানুষ ভ্রাতৃসম নবারুণ কখনো কখনো তার সাধ্যের বাইরে গিয়ে আমার গবেষণা কাজের উপাদেয় নানান মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করে আমাকে ঋণী করেছে। এছাড়া যাঁদের গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন বিবরণ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আবার ব্যক্তিগতভাবে যাদের কাছ থেকে নানারকম তথ্য উপাদান পেয়েছি তাদের সকলকেও জানাই ধন্যবাদ।

এই গবেষণাকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নুপূর দাশগুপ্ত, রঞ্জন চক্রবর্তী, রূপকুমার বর্মণ, কৌশিক রায়, সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রানী ব্যানার্জী, সুদেষ্ণা ব্যানার্জী, দেবজিত দত্ত প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দকে। একইসঙ্গে স্মরণ করি সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক শুভাশিস বিশ্বাসকে, জীবিতকালে তাঁর সহযোগিতা আমার গবেষণা কাজকে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। একইসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের আন্তরিক সহযোগিতার কথা।

এই গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতবর্গের সুপরামর্শ ও উৎসাহ আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তাঁরা হলেন- অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, বিনয় ভূষণ চৌধুরী, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, রোমিলা থাপার, চিন্না রাও জগতি, অমিয় কুমার সামন্ত, অজিত কুমার দন্ড, রজতকান্ত রায়, রণবীর চক্রবর্তী, সুচন্দ্রা ঘোষ, রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, রত্নাবলী চ্যাটার্জী, সুপর্ণা গুপ্ত, রঞ্জিত সেন, সত্যব্রত চক্রবর্তী, সুভাষ রঞ্জন চক্রবর্তী, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণা কর্মকে সফল করার জন্য যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করেছে তাঁরা হলেন – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে কর্মরত আমার সহপাঠী ড. স্বগুনা দত্ত; ডায়মন্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের সভাপতি অপরেশ হালদার ও সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত; অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী কৈবর্ত সমাজের সভাপতি ও বাংলার ও.বি.সি আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা শান্তিরঞ্জন সামন্ত; বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের ভোলানাথ দাস, অষ্টম সাউ, তিমির বরণ হালদার প্রমুখ। তাঁদের সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা কাজে এগিয়ে যেতে যাদের বৌদ্ধিক ও মানসিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুবর ড. শুভ্রাংশু রায় এবং দাদাসম অধ্যাপক অলোক কুমার চক্রবর্তী। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রাতৃ-ভগ্নী-সম অনির্বাণ দাস, শুভঙ্কর দে, পূজা ব্যানার্জী, সোমা নস্কর, শুভদীপ দাস, মৃন্ময় ভারতী, অলোক কোরা, দেবলীনা বিশ্বাস, কৃষ্ণ কুমার সরকার, সঞ্জয় ঢালি, শিল্পা মণ্ডল, প্রসেনজিৎ নস্কর, প্রমুখ সকলেই আমার গবেষণার খোঁজখবর রেখে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। এছাড়া বন্ধুসম দাদা মিহির দত্ত, পুঁথি গবেষক শ্যামল বেরা, বন্ধুবর কৌশিক সাহা, প্রমুখ আমাকে গবেষণায় যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের সম্মাননীয় অনেক সদস্য আমাকে গবেষণা শেষ করার কাজে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাই তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এবার যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন আমার একাদশ বর্ষীয় পুত্র শ্রীমান অর্কপ্রভ (মিশুক) ও অর্ধাঙ্গিনী অর্পিতার কথা। তারা আমার সমস্ত রকম খেয়াল রাখার সাথে সাথে ধীর গতির গবেষণা কাজকে বেশ কিছুটা সচল রাখতে সদাসচেষ্ট থেকেছে। আর তাদের তাগিদেই কাজটা শেষ করা সম্ভব হল। একইসঙ্গে আমার দুই দিদি শিপ্রা, লীলা, ভাই অপূর্ব সকলেই আমাকে মানসিক সাহস জুগিয়ে গেছে, তাই তাদের প্রতিও রইল আমার গভীর ভালোবাসা। সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ কথাটার উল্লেখ না করলেই নয় তা হল আমার পিতা-মাতার কথা। তাদের আশীর্বাদ ও আদর্শ আমার জীবনের পাথেয়। তবে আমার সমাজসেবী শিক্ষক পিতৃদেব সুধীর বাউল বেশ কয়েক বছর গত হয়েছেন আর মাতা শেফালীরাণি আমার শিশুকাল থেকে ছাত্রজীবন পর্যন্ত পড়াশোনায় যেমন খেয়াল রাখতেন। ঠিক সেইরকম ভাবেই এই কাজেও তার অন্যথা হয়নি।

সেই সুদূর গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত গবেষণা-কাজের গতি জিজ্ঞাসা করে নিতেন আর থিসিস জমা করার কথা বলে যেতেন। তাঁদের চরণে রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

কলকাতা
২০২২

অমিয় কুমার বাউল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

সংকেতাবলি (Abbreviations)

AICC	All Indian Congress Committee	সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি।
BJP	Bharatiya Janata Party	ভারতীয় জনতা দল।
BPC	Bengal Provincial Congress	বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস।
CONG	Indian National Congress	ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।
CPI (M)	Communist Party of India (Marxist)	কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া।
FB	Forward Bloc	ফরওয়ার্ড ব্লক।
KPP	Krisak Praja Party	কৃষক প্রজা পার্টি।
MLA	Member of Legislative Assembly	বিধায়ক।
NCBC	National Commission for Backward Class	জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ কমিশন
OBC	Other Backward Class	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী
SC	Scheduled Caste	সিডিউলড কাস্ট বা তপশিলি জাতি।
ST	Scheduled Tribe	সিডিউলড ট্রাইব বা তপশিলি উপজাতি

সংযোজনী সূচি

	পৃষ্ঠা নং
১. বাংলার বিভিন্ন জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ	২৫৬
২. বাংলার কয়েকটি জাতির গড় নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ	২৫৭
৩. মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র	২৫৮
৪. তমলুকে স্বাধীন সরকারের মুখপত্র ‘বিপ্লবী’তে তমলুকে নবযুগ	২৫৯-৬০
৫. বৃহদ্ধর্মপুরাণে ৪১ টি জাতির উল্লেখ	২৬১-৬৩
৬. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ৩৬ টি জাতির উল্লেখ	২৬৪
৭. রাণী রাসমণির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ‘দাশী’ উল্লেখ	২৬৫
৮. রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে ‘দাশী’ উল্লেখ	২৬৬
৯. সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, পেশা – চাষাদি উল্লেখ	২৬৭
১০. সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, জাতি- বৈষ্ণব উল্লেখ	২৬৮
১১. সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, পেশা – মহাজনী উল্লেখ	২৬৯
১২. সরকারি দলিলে জাতি- চাশি কৈবত্ত, পেশা – চাষাদি উল্লেখ	২৭০
১৩. শান্তিরঞ্জন সামন্তের দলিলে জাতি- হিন্দু চাষী কৈবর্ত্য উল্লেখ	২৭১
১৪. অস্পৃশ্যতার শিকার স্বামী বিবেকানন্দ- সংবাদপত্রে প্রকাশ	২৭২
১৫. অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটির প্রচার পুস্তিকা	২৭৩-৭৪
১৬. অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি,নদীয়া জেলার প্রচার পুস্তিকা	২৭৫
১৭. ডায়মন্ড হারবার চাষী-কৈবর্ত সমাজের রাজ্য সম্মেলনের প্রচার পুস্তিকা	২৭৬-৭৭

১৮. বারুপুরের এস.ডি.ও কে লেখা সি.আর.আই-এর সরকারি চিঠি ২৭৮

১৯. সরকারি দলিলে জাতি- চাষী কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মাহিষ্য উল্লেখ ২৭৯

২০. মাহিষ্য সমিতিকে সরকারি চিঠি ২৮০

২১. মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়, সংবাদপত্রে প্রকাশ ২৮১

২২. অনগ্রসর কমিশনের শুনানিতে হইচই, সংবাদপত্রে প্রকাশ ২৮২

২৩. বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আবেদন ২৮৩

২৪. নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ থেকে গবেষকের তোলা কিছু প্রাসঙ্গিক ছবি ২৮৪- ৩০০

পারিভাষিক শব্দাবলী (GLOSSARY)

অন্ত্যজ : ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের জাতিদের অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অসৎশূদ্র বলা হয়।

অসৎশূদ্র : সমাজের নীচু শ্রেণীর শূদ্রদেরও নীচে অবস্থান করে যে জাতি।

আদমশুমারি : জনগণনা / লোকগণনা।

কৈবর্ত : বাংলার একটি প্রাচীন জাতি, তার মধ্যে হালিক, জালিক আছে।

চাষা : বাংলার কৃষক শ্রেণীকে এই নামে ডাকা হয়।

জাতি : একই চারিত্রিক বৈশিষ্টযুক্ত/ একই পেশাভুক্ত গোষ্ঠী।

জালিয়া কৈবর্ত : কৈবর্তদের যে গোষ্ঠী মূলত মৎস চাষ/ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

তীবর বা ধীবর : মৎস্য ব্যবসায় নিযুক্ত / নৌকা চালনা করে।

নবশাখ : মোটামুটিভাবে বলা যায় সৎশূদ্রদের, এদের নয়টি শাখা ছিল।

পাটনি : বাংলার এক মৎস্যজীবী গোষ্ঠী/নৌকা চালানো যাদের পেশা।

বর্ণ : বৈদিক সমাজে চারটি ভাগ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে বোঝায়।

ভদ্রলোক : মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তি।

মাহিষ্য : কৈবর্তদের যে গোষ্ঠী মূলত চাষাবাদ করে সেই চাষী কৈবর্তদের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের নতুন নামকরণ করে।

শূদ্র : বৈদিক সমাজ ভাগের ফলে সবচেয়ে নীচুতে শূদ্রদের অবস্থান করে।

হালিয়া কৈবর্ত : কৈবর্তদের যে গোষ্ঠী মূলত চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i - vi
সংকেতাবলী	vii - vii
সংযোজনী সূচি	viii - viii
পারিভাষিক শব্দাবলী	ix - ix
ভূমিকা	১ – ২৭
প্রথম অধ্যায় : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কৈবর্ত জাতির পরিচয়	২৮– ৫১
দ্বিতীয় অধ্যায় : জনগণনার নিরিখে কৈবর্ত জাতির সংখ্যাতত্ত্ব	৫২– ৮৬
তৃতীয় অধ্যায় : কৈবর্ত জাতির রাজনৈতিক জীবন	৮৭ –১৮৩
চতুর্থ অধ্যায় : কৈবর্তদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন	১৮৪–২৪০
উপসংহার	২৪১– ২৫৫
সংযোজনী :	২৫৬– ৩০০
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী:	৩০১– ৩২২

ভূমিকা

বিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশক থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে ভারত ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র নতুন নতুন দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। শুধুমাত্র রাজকাহিনীর ইতিহাস লেখার গন্ডী ছেড়ে একবিংশ শতকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত সমস্যাগুলি নিয়ে এমনকি আঞ্চলিক বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিস্তারিত চর্চা ও গবেষণা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই নতুন নতুন বিষয় বৈচিত্র এখন নতুন নতুন তথ্যে, তত্ত্বে ও বিশ্লেষণের নানান ভঙ্গীর দ্বারা আজ ইতিহাসচর্চা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাত ব্যবস্থা বিদ্যমান বহুকাল আগে থেকেই। তবে সমাজের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সময়ে। ঔপনিবেশিক আমলের ভারতের সামাজিক বিন্যাস একরকম। আবার প্রাচীনকাল বা ঋকবৈদিক যুগ বা পরবর্তী যুগে সমাজে বর্ণব্যবস্থার রূপ বা বৈশিষ্ট্য আরেক রকমের ছিল। বর্তমানে জাতি নেশন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু অন্য অর্থে সামাজিক জাতব্যবস্থায় জাতি বলতে একই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে একটি জাতি বা জনজাতি বোঝায়। যেমন কৈবর্ত জনজাতি। ১৮৭২ সাল থেকে জনগণনার সময় থেকে বিভিন্ন জাতির বিবরণ সরকারি

বিবরণে আমরা দেখতে পাই, সমকালীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু বা অন্যান্য লেখকদের দ্বারা বাংলার জাতব্যবস্থার বেশকিছুটা পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

কোন জাতি বা গোষ্ঠী সময়ের সাথে সাথে উত্থান বা পতন স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সমগ্র জাতি যখন তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তখন তার পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সেরকমই কৈবর্ত জনজাতির ক্রমাবনতির কারণ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। পরবর্তীতে কৈবর্ত জনজাতির বদলে কৈবর্ত জাতি বলেই উল্লেখিত হয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলার তথা মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির বেশকিছু সংখ্যক মানুষ নেতৃত্ব দেয় ও বিশাল সংখ্যক মানুষ আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে। এমনকি তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষত বাংলা প্রদেশে বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়, যা ইংরেজ সরকারের ভিত নড়িয়ে দেয় এবং স্বাধীনতার পথকে মসৃণ করে তোলে। কিন্তু পরবর্তী ধাপে বা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই এই জাতির আন্দোলন তথা নিজেদের উন্নতির জন্য কোন সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নজির চোখে পড়ে না।

১৮৭২ সালে যখন জাতিভিত্তিক, পেশাভিত্তিক জনগণনা শুরু হয় তখন থেকে আমরা বিভিন্ন জাতির মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান লক্ষ্য করতে পারি। তেমনই কৈবর্ত জাতির ক্ষেত্রে প্রতিটি জনগণনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। আবার ১৯৩১ সালের পরে জাতিভিত্তিক আলাদা আলাদা নির্ঘন্ট পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র জেলে কৈবর্তদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। তবে ঔপনিবেশিক আমলের আদমশুমারিগুলিতে দেখা যায় এই কৈবর্ত জাতি

বাংলা প্রদেশে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিচিত আর দ্বিতীয় স্থানে দেখা যায় নমঃশূদ্র জাতিকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী জনগণনাগুলিতে আর জাতিভিত্তিক সমীক্ষার উল্লেখ না থাকার ফলে তার বিশদ বিবরণ সেভাবে পাওয়া যায় না। বিশেষত ১৯৩১ এর পর আমরা সেভাবে আলাদা আলাদা করে জাতির বর্ণনা পাই না। তবে রাজনৈতিক কারণে সামাজিক আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে এই জাতির মধ্যে একটি বিভাজনের সৃষ্টি করা হয়। একইসঙ্গে পরবর্তী সময়ে সেরকম কোন যোগ্য নেতৃত্বও লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলায় এখনও পর্যন্ত নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা উপযুক্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা কিছু নূতন পরিভাষার ব্যবহার শুরু করতে পারি। প্রথমত, বর্তমানে বহুচর্চিত বিষয় হল social exclusion. এই শব্দ প্রচলিত হয়েছে কেননা social exclusion studies UGC দ্বারা স্বীকৃত একটি বিষয় হয়েছে গত কয়েক বছর হল এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পঠন পাঠন চলছে। এছাড়া ১৯৯০-এর দশক থেকে টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ সোশ্যাল সায়েন্সেস(TISS)-এ সেন্টার ফর স্টাডি অফ সোশ্যাল এক্সক্লুশেন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ পলিসিস বিভাগ রয়েছে। আবার USPSWA রয়েছে যার উদ্দেশ্য হল তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা, তেমনই সেন্টার ফর দলিত অ্যান্ড ট্রাইবাল স্টাডিজ রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস এর অধীন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড

এক্সক্লুশেন(CSDE) স্থাপিত হয়েছে। আমাদের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেননা দেখা যায় যে নানা জাতি ও উপজাতি আধুনিক যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের পর থেকে দুইটি পন্থায় উন্নীত হয়েছে, এবং নিজেদের জাতিভিত্তিক উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সূচক তালিকায় আরো উঁচুতে স্থান দাবী করেছে। এই দুইটি পথের একটি হল তথাকথিত উচ্চতর জাতি বা প্রজাতির (caste or sub-caste) অনুকরণ বা অনুগমন করা। যথা, ভূমিজরা এই ধারায় পশ্চিমবঙ্গে কিছু উচ্চতর জাতি অনুকরণ করেছে, যথা সামাজিক উৎসবে নারী-পুরুষ মিলিত নৃত্যগীত পরিত্যাগ করা, মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য পরিহার করা, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিয়োজিত পুরোহিতদের ভূমিজ উৎসবে পৌরোহিত্য করার দায়িত্ব দেওয়া, বিবাহকালে নিজ নিজ জাতি সমাজের নিয়ম মেনে নেওয়া ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে তথাকথিত নীচু জাতি উচ্চতর জাতির সামাজিক ও ধার্মিক আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে বা অনুগমন দ্বারা উচ্চবর্ণের হিন্দু আচার ব্যবহারের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন করে। এইভাবে, অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে হিন্দু সমাজ বহির্ভূত নানা প্রজাতির কালক্রম নিজেদেরকে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত করে নেয়, যদিও পুরাকালে তাদের সেই অবস্থান ছিল না অথবা তর্কাতীত ছিল না। যাই হোক তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি বা প্রজাতি উন্নতির আরেকটি পন্থা ছিল সেটা হল নিম্নবর্ণস্থ অবস্থানের বিরুদ্ধতা করে বিপ্রতীপ পন্থায় নিজ অবস্থান স্থির করা। এইখানে মনে রাখতে হবে যে social exclusion অথবা সামাজিক বিপ্রকর্ষণ হিন্দু সমাজে জাতির স্থান নির্দেশে একটি পন্থা। সেই পন্থায় কোন জাতি বা প্রজাতি নিজেদের বিপ্রকর্ষিত বা excluded অবস্থান মেনে নিয়ে নিজেদের অভিধা, জাতীয় ইতিহাস, আচার-ব্যবহার,

সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সেই ভিন্নতার সংজ্ঞা (definition) অনুসারে ক্রমে নির্ণীত হয়। যথা দেখা যায় পূর্ব বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী কোন উচ্চতর জাতির অনুকরণ না করে নিজেদের ভিন্নতর আত্মপরিচিতি তৈরী করে। সুতরাং দেখা গেল এই আরেকটি পন্থা অর্থাৎ বিপ্রতীপ পথ একদিকে, যে পথ নিয়েছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। অপরদিকে দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পথের অনুগমন করেছে কোন কোন জনগোষ্ঠী, যথা, পশ্চিমবাংলার ভূমিজ জাতি।

১৮৭০ দশক থেকে বঙ্গদেশে তথা মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্ত, মাহিষ্য, হেলে কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উপরোক্ত দুটি প্রবণতাই দেখা যায়। একদিকে অনুগমনের পথ, যে পথে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সমকক্ষতা দাবী করা চলে। যথা- যারা নিজেদের মাহিষ্য নামে পরিচিতি দিয়েছে অনেক সময় এবং অপরদিকে বিপ্রতীপ পন্থায় অনেকে নিজেদের জেলে কৈবর্ত নামে পরিচিতি দিয়ে চাষী কৈবর্তদের(মাহিষ্য) চেয়ে নিম্নস্থানে অবস্থান করেছে।

অষ্টাদশ শতক থেকে দেখা যায় যে কৈবর্ত জাতির একটি অংশ একদিকে যেমন তাদের নিজেদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দরুণ (যথা মৎস্যজীবিদের যা করণীয়), অন্য অংশ সাধারণ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর নিত্যকৃত চাষাদি করে সাধারণ কৃষিজীবীদের অংশই থেকে গেছে। এই দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীকে চাষী কৈবর্ত এবং প্রথমটিকে জেলে কৈবর্ত অভিধা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় বাংলা প্রদেশের একটি আদিম জনগোষ্ঠী কৈবর্তদের উদ্ভব, পরিচিতি, অবস্থান, জাতি পরিচয়, জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাংলা প্রদেশের বিশেষত: অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর ওপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা আঞ্চলিক ইতিহাস বা local historyর অন্তর্গত হলেও গবেষণা প্রশ্নে বাংলার ইতিহাসে নিম্নজাতির অবস্থান সম্পর্কে নানা নতুন প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বর্তমানের মার্ক্সীয় ও সাব-অলটার্ন ঐতিহাসিকরা ইতিহাসে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবদান সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে কৈবর্তদের ইতিহাস অনুসন্ধান ও প্রশ্নের মাধ্যমে বর্তমান গবেষক বহু অনালোচিত দিককে তুলে ধরেছে। যেমন –

১. বাংলার ইতিহাসে উল্লেখ্য সময়কালে কৈবর্তদের আত্মপরিচয় কিভাবে নির্মিত হল?

২. আত্মপরিচয় নির্মিতি তাদের ক্ষমতায়নকে কতদূর প্রতিষ্ঠা দিল?

৩. এই আত্মপরিচয় ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক জাতীয়তা ও স্বাধীনতা-পূর্বের রাজনীতির কি সম্পর্ক ছিল?

৪. সংঘবদ্ধতার অভাব কি কৈবর্তদের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য না কি স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে জাতি ইতিহাসের নানা জটিলতার কারণে তারা ক্রমশ পশ্চাৎপর হতে শুরু করেছিল?

৫. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পর মেদিনীপুরের কৈবর্তরা কলকাতার অভিজাত নাগরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে কি ক্রমাগত হার মানে?

৬. সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বর্তমানে কৈবর্তদের অবস্থান কোথায়?

গবেষণার পরিধি ও সময়সীমা:

এই গবেষণা সন্দর্ভটি ভৌগোলিক দিক থেকে ঔপনিবেশিক বাংলার বিশেষত পশ্চিম অংশের সমুদ্রউপকূলবর্তী বৃহত্তম জেলা অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যদিও ২০০১ সালে এই জেলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে। আবার ২০১৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এলাকা নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা গঠিত হয়েছে। কিন্তু অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাই আমার গবেষণার ক্ষেত্র।

গবেষণাকর্মের সময়কাল বিংশ শতক। সময়কাল বিংশ শতক করার কারণ হল পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনে বিংশ শতকের শুরু থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে কৈবর্তদের সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। বিশেষত জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। কৈবর্তদের আধুনিক ইতিহাস এই সময়কাল থেকেই জানা যায়। এই পুরো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে কৈবর্তদের জীবনচর্যা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে বিশ্লেষণ করা, বিশেষত বিংশ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অবদানকে তুলে ধরা এবং একইসঙ্গে আদমশুমারি ভিত্তিক কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করাও আমার এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদান:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণে বেশকিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে জাতিচর্চা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার, লেখ্যাগার, জাতি সংগঠনের কার্যালয়, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সঠিক শব্দচয়নের মাধ্যমে গবেষণা কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার মূল উপাদানগুলি হল – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার ও সেখানকার আদমশুমারির রিপোর্টগুলি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী, নিমতৌড়ী স্মৃতিসৌধ পাবলিক লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরী, নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, ঝাড়খন্ড লোক-সংস্কৃতি পরিষদ, ডায়মন্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের কার্যালয় ও লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকের কাছ থেকে নানারকম তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনী মেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেট থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের **ভূমিকায়** সমাজের নিম্নবর্ণের ইতিহাসচর্চা কবে থেকে শুরু হল এবং গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস দেখানো হয়েছে আর **প্রথম অধ্যায়ে** কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি, পরিচিতি ও বাংলার জাতি কাঠামোয় কৈবর্তদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলের ও তার পূর্বের তথ্যের ভিত্তিতে কৈবর্ত জাতির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** তুলে ধরা হয়েছে জনগণনার নিরিখে কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যান, বিশেষত ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। কেননা পরবর্তীতে জনগণনাগুলিতে জাতিভিত্তিক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ হত না। তাই ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশ-সহ অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাতেও কৈবর্তরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল মূলত সেই সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

সুদূর অতীতে কৈবর্ত রাজাদের রাজদণ্ড হাতে রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান ও বিভিন্ন কার্যকলাপে কৈবর্তদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মতো। এমনকি গান্ধীবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে মেদিনীপুরের কৈবর্ত মনীষীদের আত্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য। কৈবর্ত সমাজের শত-সহস্র নরনারী তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা

আন্দোলনকে তরান্বিত করেছিল – এই সমস্ত ঘটনাবলীই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সন্দর্ভের **তৃতীয় অধ্যায়ে**।

আর **চতুর্থ অধ্যায়ে** বাংলা প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৈবর্ত জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তন তথা ধর্মীয় জীবনচর্যা ও কৃষ্টিকে নিপুণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সবশেষে **উপসংহারে** স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৈবর্তজাতির অবস্থান তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরে সংবিধান রচনা ও পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন কমিশন গঠনের মাধ্যমে এই কৈবর্ত জাতির অবস্থান দেখানো হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে দ্বিখন্ডিত কৈবর্তদের দুটি অংশের একটিকে তফশিলী জাতি ও অন্যটিকে অনগ্রসর জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে বিংশ শতকের শেষ দশকে দ্বিতীয় অংশটির মধ্যে চাষী কৈবর্তদের অনগ্রসর জাতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু চাষী কৈবর্তদের মধ্যে মাহিষ্য নামাঙ্কিত (কৈবর্ত) জাতিকে উন্নত জাতির অজুহাতে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দ্বিতীয় অংশটিও নিজেদের অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণার দাবী জানিয়ে আসছে। সারা বাংলা জুড়ে কৈবর্তদের বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন নথি ও সূত্রের ভিত্তিতে তাদের বক্তব্য দুটি ভাগ হলেও তা একটি জাতিরই অংশবিশেষ। এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত ঘটনারই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণার দিকে ফিরে দেখা:

জাতি সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণা ও চর্চা কতটা হয়েছে বিদেশী এবং দেশীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তা দেখে নেওয়া দরকার। ভারতবর্ষ হল জাতিতত্ত্ব আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র। ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম জন এলিয়ট ভারতীয় জাতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন(১৭৯২ খ্রী.)। এরপর ক্যাপ্টেন রেণলন্ডস(১৮৪৯ খ্রী.), ড. জে.ম্যাক্.রে(১৮০১ খ্রী.), ওয়ালটার্স (১৮৩২খ্রী.),উইলকক্স (১৮৩২ খ্রী.), ইয়ুল (১৮৪৪ খ্রী.), হজসন (১৮২৮-৫৬ খ্রী.), রাউলাট (১৮৪৫ খ্রী.), জন ডালটন (১৮৪৫ খ্রী.) প্রমুখ পন্ডিতবর্গ ভারতের বিভিন্ন জাতিবিষয়ে বিশদে গবেষণা করেছেন। এরপর ব্রিটেনে জাতিতত্ত্ব নিয়ে জোরদার গবেষণা শুরু হয়। ফলে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডনে। আর ১৮৭৪ সালে ‘অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি’ ও ‘এথনোলজিক্যাল সোসাইটি’ আলাদা না করে ‘অ্যানথ্রোপলজিক্যাল ইনস্টিটিউট’ নামে পথ চলা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে কীন, বোয়াস, রাসেল, ব্রাইস, লেফেভর, হাডন প্রমুখ বেশকিছু পন্ডিতবর্গ জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় জাতিতত্ত্ব বিষয়ে শরৎচন্দ্র রায় ও শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বিশেষ দিক উন্মোচন করে বেশকিছু তথ্যের সন্ধান সংগ্রহ করেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে আর্য নামে একটি জাতির পরিচয় দেন ম্যাক্সম্যুলর। এই জাতি গৌরবর্ণ ও সুসভ্য বলে অভিহিত। তিনি বলেন এই জাতি দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিমে সভ্যতা বিস্তার করতে করতে ভারতে, পারস্যে, আর্মেনিয়ায় ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে

পড়ে। আনুমানিক ১২০০ খ্রী.পূ. এই যোদ্ধা জাতি উত্তর ভারত জয় ও অধিকার করে ভারতের আদিম অধিবাসীদের জায়গায় নিজেরা বসবাস শুরু করে। আর এই পরাজিত তথাকথিত বর্বর জাতিগুলিকে তারা বশীভূত করে ও তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। আদিমজনেদের তারা দাস বা দস্যু নামে পরিচিত করে। তবে দক্ষিণ ভারতে এই আর্যরা যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারতে বিজেতা আর্যগণ নিজেদের ধর্মবিশ্বাস এখানে প্রচলন করার চেষ্টা করে। এগুলি হিন্দু পুরাণ (mythology) নামে পরিচিত। এই আর্যরা বৈদিক ভাষায় কথা বলত। ১৭৮৬ খ্রী. স্যার উইলিয়াম জোন্‌স(William Jones) প্রমাণ করেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান ও কেলটিক একটি বিশিষ্ট ভাষা থেকে উৎপন্ন। ১৮৩৫ সালে বপ্‌ (Bopp) এই মতের সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখান। তাই বেদের অনেক মন্ত্রেই এই দাস বা দস্যুদের নিন্দা করা হয়েছে। তবে বেদ ও বৈদিক মন্ত্রগুলি যে আর্যদের নিজেদের উপকারের জন্যেই রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বেদ থেকে বোঝা যায় যে আর্য ও দাস বা দস্যুদের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল সভ্যতা বা জাতিগত পার্থক্য নয়, তা হল ধর্মগত পার্থক্য। আর্য ও দাস বা দস্যু শব্দ ঋক্‌বেদ সংহিতায় বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই দস্যুদের অব্রত, অন্যব্রত, অপব্রত বলা হয়েছে ঋক্‌বেদের বিভিন্ন সুক্তে। এছাড়া দস্যুরা অয়জবান বা যজ্ঞ করে না, আরাধনা করে না, এমনকি ব্রাহ্মণ পুরোহিতও রাখে না। এইভাবে ঋকবেদের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এই দাস বা দস্যুরা যাদু বা মন্ত্রের ব্যাপারে দেবতাকে কোন আমল দিত না। এইভাবে দেখা যায় ঋকবেদের বিভিন্ন স্থানে দাস বা দস্যুদের সাথে আর্যদের বিবাদ লেগেই থাকত আর সেটা ধর্ম ও পূজাপদ্ধতি নিয়ে, কোন

জাতিগত ঝগড়া নয়। আসলে আর্যরা এদেশের আদিম অধিবাসীদের হীন চোখে দেখত। তবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র বসু দেখিয়েছেন যে দাস বা দস্যুগণের প্রাধান্য ও অবস্থা আর্যগণ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিল না।[১] আসলে বাংলার যে সমস্ত জাতিকে আজ আমরা হীন, দুর্বল, বর্বর, অসভ্য বলে মনে করি, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে অনেক জাতি শ্রেষ্ঠ, সমুন্নত ও সুসভ্য ছিল। আজ আমরা যাদের অবহেলার পাত্র ভাবি দেখা যাবে কোন সময় এদেরই মধ্যে কোন কোন জাতি আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। রাজদন্ড হাতে নিয়ে রাজ্য শাসন করেছে। বাংলার কৈবর্ত জাতি এরকমই একটি জাতি যারা বিভিন্ন সময়ে রাজপদ লাভ সহ সিংহাসনে আরোহণ করেছিল। এই বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে নানা জাতির বাস, নানা ভাষার প্রচলন। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি – নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান......। তা সত্ত্বেও এই বিভিন্ন জাতির বিভিন্নতার মধ্যেও একতা বর্তমান রয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য স্থানীয় অনার্য তথা লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যদের বিরোধের সূত্রপাত। উত্তর ভারতীয় আর্যভাষীরা অনিবার্য সামাজিক কারণে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলার তথাকথিত কৌমের বাসিন্দা বা দস্যুদের অধিকাংশ মানুষকে তাদের কল্পিত অজুহাতে শূদ্র পর্যায়ে ঠেলে দেয়। তাঁর বাইরেও বহুসংখ্যক মানুষকে এই সংস্কৃতির বাইরে রেখে দেওয়া হয়। সমাজে সব সময়ই সাধারণ ও অনুন্নত দুর্বল মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সমাজের মুষ্টিমেয় আর্থিক বলবান মানুষদের সেবা করেও যথেষ্ট মর্যাদা পেত না। উপরন্তু

তাদেরকে সমাজের বাইরে অস্পৃশ্য ও ব্রাত্য করে রাখা হত। এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীই সমাজ ব্যবস্থার নীচের দিকে শূদ্র রূপে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদেরই পূজা-অর্চনা, উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে আর্য রঙে রাঙিয়ে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আর্য পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস কেমন ছিল, তারা কোন কোন দেবদেবীর পূজা করত? বাংলার আদিম অধিবাসীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে যে উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি পালন করত সেগুলির অনেককিছুই আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কিছুটা বা সংস্কার করে বা কিছু কিছু অপরিবর্তিত রেখেই গৃহীত হয়েছে। সেজন্য আদিম অধিবাসী উপজাতিদের সেইসমস্ত লৌকিক আচার অনুষ্ঠান আজও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজা অনুষ্ঠানে দেখা যায়। এগুলির সপক্ষে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ, কবিতা, পুরাণ-স্মৃতিগ্রন্থে, শাসনপট্টে, পোড়ামাটির ফলকের উৎকীর্ণ চিত্রে, চর্যাগীতিতে – তৎকালীন সমাজের ও এর বাইরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বভাব, আচার আচরণের অনেক চিত্র, জীবন-জীবিকার আংশিক বা বিস্তৃত বিবরণ পেয়ে থাকি। এছাড়া খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাকর সংকলিত কবিতা ‘সুভাষিত রত্নকোষ’, এতে আজ থেকে প্রায় হাজার বছর বা তার বেশী সময় আগে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা ও এইসমস্ত সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার বিবরণ জানা যায়। এই একই সময়ে রচিত মোট ২৩-২৪ জন চর্যাকারদের মধ্যে সিংহভাগই ছিলেন সামাজিকভাবে অপাঙতেয় বা সমাজের ব্রাত্য শ্রেণীর। এখানে নাথযোগী লুইপাদ মীননাথকে ধীবর বংশজাত বলা হয়েছে।[২] আবার শ্রীধর দাস সংকলিত ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ বাংলা সাহিত্যের অসামান্য অবদান। এই গ্রন্থের কবিতার কবিরা বেশীরভাগ অজ্ঞাত ও

অশিক্ষিত। তারা যে পদ, গান বা কবিতা লিখতেন সেগুলি ছিল যেন মাটির প্রদীপ। সেসময়কার জনসাধারণের জীবনচিত্র, বাংলার মানুষের সুখদুঃখের কাহিনীর প্রতিফলন পাওয়া যায়। এই সংকলিত গ্রন্থ (আনু. ১২০৫ খ্রী.) লক্ষণ সেনের পৃষ্ঠপোষণায় সম্ভব হয়েছিল। প্রায় পাঁচশো কবির বিভিন্ন বিষয়ক ২৩৮০টি কবিতা সম্বলিত এই বৃহৎ গ্রন্থ তৎকালীন ইতিহাসচর্চার এক অমূল্য সম্পদ। সহস্রবর্ষ পূর্বে সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ'-এর প্রায় সবগুলি কবিতাই এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন কবি। কৈবর্ত কবি পপীপের বেশকিছু কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলার সমতল ভূমির সর্বত্র প্রবাহিত অসংখ্য জলধারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এগুলি বাংলা ও বাঙালির শ্রীবৃদ্ধি যেমন ঘটিয়েছে তেমনি বাঙালি জীবনকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তবে বাঙালির জীবনে নিম্ন শ্রেণী ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ভূমিকা যতটা ব্যাপক, বাংলা সাহিত্য তথা বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর প্রতিফলন কিন্তু নগণ্য। আমরা প্রাচীনকালের বিভিন্ন তথ্য যেমন- অর্থশাস্ত্র, কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশাবতারচরিত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে আমরা সমাজের নীচুতলার দরিদ্র মানুষের প্রতি শোষণ, বঞ্চনা আর পীড়নের কথা জানতে পারি। তেমনি মধ্যযুগের ভারতেও প্রজা অসন্তোষ, বিদ্রোহ বা বিভিন্ন ধরণের প্রতিবাদের কথা আমরা জানতে পারি। আবার মোগল শাসনকালে স্থানীয় শাসকের অত্যাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সমাজের প্রান্তিক মানুষ জেলে-চাষী-নমঃশূদ্রদের জোটবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিবাদের প্রমাণ পাওয়া যায় মৈমনসিংহ গীতিকার 'রাজকন্যা রূপবতী' পালায়।[৩] শোষণ পীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ-প্রতিবাদের এই ধারা ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের

সময়েও বজায় ছিল। সেখানে স্থানীয় জমিদার, মহাজনদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দলিত শোষিত মানুষের গর্জে ওঠার ঘটনার প্রচুর উদাহরণ আমরা পেয়ে থাকি। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসমূহের মধ্যে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম দত্ত বিরোচিত 'ভাস্কর পরাভব' গ্রন্থে অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ দশকে মারাঠী বর্গীদের আক্রমণ, অত্যাচার ও ভয়াবহ নৃশংসতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রাঢ়বঙ্গে বর্গীর এই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কার্যকলাপই এই গ্রন্থে গ্রন্থিত। গঙ্গারামের বর্ণনায় পাওয়া যায় –

'তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল/ জত গ্রামের লোক সব পলাইল।।

....

কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি/জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি।।

চাসা কৈবর্ত জত জাএ পলাইঞা/বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া।।'[৪]

অর্থাৎ এখানে বর্গী লুঠতরাজ ও আক্রমণের আতঙ্কে সাধারণ মানুষের ছোটাছুটি ও পালানোর কথা বলা হয়েছে। আমরা সমাজের কামার-কুমোরের সাথে জেলে কৈবর্ত ও চাষা কৈবর্তদের লাঙ্গল-গোরু নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা কবি তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে কবি এখানে বিদেশী বর্গী আক্রমণের নিষ্ঠুর উৎপীড়নের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন।

অতুল সুর তাঁর 'বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে বিভিন্ন জাতির মাথার বিন্যাস ও নাসিকার দৈর্ঘ্য, দেহের দৈর্ঘ্য পরিমাপ সম্পর্কে তুলে ধরেছেন।[৫] (সংযোজনী **পৃ. দ্রষ্টব্য)**। আমরা কৈবর্ত জাতি-সহ বেশকিছু জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে

পারি। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৈবর্ত জাতির শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭.৫ এবং নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৬.৬। আর তাদের উচ্চতা বা দেহদৈর্ঘ্য ১৬২.৯ সে.মি.। আবার অন্যদিকে আমরা বাংলার বিভিন্ন জাতির শির ও নাসিকার সূচক-সংখ্যা সমূহের দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[৬] **(সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য)।** এখানে কৈবর্ত, গোয়ালা ও পোদেদের বিস্তৃত শিরস্কতা অনেক কম, কিন্তু নাক বেশী প্রসারিত এবং দেহদৈর্ঘ্য গোয়ালাদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কম। আবার কৈবর্তদের চেয়েও কম পোদেদের। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত। তথাপি তারা নাতিদীর্ঘ শিরস্ক ও কৈবর্তদের চেয়ে দেহদৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। তবে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সামান্য হেরফের থাকলেও কয়েকটি বিশেষ জাতির মধ্যে আমরা একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করতে পারি। যেমন – কৈবর্ত, গোয়ালা ও পোদ জাতি একই শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রায় একইরকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) তাঁর নৃপরিমাপমূলক (Anthropometric) গবেষণায় বাংলার আদিম জাতিগুলির জনতত্ত্ব ও বিন্যাস তুলে ধরেছেন। তিনিও কৈবর্ত জাতির নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

বাংলার সমাজচিত্র কিছু সাহিত্যিকের কলমে উঠে আসে যা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। উনবিংশ ও বিংশ শতকে বেশকিছু লেখক ও সাহিত্যিক যারা সমাজ সচেতন, সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের কথা; তাদের যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাদের লেখনীতে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৪-১৯৫০) পথের পাঁচালি(১৯২৮), আরণ্যক(১৯৭৬); মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬)

পদ্মানদীর মাঝি(১৯৩৬); তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৮-১৯৭১) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা(১৯৪৭); দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত(১৯৮৮) থেকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সমাজচিত্র উঠে আসে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের মতো অদ্বৈত মল্লবর্মণের(১৯১৪-১৯৫১) তিতাস একটি নদীর নাম(১৯৫৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৭৬-১৯৩৮) অভাগীর স্বর্গ(১৯২৬); দীনবন্ধু মিত্রের(১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ; মহাশ্বেতাদেবীর (১৯২৬-২০১৬) কৈবর্তখন্ড, বাণ, ডোম, পাখমারা, মাল, ওঝা, সাঁওতাল প্রভৃতি গল্প আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজের বিবস্ত্র চেহারা। এককথায় এই সমস্ত লেখায় সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জীবনের আর্থিক দুরবস্থার ঘন কালো মেঘ এবং জীবন সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে কঠিন সংগ্রাম করে আর্থিক সবল মানুষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের জীবন তরী বাইতে হয়। তাদের জীবনে তথাকথিত নাগরিক জীবনের মেকি সভ্যতার স্পর্শ নেই, রাজনীতির কুটকচালি নেই, আছে শুধু নিম্নবর্গীয় সমাজের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনের জীবিকার সংগ্রাম। আবার মাঝে মাঝে প্রকৃতির বীভিৎস রূপ তাদের নদীকেন্দ্রক জীবনকে নাঝেহাল করে দেয়। এই উপনুয়াসে দেখতে পাই- কখনো কখনো দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঝাড়া তিনদিন লড়াই চলে। শেষে জেলেরা ঝিমাইয়া পড়ার আগেই দুর্যোগ নিজেই ঝিমাইয়া পড়ে। যে বাতাস দৈত্যের নাসিকা গর্জনের মতো বহিতেছিল, তাহা এখন প্রজাপতির পাখার হাওয়ার মতো কোমল হইয়া গেল। মেঘনার বুকের আলোড়ন থামিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।[৭]

এখানে তিস্তাপারের জেলেরা কিভাবে কষ্টের মধ্যে মাছ ধরতে যায় তাঁর বিবরণ ও সেইসঙ্গে তাদের নামের সঙ্গে জাতের বিবরণ থেকে সমাজচিত্র জানা যায়। তেমনি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবদের চরম অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ ও সেখানে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস ও অন্যান্য কৈবর্ত নেতা-সহ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে।

ভারতীয় সমাজ কেবলমাত্র চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল না তা মোটামুটিভাবে সর্বজনস্বীকৃত। চারটি বর্ণের অস্তিত্ব কেবল তত্ত্বেই সীমাবদ্ধ ছিল। মূল সামাজিক ভাগ ছিল জাতি। অধিকাংশ জাতি ছিল নির্দিষ্ট বৃত্তিধারী। সমাজের অন্ত্যজ বা নিম্নতম পর্যায়ের ব্যক্তিদের পক্ষে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদালাভ কার্যত অসম্ভব ছিল। যদিও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যবাহী জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষত ব্রাহ্মণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে গৌতমবুদ্ধ-সহ একাধিক চিন্তানায়ক ও ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিবাদী আন্দোলন কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু জাতিভেদ প্রথার বিলোপ ও উচ্চতর জাতির দ্বারা অন্ত্যজদের পীড়ন-শোষণ বন্ধ হয়নি। নৃতাত্ত্বিক নির্মলকুমার বসু মন্তব্য করেছিলেন যে জাতিবর্ণ প্রথা ভারতে সামাজিক অসাম্য ও শোষণকে চিরস্থায়ী রূপ দিয়েছিল।

ভারতবর্ষ নানা জাতের মানুষের বাসভূমি। সেই সমস্ত জাতিগুলো নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আজও টিকে আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আরো বাড়িয়ে তুলছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে ভারতের মতো পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত কঠোর

জাতিভেদ ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ। তাহলে ভারতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আমাদের মনে বার বার দানা বাঁধে। প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে – 'মনুষ্যগণ স্বভাবত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। .....প্রাথমিক অবস্থায় সকল মানবই এক জাতীয় ছিল। ..... পৃথিবীর জাতীয় মানবের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলে, একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীনে উৎপন্ন ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল'।[৮] আসলে যে জাত ব্যবস্থা ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে তাঁর বিলোপ সাধন সম্ভব কিনা তাঁর উত্তরে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। তবে যে জাতব্যবস্থার বিলোপের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শত চেষ্টা করেও নির্মূল করতে পারেননি। এমনকি পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসন ও ইংরেজ শাসনেও তাঁর অবসান ঘটেনি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন সময়ে বহু মনীষী বা সমাজ সংস্কারকেরা এই জাতব্যবস্থার ওপর কুঠারাঘাত করেছেন কিন্তু সমাজ থেকে এর বীজ উপড়ে ফেলতে পারেননি। প্রথমত, আমাদের সমাজে বৃত্তিভিত্তিক জাতব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক বা বংশভিত্তিক বৃত্তি জাতব্যবস্থার ভিতকে শক্ত করেছে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে, শিল্পের অগ্রগতির ফলে জাতভিত্তিক বৃত্তি অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। এখন পরিবারভিত্তিক বৃত্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে একই পরিবারের পাঁচজন বুদ্ধি, গুণ ও সুযোগ সুবিধার জন্য পাঁচরকম বৃত্তি অবলম্বন করতে পারছে। ফলে জাতব্যবস্থার কঠোরতা অনেকটা কমে আসছে। দ্বিতীয়ত, ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হলে, জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে হলে জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি

ঘটানো ছাড়া কোন রাস্তা নেই। তাই ভারতীয় সমাজে বংশগত আভিজাত্য, বর্ণগত আভিজাত্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে সাম্যতা আনার জন্য জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। প্রাচীনকালে যেমন গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে পেশা অর্জন করতে পারতেন তেমনই আজও বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে কোন তারতম্য না রেখেই তা সম্ভব। তবে ভারতীয় সমাজে উচু-নীচু বর্ণ, তাদের পদবীগত আভিজাত্য বা গর্ব ত্যাগ করা প্রয়োজন। বর্তমানে পদবী ব্যক্তির, বংশের আভিজাত্য বা বংশ বা জাতি পরিচয় বহন করে। তাই এই পদবী ত্যাগ করে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত সম্ভব হতে পারে। তৃতীয়ত, সামাজিক বিবর্তনে মানুষ পেশাগত কারণে, পরিবেশ বা শিক্ষার সুযোগের তারতম্যের কারণে সমাজে এগিয়ে যায় অথবা পিছিয়ে পড়ে। যদিও ব্যক্তিবিশেষে সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান হয় না। তবে সবরকম সুযোগ পেলে সকল শ্রেণীর মানুষই সমান সামর্থ্য দেখাতে পারে। অর্থাৎ দারিদ্রতাই মানুষের এই জাতপাতের শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন তার গবেষণায়। সেখানে তিনি বলেছেন ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণই ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[৯] এখানে কোন বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য চাই শিক্ষা, সচেতনতা ও সামাজিক মর্যাদা। তবেই জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব। চতুর্থত, বর্তমানে প্রচলিত একই জাতের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেখানে যোগ্যতা ছাড়াও বিশেষভাবে জাতি, উপজাতি, গোত্র ও নির্দিষ্ট বর্ণের উল্লেখ করা থাকে। ফলে জাতপাত ভেদাভেদকে

কঠোর করার একটি পাকাপাকি রাস্তা অটুট রয়েছে। যদিও শিক্ষার বিস্তারের ফলে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার কারণে অসবর্ণ বিবাহ বহুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে। আবার পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞাপনে বৃত্তি, আয় বা শিক্ষাগত যোগ্যতার উল্লেখ করে জাতের উল্লেখ না করার প্রয়াসও দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেও আগামী দিনে জাতপাতের গোঁড়ামি ক্রমশ দূর করা সম্ভব হতে পারে। পঞ্চমত, কর্মের ভিত্তিতে আমাদের সমাজে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ তৈরী হয়েছে। যথা, ডোম, মুচি, মেথর, কৃষক তার বৃত্তিগত কারণে সমাজে হীনভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন তাদের যে সমস্ত কাজ তা সমাজের উঁচু-নীচু সকলের জন্যেই। তাই তারা কাজ বন্ধ করলে সমাজ স্তব্ধ হয়ে যাবে আর সেইসঙ্গে থমকে দাঁড়াবে মানবসভ্যতা। আজ যদি প্রত্যেকের কাজ প্রত্যেকে করে নেয় তবে তো সেই কাজ তাদের নির্দিষ্ট বৃত্তি হত না। অথবা তারা কাজ বন্ধ করলে তথাকথিত উঁচু বর্ণের মানুষও অশুচি থেকে যাবে বা তাদের ভুখা পেটে বসে থাকতে হবে। যদিও এইসমস্ত কাজের জন্য বর্তমানে যন্ত্রসভ্যতার আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন বর্ণের মানুষই এইসমস্ত কাজ করছে। তাই অপরিচ্ছন্ন কাজের জন্য তাদের অস্পৃশ্য করে রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের প্রতি ঘৃণ্য মানসিকতা দূরে সরিয়ে সকলের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সাম্যতা আনার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। ষষ্ঠত, সমাজের জাতিগত, বর্ণগত, ইত্যাদি ভেদভাব দূর করার জন্য রাষ্ট্রকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সজাগ থাকতে হবে সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, বর্ণের বৈষম্যের কারণে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবনে অন্ধকার নেমে না আসে। রাষ্ট্রকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জন্য সুযোগ সুবিধা দান করে

সমকক্ষতায় আনার প্রয়াস নিতে হবে। যদিও সংবিধানে তাঁর অনেকটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে সজাগ থাকতে হবে তার সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, অথবা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বা আধিকারিকরা তদারকি করছেন কিনা বা কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হলে তাঁর প্রতিকারে চটজলদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ দারিদ্রতা, অশিক্ষা, অপরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ক্রমশ দূর করে সামাজিক বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে পারলেই সার্বিক উন্নতি হবে, সমাজের মঙ্গল হবে।

আমরা জানি জাতপাতের ভেদনীতি সমাজকে দুর্বল করে তোলে। তাই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাতপাত বিভেদকে দূরে সরিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান ও জাত বর্ণ নির্বিশেষে সম্মানিত না হলে জাতপাত ব্যবস্থার প্রতিষেধক গড়ে তোলা অসম্ভব। প্রচলিত নীচুজাতের মানুষের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য নয়, করুণা প্রদর্শন নয়, মনুষ্যত্বের সমান মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই পারস্পরিক জাতপাতভিত্তিক বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। তাই আশা করা যায় প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। আর মানব সমাজের বিচারের মূল জন্মগত নয়, শিক্ষা, চর্চা, মানবতা দিয়ে। সমাজের সবরকম কাজে সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত বিভাগে, সব বর্ণের বা শ্রেণীর মানুষ নির্দ্ধিধায়, নির্বিচারে যেন অংশ নিতে পারে। তবেই বর্ণগত সমাজের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জাতপাতের অভিশাপমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। আর মানবতার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলে কৈবর্তদের একতা ও জোটবদ্ধ না হওয়ার কারণে তারা তাদের জাতির কল্যাণে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে বিশেষ তৎপর হয়নি। অথচ ইংরেজ শাসন উৎখাত করার প্রয়াসে এই কৈবর্ত জাতির অগ্রগণ্য ভূমিকা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কয়েকজন কৈবর্তনেতা সরকারে অংশ নিলেও তারা নিজেদের জাতির উন্নয়নে বিশেষ তৎপর হয়নি।

ইদানীংকালে বেশ কয়েক দশক ধরে সাবলটার্ণ স্টাডিজ ও দলিতচর্চা বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এগিয়ে এসেছেন এবং তাদের লেখনী সকলের গোচরে আসছে। বাংলার দলিত চর্চায় বিশেষ ভুমিকা রেখেছেন – পার্থ চ্যাটার্জী, রণজিৎ গুহ, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু, হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিব্যাক, রূপকুমার বর্মণ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গবেষণামূলক চর্চায় নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেছেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে জাতি রাজনীতি বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। তবে বেশকিছু ঐতিহাসিক একটি নির্দিষ্ট জাতির ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ নমঃশূদ্র জাতিকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় নমঃশূদ্র জাতিকেই ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে তপশীলিজাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়েছেন। রূপকুমার বর্মণ তাঁর ইতিহাসচর্চায় বাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একইভাবে স্বরাজ বসু তাঁর গবেষণায় ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজবংশী জাতির বিশেষ অবদান তুলে ধরেছেন।

আবার মনোশান্ত বিশ্বাস তাঁর গবেষণায় বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে কৈবর্ত, মালো, পৌণ্ড্র, শুঁড়ি, বাগদি প্রভৃতি জাতিগুলির ইতিহাস শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু বা মনোশান্ত বিশ্বাসের রচনায় স্থান পায়নি।[১০] আবার বাংলার রাজনীতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জাতি বর্ণ রাজনীতি কিছুটা ধামাচাপা পড়ে গিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। তবে বাংলায় জাতপাতের রাজনীতি একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। একবিংশ শতকের প্রথম থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় পুনরায় জাতি রাজনীতি মাথাচাড়া দিতে থাকে। একদিকে যেমন মতুয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। একইসঙ্গে বাংলার এক সময়ের নথিভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকা কৈবর্ত জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এছাড়াও কুর্মি, পৌন্ড্র, তিলি, তামলি, প্রভৃতি জাতিগুলিও তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া ও অধিকার আদায়ের অন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। ইদানীং কালে কৈবর্তদের বিশেষত চাষীকৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে। কৈবর্তজাতি আন্দোলনের শান্তিরঞ্জন সামন্ত, তন্ত্রীপদ বারিক, অপরেশ হালদার, সিদ্ধানন্দ পুরকাইত, তারাপদ সামন্ত, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে তৎপরতার সাথে এই জাতি উন্নয়নের আন্দোলনকে সক্রিয় করে চলেছেন। অন্যদিকে মাহিষ্যনামধারী কৈবর্তদের অপর শাখাটিও নিজ জাতির উন্নয়নের জন্য সভা সমিতি, আন্দোলন করে চলেছেন। আর বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের মাসিক মুখপত্র 'মাহিষ্য সমাজ' এই জাতির বিভিন্ন প্রচারকাজ চালিয়ে যান। বঙ্গীয়

মাহিষ্য সমিতির অগ্রগণ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাণী রাসমণির বংশধরের মধ্যে শ্রীমান কুশল চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত আই.পি.এস অমিয়কুমার সামন্ত, দুর্গাদাস মন্ডল, ভোলানাথ দাস, ড. শিশুতোষ সামন্ত, বিষ্ণুপদ দাস, সুবোধ কুমার হালদার, অষ্টম সাউ প্রমুখ। তবে বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত সমাজ, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ, অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী কৈবর্ত সমাজ, বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজ, ইত্যাদি নানান সংগঠনগুলি সকলেই প্রায় একই দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সকলের সম্মিলিত যৌথ আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়াস চালালেও তা কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে সফলতা পাচ্ছে না বলেই বেশ কিছু নেতৃবৃন্দের দাবী। তা সত্ত্বেও তাদের এই খন্ড খন্ড আন্দোলনের ফলেই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথমে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কৈবর্ত(মাহিষ্য) জাতির উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের অঙ্গীকারসহ এই কৈবর্ত জাতির একটি অংশ মাহিষ্য নামাঙ্কিতদের অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণা ও নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে রাখেন। অর্থাৎ কৈবর্ত-সহ বাংলার বেশ কয়েকটি মুখ্য জাতি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। আগামীদিনে পশ্চিমবাংলার জাতপাতের রাজনীতি আরও সক্রিয় হবে সেসম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই অনুভব করতে পেরেছেন বাংলার কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যান তত্ত্ব ও তথ্য। আর তার ভিত্তিতে এই জাতি সংগঠিত হলে যেকোন রাজনৈতিক দলের ভাগ্যফল নির্ণয়ে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে তা প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নিশ্চিত। এককথায় এইভাবে বাংলায় কৈবর্ত

জাতি পুনরায় একটি বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করার সম্ভাবনা গড়ে উঠবে।

সূত্রনির্দেশ:

১. প্রফুল্লচন্দ্র বসু, *ঋকবেদ*, জার্নাল, ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স, ভল্যুম ৫, মধ্যপ্রদেশ: হোলকার কলেজ, ২০১২, পৃ. ৩১

২. পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী*, গবেষণা গ্রন্থ, ভাবনা, কলকাতা: গঙ্গারাম দত্ত, মহারাষ্ট্র পুরাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৫২

৩. পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী*, তদেব, ১৯৯৭, পৃ. ৫৩

৪. পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী*, তদেব, পৃ. ৫৩-৫৫

৫. অতুল সুর, *বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা প্রা. লি., ১৯৯৭, পৃ. ৪৫

৬. অতুল সুর, *বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, তদেব, পৃ. ৪৭

৭. অদ্বৈত মল্লবর্মন, *তিতাস একটি নদীর নাম*, কলকাতা: মাইতি বুক হাউস, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৫৭

৮. *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ১৯ ভূমিকা, ১৯৯০

৯. অমর্ত্য সেন, এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ ‘পোভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস এন এস্যে অন এনলাইটমেন্ট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন’

১০. রূপকুমারবর্মণ, *ইতিহাসচর্চায় বাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজ ও রাজনীতি*, কলকাতা: পৃ. ৩৬

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কৈবর্ত জাতির পরিচয়

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে কৈবর্ত জাতির ভূমিকা এক গৌরবজনক অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কৈবর্তরা যে বাংলার এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৃহত্তর বাঙালি জাতি বিভিন্ন গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের রক্তের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। এইভাবেই বাঙালির জাতীয় সত্তা নির্মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ দ্বারা আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভ্যর্থনা সভায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপের সঙ্গে বলেছিলেন "আমরা নৃতত্ত্ব'র(ethnology) বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম-কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র উৎসুক্য জন্মে না, তখন বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, - পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।"[১] সেইরকম বাংলার এক আদিম আধিবাসী হল কৈবর্ত জনগোষ্ঠী, যা উনবিংশ-বিংশ শতকেও বাংলার একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হত। বিংশ শতকের প্রেক্ষিতে কৈবর্ত জাতির যথার্থ পরিচয়, উত্থান-পতনের ইতিহাস ও সমাজে তাদের

অবস্থান, অবদান তুলে ধরাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই অধ্যায়ে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলের ও তার আগের তথ্যের ভিত্তিতে কৈবর্ত জাতির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

কৈবর্ত শব্দের অর্থ বিভিন্ন অভিধান ও সূত্রে যেমন পাওয়া গেছে সেগুলোকে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। কৈবর্ত শব্দটির ধাতুগত অর্থ হল 'কে বর্ততে ইতি কৈবর্ত'। 'ক' মানে জল, কে মানে জলে। কে+বৃত্ত+ক= কেবর্ত্ত। কেবর্ত্ত+ অণ্=কৈবর্ত।[২] ভারতকোষে বলা হয়েছে 'কে বৃত্তি যেষাৎ ইতি কৈবর্ত'। অর্থাৎ জলকে ঘিরে যাদের জীবিকা তারাই কৈবর্ত। অনেকের মতে কৈবর্ত অর্থ নৌকর্মজীবী। সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষায় কৈবর্ত শব্দের সমার্থক শব্দগুলি হল – কেবর্ত, কেবট্ট, কৈবট্ট, কেবট, কেওট ইত্যাদি। কৈবর্তদের সঙ্গে জালিক শব্দটি যুক্ত হয়েছে সম্ভবত একাদশ-দ্বাদশ শতকে। সপ্তম শতকে রচিত সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষ'-এ কৈবর্তদের দাশ, ধীবর, বলে উল্লেখ করা হয়েছে – 'কৈবর্ত দাশ ধীবরৌ'। একাদশ শতকে রচিত অভিধান 'বৈজয়ন্তী'তে আছে 'কৈবর্ত্তোধীবর দাসো নৌজীবী জালিক মার্গবৌ'। দ্বাদশ শতকে রচিত অভিধান 'রত্নমালা'য় দেখতে পাওয়া যায় – 'কৈবর্ত্তোধীবরদাসো মৎস বন্ধীচ জালিক'। আবার মনুস্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি উল্লেখ করেছেন – কৈবর্ত্তা দাসাস্তবাগ খননাদি জীবিনস্তএগচ্ছন্তি/ কাস্মাকীনং কর্মোপযুগ্যতে'। অর্থাৎ যারা পুষ্করিণী ইত্যাদির খননকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কৈবর্ত বা দাস নামে অভিহিত করা হয়।[৩] বাংলা ভাষায় অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ দেখান যে কৈবর্ত শব্দের অর্থ হল দাশ, ধীবর, কেওট, জেলে; কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী জাতি বিশেষ, জেলে কৈবর্ত। তেমনি জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার

অভিধানে দেখান যে কৈবর্ত অর্থে ধীবর, দাস জাতিবিশেষ। রাজশেখর বসু তাঁর চলন্তিকায় কৈবর্ত অর্থে হিন্দুজাতি বিশেষ ও জেলেদের উল্লেখ করেছেন। আবার কাজী আব্দুল ওদুদের ব্যবহারিক শব্দকোষে দেখা যায় জলের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত কেয়ট, জেলে হিন্দুজাতিরাই হল কৈবর্ত। একইসঙ্গে আবু ইসহাক তাঁর সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধানে জেলে, ধীবর, মেছো ও কৃষিজীবি হিন্দুজাতিবিশেষকে কৈবর্ত নামে অভিহিত করেছেন। তাহলে পুরাতন বিভিন্ন অভিধানকারদের বিচারে এটা স্পষ্ট যে কৈবর্ত শব্দটি জাতিবাচক নয় এটি হল বৃত্তিবাচক।

কৈবর্তরা বাংলার আদি অধিবাসীদের মধ্যে অন্যতম। বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে এই কৈবর্ত জাতি। কৈবর্তরা বাংলার হিন্দু সমাজের প্রধানতম মেরুদন্ড। প্রাচীন শাস্ত্রে, পুরাণে ও সংস্কৃত সাহিত্যে কৈবর্তদের উল্লেখ নিঃসন্দেহে তাদের প্রাচীনত্বকে নির্দেশ করে। যজুর্বেদ সংহিতায় সর্বপ্রথম ‘কেবর্ত’ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়- ‘আবারায় কেবর্তম্’ (১০/১৬)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩/৪/১২) প্রথম কৈবর্ত কথাটির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। জলকে অবলম্বন করে যাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হত তাদের কেবট বলা হত। বৈদিক যুগে এরকম নয়টি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় – ধৈবর, দাস, বোইন্দ, শৌষ্কল, কৈবর্ত, মার্গার, আন্দ, মৈথাল, পর্ণক। সেসময় তাদের নাম ছিল পুঞ্জিষ্ঠ বা পৌঞ্জিষ্ঠ। যজুর্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে – ‘পুঞ্জিষ্টেভ্যশ্চ নমো নমঃ’ (১৬-১৭)। যজুর্বেদ সংহিতা ও তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণের বেদার্থপ্রকাশ টীকার ভাষ্যকার বলেছেন – ‘নদীভ্যঃ নদীদেবতাভ্যঃ পৌঞ্জিষ্টং কৈবর্তম্’। জার্মান পণ্ডিত জাইমার হেনরিখ্ (Zimmer Heinrich) পুঞ্জিষ্ঠ শব্দে

মৎস্যজীবীদের বুঝিয়েছেন।[৪] যদিও পরবর্তী বৈদিক যুগে 'পৌঞ্জিষ্ঠ' শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। পূর্বে উল্লিখিত নয়টি মৎস্যজীবী জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে যজুর্বেদ সংহিতায় মহীধর ও সায়নাচার্য লিখেছেন যে যারা সরোবরে দুইদিকে জাল বেঁধে মাছ ধরতো টাড়া হল ধৈবর। 'সরোভ্যঃ যানি সরাংসি তদভিমানিভ্যঃ ধৈবরং উভয়তো জলং বধনাতি তটানাং মৎসগ্রাহিণং'। (সায়ন); 'সরোভ্যো ধৈবরং কৈবর্তাপত্যম্। (মহীধর)। আবার তড়াগের একদিক থেকে মাছ টেনে নিয়ে অন্য পারে জড়ো করে যারা মাছ ধরতো তারা 'কৈবর্ত' নামে অভিহিত হত।[৫] 'পার্যায় পরতীরাভিমানিনে কৈবর্তং কূলে মৎস্যানাং পুঞ্জীকৃত্যং হন্তারম্' (সায়ন)। পরবর্তী বৈদিক যুগে মৎস্য ব্যবসায়ীদের সাধারণত কৈবর্ত বলা হত। উল্লেখ্য পুকুর, কূপ, খাল-প্রভৃতিতে যারা মাছ ধরতো তারাই বৈদিক যুগে 'কেবট' নামে অভিহিত হত। প্রাচীনকালে বিভিন্ন শিলালিপি ও স্তম্ভলিপিতে কৈবর্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সম্রাট আশোকের পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে কৈবর্ত অধ্যুষিত অঞ্চল বা ভুক্তি বোঝাতে 'কেবট-ভোগ' নামটি পাওয়া যায়।[৬] সেখানে নির্দিষ্ট কিছু দিনে কৈবর্তদের মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অমরকোষে বারিবর্গে কৈবর্তদের উল্লেখ জলের সাথে তাদের যোগাযোগের ইঙ্গিতবাহী। বৌদ্ধযুগে শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বারাণসীতে 'কেবট্টদ্বার' নামে কৈবর্তদের প্রবেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র দ্বার ছিল। এর পাশে অবস্থিত ছিল কেবট্টগ্রাম। উদানম্, দিঘারনিকায় ইত্যাদির মতো বহু বৌদ্ধ সাহিত্যে মর্যাদার সঙ্গে কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শাস্ত্র ও পুরাণ পর্যালোচনা করে কৈবর্ত জাতির তিন ধরণের উৎপত্তি দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষত্র বিবাহিতা বৈশ্যা জনয়ত্য পত্যং শুভে।

খ্যাতঃ স্বপ্রসুধর্ম্মেণ কৈবর্ত্তোভিহিতো ভূবি।।[৭]

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এবং বৈশ্যার গর্ভে একজাতীয় কৈবর্ত্তের উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত, স্বর্ণকারের ঔরসে এবং কুবেরিণীর গর্ভে একজাতীয় কৈবর্তের জন্ম এবং তৃতীয় ধারাটি নিষাদের ঔরসে ও অয়োগবীর গর্ভে উৎপন্ন। অন্ত্যজ জাতির বর্ণনায় শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন –

রজকশ্চর্ম্মকাবশ্চ নটোবরুড় এব চ।

কৈবর্ত্তো মেদ ভীল্লশ্চ ষড়েতে অন্ত্যজাঃস্মৃতা।।[৮]

অনুমান করা হয় এই জাতি সেন আমলে বল্লাল সেনের সময় দুই ভাগে বিভক্ত হয় –

কৈবর্ত্তা দ্বিবিধা প্রোক্তাঃ হালিকাজ্জালিকা মনা।

নলবাহাঃ হালিকাশ্চ জালিকাঃ মৎস জীবিনঃ।।[৯]

অর্থাৎ কৈবর্তকূল হালিক ও জালিক এই দুই নামে বিভক্ত। এইচ.এইচ. রিসলে লিখেছেন – ‘The Kaivartas are divided into two groups – a cultivating group, known as Halik or ParasarDass or Chasi Kaivarta, and a fishing group, known as Jalik Kaivarta.[১০] আবার পারস্য ভাষায় লিখিত একটি প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে –

‘শণিদম্ অজ্ মর্দুমে আম্ ইকইবরং

হায় দো ফিরকে বদ্নদ্ আব্বল্;

হালিক, দোয়েম্ জালিক।’[১১]

অর্থাৎ বঙ্গবাসী কৈবর্তদিগের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় আছে একটি হালিক ও অপরটি জালিক। আর বল্লাল সেনের সময়ে এই দুটি ভাগের মধ্যে ভেদাভেদ প্রচন্ড বেড়ে গিয়েছিল। রিসলে উল্লেখ করেছেন যে – বল্লাল সেনের সময়ে অনেক নীচ শূদ্র মৎস্য ব্যবসা পরিত্যাগ করেছিল এবং কৈবর্তদের বল্লাল সেন সমাজে জলচল পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন – 'These people were raised by Ballal Sen to the grade of pure Sudras. Ballal conferred on them the title of Kaivarta in return for their under taking to abandon their original profession of fishing.'[১২] কৈবর্তদের মধ্যে হালিক জালিক ভেদ করে – হালিককে জলচল এবং জালিককে জল-অচল করে এই বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও ভেদের বিষ ঢুকিয়েছিলেন কর্ণাট দেশ থেকে আগত বল্লাল সেন। কেননা কৈবর্তরাজ দিব্যক কর্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বল্লালের পিতা বিজয় সেনের জীবনকালেই ঘটেছিল। তাই মিলিত কৈবর্ত জাতির ক্ষমতা কতটা বল্লাল সেন তা জানতেন এবং তাদের ভয় করতেন।[১৩] অর্থাৎ সেইসময় থেকে এই দুই ভাগের মধ্যে বিভেদ বাড়তে শুরু করেছিল। রিসলী আরও দেখাচ্ছেন যে – The two groups Haliks and Jaliks are now virtually distinct castes and they appear to stand on different social levels.[১৪] এমনকি এই ভিন্নতা তারা ভারতে মুসলিম শাসনকালেও বজায় রেখেছিল। তার উল্লেখ পাই – 'ভারতবর্ষে যখন মুসলমান শাসন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল, যখন মুসলমানের ছল-বল-প্রলোভন অথবা কৌশলে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মভীরু এবং ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকেও বাধ্য হইয়া যবন ধর্ম্ম গ্রহন করিতে হইয়াছিল, যখন ক্ষত্রিয়াধিক

ক্ষত্রিয়বীর ও রাজন্যবর্গ কন্যা, ভগ্নী, ভাগিনী প্রভৃতিকে উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিয়া অত্যাচারী মুসলমানের হস্ত হইতে স্বধর্ম রক্ষা করিতেছিলেন, ... সেই মহা ভীষণ বিপ্লবকালেও বঙ্গদেশে হালিক কৈবর্ত্তেরা জালিক কৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।'[১৫] এই সময়কালে এই দুই ভাগের মধ্যে ভেদাভেদ এতটাই চরমে ওঠে যে তাদের মধ্যে জলগ্রহণ, বিবাহ এমনকি একসাথে ভোজন করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। প্রাচীন এক বাংলা গ্রন্থে দেখা যায় –

হালিক আমার জাতি বা বর্ধমানে।

না করি ভোজন মোরা, জালিক ভবনে।।[১৬]

তবে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশে হালিক ও জালিক ব্যতীত তুঁতে, জঙ্গলী, মিশাই প্রভৃতি অনেক কৈবর্ত আছে। ১৮৮১ সালের আদমসুমারিতে বাংলায় কৈবর্তদের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ। এদের মধ্যে হালিকের সংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ।[১৭] মেদিনীপুর জেলায় ঐ বৎসর প্রায় ৯ লক্ষ হালিক কৈবর্ত বাস করত। আদিশূর ও বল্লাল সেনের পূর্ববর্তী পূর্ববঙ্গের দলপতি সেন মহারাজার প্রধান সভাপণ্ডিত রায় রামসেবক মিশ্র বঙ্গের কিছু জাতি সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে একটির অনুবাদ হল – ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা। হালিকের জন্ম হয় বৈশ্যা যার মাতা। আবার সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সময়ে চট্টগ্রামের জলধর পণ্ডিত মহাশয় কৈবর্ত জাতির উল্লেখ করে বলেছেন –

জালিকের ভবনেতে অন্ন, জল দান।

গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান।।

হালিকের ভবনেতে অন্ন পাক চলে।

শাস্ত্রমতে হালিকের বৈশ্য জাতি বলে ।।

হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শাস্ত্রধারী।

জননী জাহার হয় বৈশ্যা শুদ্ধ নারী।।[১৮]

এ থেকে বোঝা যায় সে সময় হিন্দু শাস্ত্রকর্তাদের নির্দেশে বলা হয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জাতিতে বিবাহ করলে নিম্ন জাতিপ্রাপ্ত হয়। আর কৈবর্তদের দুইভাগের মধ্যে বিবাদের চরম নিদর্শনও এই শ্লোক থেকে পাওয়া যায়। তবে এই দুই ভাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় অতি প্রাচীনকালে আর্যাবর্তে বর্ণপ্রাস ও কুশদ্যোত নামে দুই ঋষি ছিলেন। বর্ণপ্রাস ঋষির আশ্রম নদীতটে ও কুশদ্যোত ঋষির আশ্রম পর্বতপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুশদ্যোতের ভৃত্য ভূজকন্ঠ ও বর্ণপ্রাসের ভৃত্য অমরকন্ঠ বাস করতেন সেখানে। তাদের তাই দুই স্থানে কাজ করতে হত। অমরকন্ঠকে নদীর জলে, নদীতটে কাজ করতে হত। তাই তাদের বলা হত জলবাহী জলধর। তেমনি ভূজকন্ঠকে স্থলে থেকে বাগান সম্পর্কিত ও কৃষিকাজ করতে হত। তাই তাদের বলা হত স্থলবাহী, হলবাহী বা হলধর। এইভাবে জলবাহীরা জালিক ও হলবাহীরা হালিক হয়েছে। তাহলে দেখা যায় জালিকের আদিপুরুষ অমরকন্ঠ ও হালিকের আদিপুরুষ ভূজকন্ঠ। এই কারণে আমরা শাস্ত্রে পাই –

কৈবর্ত্তা দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ হালিকা জালিকা মুনা।

হলবাহাঃ হালিকাশ্চ জালিকাঃ মৎসজীবিনঃ।।[১৯]

এইভাবে দেখা যায় যে বাংলা ও আসামের শিলালেখ তাম্রপট্টগুলিতে কৈবর্তদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। ৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত কলাইগুড়ি-সুলতানপুর তাম্রপট্টে কৈবর্তশর্মা নামে এক ব্যক্তিকে স্থানীয় অধিকরণের বা কার্যালয়ের সদস্য হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। শর্মা নামান্ত থেকে বোঝা যায় তিনি হয়তো কৈবর্তদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের ভূমিকা পালন করতেন। আবার পাল রাজাদের ভূমিদান পট্টগুলিতেও কৈবর্তদের বারংবার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় গোপালের তাম্রপট্টে গ্রামীণ সমাজের নীচুতলার জাতিগুলির সাথে কৈবর্তদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ রামচরিতে কৈবর্ত সন্তান দিব্যোককে পালরাষ্ট্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। রসুকে ফরুইয়ের মতে এটি হয়তো কৈবর্তদের সমাজে উত্তরণের ইঙ্গিত বহন করছে।[২০] তবে পালদের অন্য কোন লেখতে চণ্ডালদের সাথে কৈবর্তদের এক আসনে বসানো হয়নি। অর্থাৎ মনে হয় কৈবর্তদের সমাজে চন্ডালদের মতো হেয় করা হত না। আবার দশম ও একাদশ শতকে প্রথম মহীপালের বেলোরা ও রংপুর তাম্রপট্টে যথাক্রমে ‘ওসিল্ল কৈবর্ত বৃত্তি’ ও উধ্বন্ন কৈবর্তবৃত্তি’ নামে ভূমিখণ্ড দান করতে দেখা যায় ফানিত বীথী নামক স্থানে। রসুকে ফরুইয়ের মতে রংপুর লেখতে কৈবর্তদের ভূম্যধিকারী ও একটি সমবেত গোষ্ঠীচেতনার আবির্ভাব ঘটেছে তা বলা যায়। আবার আসামের রাজা ইন্দ্রপালের (আনুমানিক ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) গৌহাটি তাম্রপট্টে জল্পদ্যুতি কৈবর্ত

নামে একটি গোষ্ঠীকে একটি দীঘির মালিকানা ভোগ করতে দেখা যায়।[২১] এইভাবে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন লেখ ও তাম্রপট্টগুলি থেকে মৎস্যজীবী কৈবর্তদের ক্রমশ জমির মালিক বা ভূম্যধিকারী হয়ে ওঠার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দশম শতকের পরবর্তীকালে।

বাংলায় কৈবর্তদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি ইত্যাদির মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু সেই শক্তিশালী কৈবর্তদের একতাকে উচ্চবর্ণের মানুষজন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে এই জাতির মধ্যে বিভাজন ঘটিয়েছে। ভারতবর্ষ পত্রিকায় নলিনীকান্ত ভট্টশালীর লেখা থেকে জানা যায় বল্লাল সেনের পূর্ব্বে কৈবর্ত সমাজে হালিক জালিক ভেদ ছিল না। বল্লাল সেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি অনুসারে কৈবর্ত সমাজে এই ভেদনীতি প্রবর্তন করেন।[২২] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর ‘বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম’ প্রবন্ধে(১৯১৭) লিখেছেন – বল্লাল সেন কৈবর্ত সমাজকে দুভাগে ভাগ করে তাঁর একটি অংশকে ওড়িশার প্রান্তবর্তী নিম্নবঙ্গে বসত করান।[২৩] আসলে এই পেশাগত ভিন্নতার অজুহাতে বিভাজন ঘটিয়ে জাতির শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই বিভাজিত বিভিন্ন শ্রেনীর কৈবর্ত জনগোষ্ঠীকে জাতি আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী কৈবর্ত জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেইসঙ্গে কৈবর্তদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের দ্বারা সমাজের একটি সংগঠিত শক্তিশালী জাতি হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাশে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে কৈবর্ত জাতির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ইতিপূর্বে এই ধরণের

কোন গবেষণা সেইভাবে হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সেইরকম বেশকিছু বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা উঠে আসবে।

ভারতবর্ষ তথা বাংলায় নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির নামকরণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংজ্ঞায় দেখা যায়। গান্ধীজী এদের হরিজন আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়াও অন্ত্যজ, নিম্নবর্গ, প্রান্তিক, আউটকাস্ট, দলিত, ইত্যাদি নামেও তারা পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাতি সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা শুরু হয় ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্যোগে। ইংরেজ প্রশাসক বুকানন হ্যামিলটন (১৭৬২-১৮২৯) ভারতে জাতিগত ইতিহাসচর্চার সূচনা করেন। তিনি ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে বাংলার দিনাজপুর, ভাগলপুর, রংপুর, পাটনা-সহ বেশকিছু জেলার উপর সমীক্ষা চালান। সেখানে তিনি অধিবাসীদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, কৃষিকর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কোচ, কৈবর্ত, রাজবংশী-সহ বিভিন্ন জাতির আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিবরণও দিয়েছেন। একইসঙ্গে জেমস টেলর তাঁর ১৮৪০এ প্রকাশিত ‘অ্যা স্কেচ অব দ্য টোপোগ্রাফি এন্ড স্ট্যাটিসটিক্স অব ঢাকা’ গ্রন্থে রাজবংশী, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র-সহ অন্যান্য অনেক জাতির বিবরণ তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনে ১৮৭০এর দশকে জনগণনার সূচনায় জাতিভিত্তিক বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে ওঠে। এইভাবে দশ বছর অন্তর ১৯৩১ পর্যন্ত প্রতিটি আদমশুমারিতে জাতিভিত্তিক গণনা জাতি ইতিহাসচর্চার গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত।

একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ সম্পর্কে জানতে নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)', বৃহদ্ধর্মপুরাণ (ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক) চুড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়' (ষোড়শ শতক), মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' (ষোড়শ শতক), ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' (সপ্তদশ শতক) গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায়ক। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বাংলার আদিম অধিবাসীদের বর্ণসংকর জাতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণসংকর শূদ্র জাতিগুলিকে আবার সৎ শূদ্র, অসৎ শূদ্র ও অন্ত্যজ এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মোট ৪৮টি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৈবর্তদের অসৎশূদ্র পর্যায়ে রাখা হয়েছে। এই অন্ত্যজ বর্ণের সকলেই বর্ণাশ্রম প্রথার বাইরে থাকল। আর প্রায় একই সময়ে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণে ৩৬টি জাতির কথা বলা হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে আরো পাঁচটি জাতি যোগ করে মোট ৪১টি জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে কৈবর্তদের মধ্যম সংকর শ্রেণীতে রাখা হয়েছে।

বাংলার জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের মতে বাংলায় আর্যদের আগমনের আগে এই দেশ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের আবাস ছিল। বাংলায় এই মানুষেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা কৌমে বিভক্ত ছিল। যারা কৃষি, শিকারজীবী ও অরণ্যচারী জীবনযাপন করত। কৈবর্তরাও এই কৌমভুক্ত মানুষ ছিল তা জানা যায়।[২৪] "বাঙালি একসময়ে কৌমগত বা ট্রাইবাল জীবনযাপন করত এবং সে সময়ে বাঙালি সমাজের গঠন মাতৃকেন্দ্রিক ছিল, ... কালের স্রোতে কৌমী জীবন ভাঙিয়া যায়, বহু জাতির মধ্যে সংশ্লেষ ঘটে; বাঙালি যে পদ্ধতিতে অন্ন আহরণ করিত তাহার পরিবর্তে কৃষিবৃত্তি আশ্রয় করে.... শিল্প অথবা ধর্ম এবং

সামাজিক মর্যাদায় বাঙালি মাতৃজাতির স্থান অনেক উচ্চে ধরিয়া রাখিল।”[২৫] সমাজতাত্ত্বিক হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে আর্যরা বিভিন্ন কৌশলে এদেশের আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে তাদের বশে আনে।[২৬] আর্যরা এদেশের আদিম মানুষদের দাস, দস্যু নামে অভিহিত করেছেন। তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নিজেদের সাংস্কৃতিক প্রভাবকেও অনেকটা চাপিয়ে দিয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনার্য এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে সংমিশ্রণের দ্বারা বিশেষ রূপ দিয়ে আর্যরা তাদের নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে আর্যরা অনেক পরে বাংলায় প্রবেশ করে ও ক্রমে তারা প্রভাব বিস্তার করে। আর্যরা এদেশের মানুষদের আচার সংস্কারকে অদ্ভুত ধরনের (অন্যব্রত) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তবে ভারতবর্ষে জাতপাত সংক্রান্ত ইতিহাসচর্চা বিংশ শতকের সাতের দশক থেকে বিশেষভাবে দেখা যায়। উনবিংশ শতকে ঔপনিবেশিক আমলে জাতপাত ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে সাড়া জাগায়। বাংলাতেও সেই আন্দোলন থেমে থাকেনি। ঔপনিবেশিক আমলে দেশীয় ঐতিহাসিকরাও ভারত তথা বাংলার জাতিচর্চা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। ঐতিহাসিক যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ‘হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড সেক্টস : অ্যাস এক্সপোসিশান অব দ্য অরিজিন অব দ্য হিন্দু কাস্ট সিস্টেম অ্যান্ড দ্য বিয়ারিং অব দ্য সেক্টস টুওয়ার্ডস ইচ আদার অ্যান্ড টুওয়ার্ডস আদার রিলিজিয়াস সিস্টেম (১৮৯৬) নামক গ্রন্থে বাংলার জাতিগুলির উৎপত্তি ও কার্যকলাপ আলোচনা করেছেন। আবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত তাঁর ‘ অরিজিন অ্যান্ড গ্রোথ অফ কাস্ট ইন ইন্ডিয়া, ২ ভল্যুমস (১৯৩১, ১৯৬৫) নামক গ্রন্থে

জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে বহুল চর্চা করেছেন। যদিও পরবর্তী সময়ে দুটি খন্ড একত্রে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি কৈবর্ত জাতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। নির্মল কুমার বসু তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন'(১৯৪৮) গ্রন্থে বাংলার উল্লেখযোগ্য জাতিগুলির পরিসংখ্যান, পেশা, স্বাক্ষরতার হার নিয়ে আলোচনা করেছেন ১৯৩১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে।[২৭] প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ(১৮৯৩-১৯৭২) তাঁর নৃপরিমাপমূলক (Anthropometric) গবেষণায় বাংলার আদিম জাতিগুলির জনতত্ত্ব ও বিন্যাস তুলে ধরেছেন। তিনি কৈবর্ত জাতির নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল জাতিভেদ, যা পৃথিবীর আর কোথাও এমন বৈচিত্র দেখা যায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত এই জাতিব্যবস্থা সম্পর্কে বহুল চর্চা করেছেন। ভারতীয় সমাজের বহু প্রজাতির বিমিশ্রতা থেকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে বর্ণ বিভাগের উদ্ভব ঘটেছে। বৈদিক আর্যদের আগমনের অনেক আগেই ভারতবর্ষে বিচিত্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ' গ্রন্থে বলেছেন বর্ণাশ্রমই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি। বর্ণাশ্রমের সমাজবিন্যাস একদিকে ভারত ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তেমনই অন্যদিকে এমন সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী এবং গভীর অর্থবহ সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।[২৮] শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁর 'বাঙালি জাতি পরিচয়'(১৯৫৬) গ্রন্থে আটচল্লিশটি জাতির কথা আলোচনা করেছেন। এখানে জাতিগুলির আলাদা আলাদা পরিচয়, গোত্র, পদবী, পেশা, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে কৈবর্ত জাতির কি কি গোত্র, পদবী তাঁর বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত আছে।[২৯] আবার পঞ্চানন বর্মা(১৮৬৫-১৯৩৫), হরিচাঁদ ঠাকুর(১৮১২-৭৭), গুরুচাঁদ ঠাকুর(১৮৪৬-১৯৩৭)

প্রমুখ নিম্নবর্গের মানুষজন তাদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই নিম্নবর্ণীয় মানুষজন তাদের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞার জায়গা থেকে রেহাই পেতে, আর্থিক দিক থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর হয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই ধরনের আন্দোলনকে সংস্কৃতায়ন বা sanskritization নামে আখ্যা দিয়েছেন।

বাংলার জাতি ইতিহাসচর্চায় বিশেষ অবদান রেখেছেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার (১৮৪০-১৯০০)। তিনি তাঁর 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, ২ ভল্যুম (১৮৭৫-৭৭)' গ্রন্থে বাংলার জেলাগুলির ভৌগোলিক পরিমাপ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জঙ্গল, পরিবেশ, নদনদীর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। হান্টার তাঁর বিবরণে বাংলার বেশীরভাগ নিম্নবর্গীয় জাতিগুলির উদ্ভবের ইতিহাস, সামাজিক অবস্থান, পেশাগত পরিচিতির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে তিনি কৈবর্ত জাতির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা ও চর্চা ই.টি. ডালটন(E.T.Dalton) তাঁর 'ডেসক্রেপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল (১৮৭২) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । এছাড়া উনবিংশ শতকে জেমস ওয়াইজ (James Wise, 1835-86) বাংলার জাতি-বর্ণ সংক্রান্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'নোটস্ অন রেসেস, কাস্টস অ্যান্ড ট্রেডার্স অফ ইস্টার্ন বেঙ্গল (১৮৮৩) নামক গ্রন্থে। তেমনি এইচ.এইচ. রিসলে (H.H.Risley,) বাংলায় প্রত্যেক জাতির সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় রীতিনীতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'দ্য ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল', ২ ভল্যুমস,(১৮৯১) গ্রন্থে। তিনি অনার্য জাতিগুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা

করেছেন। বাংলার কৈবর্ত জাতি সম্বন্ধেও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। রিসলে জাতি বলতে বুঝিয়েছেন – ‘কয়েকটি পরিবার বা পারিবারিক গোষ্ঠীর সমবায় যারা প্রত্যেকেই একই জাতিনামের অন্তর্গত, একই পৌরাণিক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে নিজেদের পরিচয় দেয়, একটি নির্দিষ্ট কৌলিক বৃত্তি অনুসরণ করে, নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্বিবাহ করে এবং অনুরূপ অন্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সামাজিক স্বাতন্ত্র বজায় রাখে।’[৩০] ইংরেজ প্রশাসক জন হেনরি হাটন (J.H.Hutton) বাংলার জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি ও কর্মকান্ড তুলে ধরেছেন তাঁর ‘কাস্ট ইন্ ইন্ডিয়াঃ ইট্স নেচার, ফাংশন অ্যান্ড অরিজিন (১৯৪৬) নামক গ্রন্থে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ্ এডমন্ড লীচ (Edmund Leach,) জাতি ব্যবস্থা সম্পর্কে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন। যথা, ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ, বংশভিত্তিক কৌলিক পেশা, সমকূলে বিবাহ, ভোজন সংক্রান্ত বিধি এবং অস্পৃশ্যতা।[৩১] তবে পরিবর্তনশীল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতিপ্রথাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বিভিন্ন জাতির আদান প্রদান ও সংমিশ্রণের ফলে সাংস্কৃতিক অনুকরণ, পশ্চিমী ভাবধারার অনুকরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিকোলাস ডার্কস (Nicholas B. Dirks) তাঁর ‘দ্য হলো ক্রাউন : এথনোহিস্ট্রি অব অ্যান ইন্ডিয়ান কিংডম’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন ভারতে জাতিগুলির পদমর্যাদা ও শুচিতা নির্ভর করত রাজপদ থেকে জাতিগুলির দূরত্বের ওপর।[৩২] আবার গেইল ওমভেট (১৯৪১-২০২১) আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিক হয়েও ভারতের প্রান্তিক জাতিগুলির অধিকার অধিকার আন্দোলনে তথা জাতপাত বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর মতে ভারতে জাতিভিত্তিক সামন্ততন্ত্র ব্রাহ্মণদের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্পর্কের ফলেই টিকে ছিল। আর

ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই ব্যবস্থাটিকেই গ্রহণ করে নিজেদের শাসন কাজে ব্যবহার করে।[৩৩]

গেইল ওমভেট তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন ভারতীয় জাতিব্যবস্থাকে বিশেষ কোন উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে উপরিকাঠামোর রূপ বলে মনে করা ঠিক নয় বরং একে উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের রূপ হিসাবে দেখা উচিত। তাঁর মতে এই ব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের ভিত্তিকে মজবুত ও ঐতিহাসিকভাবে তৈরি করেছে। যা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৩৪] পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। একইসঙ্গে সমাজের অন্যান্য ক্ষমতাশালী জাতিগুলি তাদের ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবী করতে থাকে। এইভাবে ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে জাতিগুলির অবস্থান সম্পর্কে একটি বিষম সমাজ বিপ্লবের সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল। এব্যাপারে নবদ্বীপ-সহ বেশকিছু এলাকার একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অর্থের বিনিময়ে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেন।[৩৫] একইসঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেদের বৈশ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকে। তেমনি যোগী বা নাথ সম্প্রদায়েরা ব্রাহ্মণত্বের দাবীর পাশাপাশি কৈবর্তদের থেকে নিজেদের আলাদা করে উপাধি আদায়ের প্রতিযোগিতা শুরু করেন।

১৯৮০র দশকে ভারতের সমাজ ও ইতিহাস আলোচনায় নিম্নবর্গীয় মানুষদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায় ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের আলোচনায়। তিনি সাবলটার্ণ কথার বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন নিম্নবর্গ। সাবলটার্ণ স্টাডিজ নামক প্রবন্ধ সংকলনে রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র

পাণ্ডে, শাহিদ আমিন প্রমুখ ঐতিহাসিকরা তাদের চিন্তা ও গবেষণামূলক চর্চা তুলে ধরেছেন। তাদের নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চবর্গীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করা। রণজিৎ গুহ তাঁর 'অন সাম অ্যাসপেক্টস্ অফ দ্য হিস্টোরিওগ্রাফি অব কলোনিয়াল ইন্ডিয়া(১৯৮২) প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধিতাই নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার মূল বিষয় হয়ে ওঠে। সাবলটার্ণ স্টাডিজের প্রথম বারোটি খণ্ডে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বেশকিছু সমাজবিজ্ঞানী জাতিচর্চার তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। যথা, এম.এন.শ্রীনিবাস তাঁর 'সোশ্যাল চেঞ্জ ইন মডার্ণ ইন্ডিয়া'(১৯৬৬); আন্দ্রে বেতেই তাঁর 'কাস্টস্: ওল্ড অ্যান্ড নিউ, এসেস ইন সোশ্যাল স্ট্রাক্চার অ্যান্ড সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন'(১৯৬৯); দীপঙ্কর গুপ্ত (সম্পা.) 'সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন'(১৯৯২); নিকোলাস ডার্কস তাঁর 'কাস্টস্ অব মাইন্ড: কলোনিয়ালিসম অ্যান্ড দ্য মেকিং অব মডার্ণ ইন্ডিয়া'(২০০২) ইত্যাদি। আবার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অশোক কুমার মিত্রের 'দ্য ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল (১৯৫৩) গ্রন্থে বাংলার প্রান্তিক জাতিগুলি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে জেলিয়া কৈবর্ত সম্পর্কে আলোচিত হলেও চাষী কৈবর্ত সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা নেই।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বাংলার জাতিসমাজ সমগোত্রীয় জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তবে তাদের সামাজিক রীতিনীতিতে বেশকিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তিনি বিশেষত নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তিনি দেখান ঔপনিবেশিক যুগে বাংলার নমঃশূদ্ররা ব্রাহ্মণদের সমতুল

মর্যাদা দাবী করে ব্যর্থ হলে তারা নিজেদের সংগঠিত করে।[৩৬] স্বরাজ বসু তাঁর ‘ডিনামিক্স অফ অ্যা কাস্ট মুভমেন্ট: দ্য রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল, ১৯১০-১৯৪৭’ গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করেছেন।[৩৭] ডি.ডি.কোশাম্বী তাঁর ‘অ্যান ইন্ট্রোডাক্সন টু দ্য স্টাডি অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’ গ্রন্থে দেখান যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণরা হল সমাজের দুটি প্রান্ত, শূদ্ররা ভূমিদাস নয়, আবার গ্রীক হেলট নয়, আসলে তারা কায়িক শ্রমদানকারী শ্রেণী।[৩৮] আবার গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক তাঁর ‘ক্যান সাবলটার্ণ স্পিক?’ প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চা সম্বন্ধে বলেছেন নিম্নবর্গের ইতিহাস সবসময়ই উচ্চবর্গের দ্বারা লিখিত হয়। তাই এই ইতিহাসে নিম্নবর্গের প্রকৃত ইতিহাস উঠে আসে না অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় না।[৩৯] তবে অনেকে মনে করেন নিম্নবর্গের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ইতিহাস যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারে না। সেক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের লেখনীতে কিছুটা হলেও তাদের ইতিহাস উঠে এলে ক্ষতি কি? কেউ কেউ এর বিরোধিতা করে বলেন নিম্নবর্গীয় মানুষজন পদ্ধতিগত ইতিহাসচর্চা না করলেও তাদের লেখনীতে নিজস্ব জীবনের বাস্তবতার ইতিহাস রচনাকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন। রূপকুমার বর্মণ তাঁর ‘ইয়েস! সিডিউল কাস্টস ক্যান রাইট’ প্রবন্ধে বাংলার পৌণ্ড্র, রাজবংশী লেখকদের আত্মজীবনীমূলক লেখায় তাদের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও উচ্চবর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষণ ও বঞ্চনার কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৪০] তিনি আরো বলেছেন নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চায় তাদের প্রতি শোষণ, বঞ্চনা-যন্ত্রণার দিকগুলি উপেক্ষিত থেকে গেছে। সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন বাঙালি সমাজে জাতিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় পেশাভিত্তিক অর্থনীতি বাংলার অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪১] সুমিত সরকার নিম্নবর্গ বা অন্ত্যজ শ্রেণী বলতে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অত সরল সামাজিক ভেদ না টানাই ভাল। প্রাচীন বাংলায় অনার্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বাগদি, কৈবর্ত, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ছিল। তবে কৈবর্তদের বিভিন্ন সময়ে রাজ-ক্ষমতা লাভ বা রাজ-ক্ষমতার বৃত্তের মধ্যে অনেক প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকার সুযোগ হয়েছিল। সেজন্য তারা বারে বারে সমাজের সামনের সারিতে আসতে পেরেছিল। তারা খুবই বলবান ও যোদ্ধা প্রকৃতির ছিল।[৪২] তাই বিংশ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলনগুলিতেও সেই সংগ্রামী মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছিল।

<u>সূত্রনির্দেশ:</u>

১. রমাকান্ত দাস, *কৈবর্ত সম্প্রদায়: উদ্ভব ও পরিচিতি*, ভূমিকা, শিলচর: কোয়ালিটি গ্রাফিক্স, ২০১৫, পৃ. ৬

২. যতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ও শৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.), *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড- ৩, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃ. ১৮৯

৩. রমাকান্ত দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

৪. যতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ ও শৌরিন্দ্র কুমার ঘোষ (সম্পা.), *অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী*, খণ্ড- ৩, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃ. ১৮৯-১৯১

৫. রমাকান্ত দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

৬. রমাকান্ত দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৭. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, মহেন্দ্রনাথ দাস, মেদিনীপুর, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ১১

৮. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ ১২

৯. হরিশংকর জলদাস, *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ১৫

১০. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৩

১১. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭

১২. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, *বাঙালির জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়,* হাওড়া: মডার্ন বুক স্টোর্স, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭

১৩. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য', *ভারতবর্ষ*, ত্রয়োবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, বৈশাখ ১৩৪৩ (এপ্রিল ১৯৩৫), পৃ. ৩৯

১৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ রচনাবলী, কলকাতা: ইস্ট্রার্ণ ট্রেডিং, ১৯৫৬, পৃ. ৩৬০

১৫. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত, প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫-১৬

১৬. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত, প্রাগুক্ত*, পৃ ২৭

১৭. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত, প্রাগুক্ত*, পৃ ১৫-১৬

১৮. রমাকান্ত দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

১৯. হরিশংকর জলদাস, *নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২০. সুহৃদ কুমার ভৌমিক, *বাঙালির জাতিতত্ত্ব ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

২১. সুচন্দ্রা ঘোষ, 'রিডিং বাউন্ডারি স্পেসিফিকেশনস্ অফ দ্য কপার প্লেটস্ অফ ধর্মপাল অফ কামরূপ', *প্রত্নসমীক্ষা,* নিউ সিরিজ, খণ্ড ২, ২০১১, পৃ. ১৩১-১৩৮

২২. নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'কৈবর্ত্তরাজ দিব্য', *ভারতবর্ষ,* ত্রয়োবিংশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: বৈশাখ ১৩৪৩ (এপ্রিল ১৯৩৫), পৃ. ৩২-৪১

২৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ রচনাবলী, কলকাতা: ইস্ট্রার্ণ ট্রেডিং, ১৯৫৬, পৃ. ৪১৭-২১; সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়(সম্পা.) *দলিতের অখ্যানবৃত্ত,* কলকাতা, মৃত্তিকা, পৃ. ৮২

২৪. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা

২৫. সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), *বঙ্গদর্শন,* নীহাররঞ্জন রায়: শততম জয়ন্তী, নির্মলকুমার বসু, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র, ৬-৭ যুগ্ম সংখ্যা, ২০০৫, পৃ.৪৭

২৬. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'বাংলায় জাতির উৎপত্তি', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা) *জাতি, বর্ণ ও সমাজ,* ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডিজ, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃ.১৯

২৭. নির্মল কুমার বসু, *হিন্দু সমাজের গড়ন,* শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৪৮,পৃ. ৩২

২৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ.৫-৬

২৯. শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ, *বাঙালি জাতি পরিচয়,* কলকাতা, সাহিত্যলোক, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

৩০. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা,* কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.১১

৩১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা) *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টাডিজ, দিল্লি, ১৯৯৮, পৃ.৭

৩২. নিকোলাস ডার্কস, *দ্য হলো ক্রাউন: এথনোহিস্ট্রি অব অ্যান ইন্ডিয়ান কিংডম*, কেম্ব্রিজ: কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃ. ২৮

৩৩. গেইল ওমভেট, *দলিতস অ্যান্ড দ্য ডেমোক্রেটিক রেভলিউশন: ড. আম্বেদকর অ্যান্ড দলিত মুভমেন্ট ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া*, নিউদিল্লি: সেজ, ১৯৯৪, পৃ.৪৬

৩৪. গেইল ওমভেট, 'অ্যান ইন্ট্রোডাকটরি এস্যে', ওমভেট (সম্পা.) *ল্যাণ্ড কাস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়ান স্টেটস*, দিল্লি: সাউথ এশিয়া বুক, ১৯৮২, পৃ. ৯-৫০

৩৫. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৫১, পৃ. ৬৯-৭০

৩৬. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কাস্ট, পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য রাজ, ১৮৭২-১৯৩৭*, কলকাতা: কে.পি.বাগচি, ১৯৯১, পৃ. ৭৬

৩৭. স্বরাজ বসু, 'ডিনামিক্স অফ অ্যা কাস্ট মুভমেন্ট: দ্য রাজবংশীস অফ নর্থ বেঙ্গল, ১৯১০-১৯৪৭, নিউ দিল্লী, মনোহর পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০০৩

৩৮. ডি.ডি.কোশাম্বী তাঁর 'অ্যান ইন্ট্রোডাক্সন টু দ্য স্টাডি অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', সঙ্গম বুকস্ লি., নিউ দিল্লি, ২০০৪, পৃ. ১০৮

৩৯. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভূমিকাঃ ভারতীয় ইতিহাস, বাঙালি সমাজ ও জাতিবর্ণ সমীকরণ', সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত) ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতিবর্ণ সমীকরণ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৯

৪০. রূপকুমার বর্মণ, 'ইয়েস! সিডিউল কাস্টস ক্যান রাইট: রিফ্লেকশন অন দ্য ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড অ্যাসারটিভ রাইটিংস্ অব দ্য সিডিউল কাস্টস অফ কলোনিয়াল বেঙ্গল',

কন্টেমপোরারি ভয়েস্ অব দলিত, ভল্যুম ৮, নং ১, সেজ পাবলিকেশন, নিউ দিল্লি, পৃ. ৪৭-৬১

৪১. সাক্ষাৎকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ২০১৭

৪২. সাক্ষাৎকার, সুমিত সরকার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২৪ আগস্ট ২০১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

জনগণনার নিরিখে কৈবর্ত জাতি

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অবস্থান ২১ ডিগ্রি ৩৬’ থেকে ২২ ডিগ্রি ৫৭’ উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৬ ডিগ্রি ৩৩’ থেকে ৮৮ ডিগ্রি ১১’ পূর্ব দ্রাঘিমায়। বাংলা প্রদেশের বৃহত্তম ও জনসংখ্যাবহুল জেলা হল এই মেদিনীপুর। তৎকালীন বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভূক্ত এই জেলার আয়তন ৫১৮৬ বর্গমাইল। এর উত্তরে রয়েছে বাঁকুড়া জেলা; পূর্বে হুগলি নদী ও রূপনারায়ণ নদী, একইসঙ্গে চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলা; দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার বালাসোর জেলা ও ময়ূরভঞ্জ জেলা এবং উত্তর পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা। নদীমাতৃক বাংলার এই জেলাতেও নদী বলতে হুগলি, রূপনারায়ণ, হলদি, কাঁসাই, রসুলপুর, সুবর্ণরেখা, শিলাবতী ইত্যাদি। এই জেলার প্রাকৃতিক অবস্থান এতটাই উপযুক্ত যার একদিকে সমতলভূমি ও সড়কপথের সঙ্গে যোগাযোগ আর অন্যদিকে জলপথে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে নৌবাণিজ্য ও বর্হিদেশে পাড়ি দেওয়ার সুবন্দোবস্ত।

ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ বিংশ শতকে জনসংখ্যার বিচারে বাংলা তথা সারা ভারতের বৃহত্তম জেলা হল এই মেদিনীপুর জেলা। মেদিনীপুর জেলার মোট আয়তন ১১,০৪৪ স্কোয়ার কিলোমিটার। পরবর্তী সময়ে পূর্ব মেদিনীপুরের আয়তন ৪৭৩৬ স্কোয়ার কিমি আর পশ্চিম মেদিনীপুরের আয়তন ৬৩০৮ স্কোয়ার কিমি হয়েছে। এই জেলা মেদিনীপুর সদর, খড়গপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও হলদিয়া মহকুমায় বিভক্ত ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার্থে ১লা জানুয়ারি ২০০২ সালে এই জেলার পশ্চিমাংশ পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্বাংশ পূর্ব মেদিনীপুর এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই জেলা ভাগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে ডেপুটেশন, আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে। এমনকি মেদিনীপুরের বিধায়ক সুকুমার দাস ১৯৯৪ সালে বিধানসভার অধিবেশনে মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সংস্কার করতে আবেদন করেন এবং সেইসঙ্গে জেলাকে দুইভাগে ভাগ করার আবেদন জানান।[১] মেদিনীপুর সদর, খড়গপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল মহকুমা পশ্চিম মেদিনীপুরের মধ্যে অবস্থান করে। অন্যদিকে তমলুক, কাঁথি, হলদিয়া মহকুমা পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। পরে এগরা মহকুমার উদ্ভব হয় কাঁথি মহকুমার অংশ থেকে। সম্প্রতি ৪ এপ্রিল ২০১৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, গোপীবল্লভপুর সহ কিছুটা অংশ নিয়ে গঠিত হয় ঝাড়গ্রাম জেলা। যদিও ঔপনিবেশিক আমলেও অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার আয়তন বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু এলাকা সংযুক্ত বা বিয়োজিত হয়েছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ নাগাদ বাংলায় অন্তত ১৬টি প্রধান জনপদের কথা জানা যায়। সাধারণত জনপদ বলতে লোকালয়কে বোঝায়। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে

জনপদ শব্দটি জনবসতি সম্পন্ন কৃষিপ্রধান এলাকাকেই বোঝায়। আর এই জনপদগুলির আয়তন বাড়লে তা মহাজনপদের মর্যাদা পায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'তে কৃষিকাজের বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রীক লেখকদের বিবরণ অনুযায়ী ভারতীয় জনগোষ্ঠী সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে দ্বিতীয় ভাগটি কৃষিজীবি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে গান্ধার শৈলীর ভাস্কর্যে কৃষককে হলচালনারত অবস্থায় দেখা যায়। গ্রীক লেখকরা সকলেই একমত যে এই ভাগটি ছিল সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশই ছিল কৃষিজীবি।[২]

উনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ইংরেজ গবেষক বুকানন হ্যামিলটন পূর্বভারতে নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন সমাজের প্রান্তিক মানুষ সমাজের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক গবেষক ই.টি.ডালটন (E.T.Dalton) তাঁর *ট্রাইবাল হিস্ট্রি অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াঃ ডেসক্রেপটিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল* গ্রন্থে, ডব্লিউ.ডব্লিউ.হান্টার (W.W.Hunter) তাঁর *স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, কুড়ি ভল্যুম*-এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আবার কয়েকজন ইংরেজ শাসন কাঠামোর মধ্যে থেকে নিম্নবর্ণীয় মানুষজনের সম্পর্কে বেশকিছু তত্ত্বের প্রয়োগ করেছেন। এদের মধ্যে এইচ.বেভারলি (H. Baverly), জেমস.ওয়াইজ (James Wise), এইচ.এইচ.রিসলে (H.H.Risley), প্রমুখ নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থান ও তাদের বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার জনসংখ্যা নির্ণয়ে জেলার তৎকালীন জজ্ ও ম্যাজিস্ট্রেট স্যার এইচ.স্ট্র্যাচি (Sir H.Strachey) ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর রিপোর্টে এই জেলার জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষের মতো। এই পরিসংখ্যানের সাথে পরবর্তী পরিসংখ্যানের তুলনামূলক কোন বিচার বিশেষভাবে নাও হতে পারে। কেননা বিভিন্ন সময়ে জেলার বিভিন্ন অংশ সংযোজিত বা বিয়োজিত হয়েছে। পাশাপাশি বেশকিছু অংশ বর্তমান হুগলি বা ওড়িশার বালাসোরের মধ্যে রয়েছে। তেমনই হিজলীর অংশ একটি আলাদা কালেক্টরেট গঠন করেছিল। ১৮৩৭ সালে হিজলী সহ সমগ্র মেদিনীপুর জেলার আনুমানিক জনসংখ্যা ১৩,৬০,৬৯৯ জন। এক্ষেত্রে প্রতি বাড়ির গড় জনসংখ্যা ধরা হয়েছিল পাঁচজন করে। আবার ১৮৫২ সালে মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টর মি.এইচ.ভি.বেইলি(Mr. H.V.Bayley) সে সময় একই পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান দেখান ১৫,৭৬,৮৩৫ জন। বেশকিছু বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে মেদিনীপুরের কালেক্টর স্যার উইলিয়াম হারসেল (Sir William Herschell) জেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা চালান। তিনি চাষযোগ্য প্রতি একর জমিতে চারশো জন গড় ধরে জেলার মোট ২৯২৪ একর চাষযোগ্য জমির হিসাবে মোট জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেখান ১,১৬৯,৬০০ জন এবং মেদিনীপুর শহরের জন্য ৩০, ০০০ জন। সর্বমোট সম্পূর্ণ জেলার পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে ১, ১৯৯, ৬০০ জন।

ভারতবর্ষে অতীতে লোকগণনার বর্তমান প্রথাগত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। সম্রাট অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্রের নাগরিকদের সংখ্যাদি গণনাভুক্ত ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসক

বুকানন হ্যামিল্টন লোকসংখ্যা নির্ণয়ে আঞ্চলিকভাবে প্রচেষ্টা চালান। এরপর ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে সর্বপ্রথম জাতিপরিচয়সহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিসংখ্যান নেওয়ার চেষ্টা সরকারিভাবে শুরু হয় ১৮৭১-৭২ সালে। এইসময় ভারতীয়দের প্রধানত হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান – এই চারভাগে গণনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান, শিখ কিম্বা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছাড়া বাকি সকল নাগরিকদেরই গড়ে হিন্দু হিসাবে গণনা করা হয়। মেদিনীপুর জেলাতেও একইসঙ্গে জনগণনার কাজ শুরু হয় ২৭ জানুয়ারি ১৮৭২ সালে। এই জনগণনার প্রধান সেন্সাস কমিশনার ছিলেন মি.এইচ.বেভারলি (Mr. H.Baverley)।

১৮৭১-৭২ সালের প্রথম জনগণনার এই বিশাল কর্মযজ্ঞে জমিদার ও তার অনেক এজেন্ট সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এছাড়া জনগণনার এই মহাযজ্ঞে জেলার মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের মুখ্যাদের (mukhyas) নিযুক্ত করা হয়েছিল। এইসময় বেশিরভাগ কাজটা করতে হয়েছিল পুলিশকে। ১৮৭২ সালের এই আদমশুমারিতে মেদিনীপুর জেলার আয়তন ৫০৮২ বর্গমাইল আর মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,৪০,৯৬৩ জন । এদের মধ্যে পুরুষ ১,২৫৭,১৯৪ জন এবং মহিলা ১,২৮৩,৭৬৯ জন। ১৮৭২ সালে এই জেলায় কৈবর্তদের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,৯২,১৪০জন। এই জেলা মোট ১২,৯৬২টি গ্রাম এবং ৪৪৬,০৪৫টি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তবে জেলার সবচেয়ে বেশি জনঘনত্বপূর্ণ থানা এলাকা ছিল চন্দ্রকোনা, ঘাটাল, দাসপুর, পাঁশকুড়া এবং তমলুক। প্রত্যেকটি এলাকাতেই প্রতি বর্গমাইলে ৮৫০ জন মানুষ বসবাস করতেন। এইসমস্ত থানা এলাকা ছাড়াও পাশাপাশি দক্ষিণ পশ্চিমে জনবহুল এলাকাগুলি হল ডেবরা, সবং ও পটাশপুর। আর উত্তর পশ্চিমে বেশিরভাগটাই

জঙ্গল মহল এলাকা। আবার সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, খেজুরি, কন্টাই বা কাঁথি, রঘুনাথপুরে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৪০০ থেকে ৫০০ জনের মতো। ১৮৭২ সালের জনগণনায় মেদিনীপুর জেলার জনসংখ্যার বিবরণ দিতে গিয়ে সেন্সাস কমিশনার মি বেভারলি দেখান গ্রাম, পুলিশ স্টেশন, বাড়ির সংখ্যা, প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব, মহকুমা ইত্যাদির পরিসংখ্যান সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নীচে সারণিতে দ্রষ্টব্যঃ

Abstract of the Population, Area, etc. of each Subdivision and Police Circle (Thana) in Midnapore District, 1872.

Subdivisions	Police Circle	Area in Sq Mile	No. of Village, M	No. of House	Total Population	Persons per sq mi	Village, Mouza pe	Persons per villa	Houses per sq mil	Persons per house

			ouza			le	r sq mile	ge mouza	e	
Midnapur Head Quart	Midnapur	361	1185	32,933	172,672	478	3.28	146	91	5.2
	Narayangarh	300	828	23,543	129,553	432	2.76	156	78	5.5
	Dantan	217	592	19,3	112,3	518	2.73	190	89	5.8

er				29	72					
	Gopiballavpur	516	1113	24,001	120,310	233	2.16	108	47	5.0
	Jhargram	169	493	8,133	45,560	269	2.92	92	48	5.6
	Binpur	467	698	13,303	74,271	159	1.49	106	28	5.5
	Salbani	207	505	9,194	50,860	246	2.43	101	44	5.6
	Kes	2	8	1	1	4	3	1	8	5

	pur	29	39	9,381	08,929	76	.66	30	5	.6
		104	379	24,044	136,359	1311	3.64	360	231	5.7
	Debra	109	679	20,332	110,474	1016	6.23	163	187	5.4
	Sabang	283	454	38,277	214,755	759	1.60	473	135	5.6
Subduvisional Total		29	77	23	1,2	43	2.	16	78	5.

	62	65	2,470	76,388	1	62	4		5

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত:

Abstract of the Population, Area, etc. of each Subdivision and Police Circle (Thana) in Midnapore District, 1872.										
Subdivision	Police Circle	Area	No. of	No. o	Total Po	Perso	Villa	Perso	House	Perso

s		in Sq Mile	Village, Mouza	f House	pulation	ns per sq mile	ge, Mouza per sq mile	ns per village mouza	s per sq mile	ns per house
Ta	Tamluk	77	249	11,377	77,341	1004	3.23	311	148	6.8

ml				5						
uk	Panchkura	164	559	24,332	163,915	999	3.41	293	148	6.7
	Maslandpur	111	217	10,874	64,188	578	1.95	296	98	5.9
	Sutahata	111	229	8,479	53,546	482	2.06	234	76	6.3
	Nandigram	158	268	17,378	108,827	689	1.70	406	110	6.3
Subduvisional		6	1	7	46	7	2	3	1	6

Total	21	522	2,438	7,817	53	.45	07	17	.5

মেদিনীপুর জেলার কন্টাই (কাঁথি) মহকুমার পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত:

Abstract of the Population, Area, etc. of each Subdivision and Police Circle (Thana) in Midnapore District, 1872.										
Subdivisions	Police Circle	Area in Sq Mi	No. of Villag	No. of House	Total Population	Persons per s	Village, Mouza pe	Persons per villa	Houses per sq	Persons per h

		le	e, Mouza			q mile	r sq mile	ge mouza	mile	ouse
Contai (Kanthi)	Contai (Kanthi)	226	699	19,538	122,857	544	3.09	176	86	6.3
	Raghunathpur	126	327	10,295	54,579	433	2.60	167	82	5.3
	Egra	122	320	11,444	57,898	475	2.62	181	94	5.1

				5						
	Kedgeree(Khejuri)	75	119	5,900	36,003	480	1.59	303	79	6.1
	Pataspur	117	387	12,877	81,123	693	3.31	210	110	6.3
	Bhagwanpur	184	349	17,571	89,812	488	1.90	257	95	5.1
Subduvisional Total		850	2201	77,626	442,272	520	2.59	201	91	5.7

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা মহকুমার পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত:[৩]

Abstract of the Population, Area, etc. of each Subdivision and Police Circle (Thana) in Midnapore District, 1872.

Subdivisions	Police Circle	Area in Sq Mile	No. of Village, Mou	No. of House	Total Population	Persons per sq mile	Village, Mouza per	Persons per village	Houses per sq mile	Persons per house

			za				sq mile	mouza		
Garbeta	Garbeta	437	1005	24,941	145,264	332	2.30	145	57	5.8
	Chandrakona	121	278	20,174	106,480	880	2.30	383	167	5.3
	Ghatal	91	191	18,396	102,742	1129	2.10	538	202	5.6

Subduvisional Total	649	1474	63,511	354,486	546	2.27	240	98	5.6
Midnapur District Total	5082	12,962	446,045	25,40,963	500	2.55	196	88	5.7

Source: W.W.Hunter, *A Statistical Account of the District of Midnapur*, D.K.Publishing House, Delhi, 1st reprinted in India, 1974, pp.42-43.

১৮৭২ সালের এই সমীক্ষায় দেখতে পাওয়া যায় জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৯৫ ভাগ পুরুষ। হিন্দুদের মধ্যে বারো বছরের কম বয়সী পুরুষ ৪০৫, ৬০৪ জন ও মহিলা ৩২১, ২৯২ জন। তেমনি বারো বছরের উর্দ্ধে পুরুষের সংখ্যা ৭২৭,৬৮৬ জন ও মহিলা ৮,৩০,৯৮৬ জন। অর্থাৎ হিন্দুদের মোট জনসংখ্যা ২২,৮৫,৫৬৮ জন। আবার এই জেলায় মুসলিমদের মোট জনসংখ্যা ১৫৭,০৪৭ জন। মেদিনীপুর জেলায় ১৮৭২ সালের জনগণনা অনুযায়ী মেদিনীপুর সদরে মোট জনসংখ্যা ৩১,৪৯১ জন তার মধ্যে হিন্দু ২৩,৮৩১ জন ও

মুসলিম ৭২৭৩ জন, খ্রীষ্টান ২৭৩ জন ও অন্যান্য ১৫৫ জন। মেদিনীপুর শহরে একটি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। তেমনই চন্দ্রকোনা ফিসক্যাল ডিভিশনে চন্দ্রকোনা এই জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। যদিও পূর্বে তা হুগলি জেলার অধীনে ছিল। এই শহর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও বস্ত্রবয়ন শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি ছিল। চন্দ্রকোনার মোট জনসংখ্যা ৩১,৩১১ জন। এদের মধ্যে হিন্দু ২০,৯৩৩ ও মুসলিম ৩৭৮ জন। আর এই হিন্দুদের বেশিরভাগটাই কৈবর্ত শ্রেণীর মানুষজন। আবার চন্দ্রকোনা ফিসক্যাল ডিভিশনের অধীনে শিলাই নদীর তীরে ঘাটাল একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যা পূর্বে হুগলি জেলার অধীনে ছিল। এই শহরে ১৮৭২ সালের জনগণনায় মোট জনসংখ্যা ১৫,৪৯২ জন। এর মধ্যে হিন্দু ১৫,১৩০ জন, মুসলিম ৩৬১ জন ও খ্রীষ্টান ১ জন। এবার আমরা প্রাচীন তমলুক শহরের কথা বলব সেটি এই জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, যা রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরে চীনা পর্যটক ফা হিয়েন ও হিউ এন সাং পরিভ্রমণ করে গেছেন। এই শহরে মোট জনসংখ্যা ৫,৮৪৯ জন। এদের মধ্যে হিন্দু ৫,০৪৪ জন, মুসলিম ৪০০ জন, খ্রীষ্টান ৪ জন আর অন্যান্য ১ জন। এই শহর তার প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করেছে বহুকাল ধরেই। সামুদ্রিক বাণিজ্যে সপ্তগ্রামের মতোই তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। এই তমলুকে বিভিন্ন সময়ে অনেক কৈবর্ত রাজা রাজত্ব করেছেন। এখনও তমলুকে কৈবর্ত রাজাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। এই শহরেই কৈবর্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বর্গভীমা মন্দির অবস্থিত। তমলুকে ময়ূরধ্বজ রাজবংশের রাজা গরুড়ধ্বজের সময়ে মৎসজীবিদের দ্বারা শোলমাছের ব্যাঞ্জন সহকারে প্রতিদিন আহারের ব্যবস্থা করা ছিল। এ সম্পর্কে একটি কাহিনীও শোনা

যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও তমলুককে পবিত্র স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায় বর্গভীমা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা একজন কৈবর্ত রাজা। এই তমলুকে বিষ্ণুভিতে মন্দির ছিল। প্রাচীন তমলুকে ময়ূর রাজবংশের শেষ রাজা নিসঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে সেখানে এক শক্তিশালী আদিমজনের প্রধান কালু ভুইঞা সিংহাসনে বসেন। তাঁকেই কৈবর্তরাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এই প্রাচীন ভুইঞাদের বংশধরেরা হিন্দু ধর্মের সাথে স্বাঙ্গীকৃত হয়ে যেতে থাকে। ১৮৭২ সালের তমলুকের কৈবর্ত রাজা ছিলেন ২৫তম বংশধর। মেদিনীপুর জেলার এইসমস্ত শহর ছাড়াও নাড়াজোল, দাসপুর, কেশিয়ারী, আনন্দপুর, রঘুনাথপুর, কাশীজোড়া নামের শহর বিখ্যাত ছিল। ১৮৭২ সালের জনসংখ্যায় মেদিনীপুর জেলার প্রধান চারটি শহরের জনসংখ্যা পাওয়া যায় ৭৪,১৪৩ জন। বাকী সমস্তই গ্রামে বসবাস করত। মেদিনীপুর জেলার প্রধান এই চারটি শহরের জনসংখ্যার বেশিরভাগটাই কৈবর্ত জাতির মানুষজন। নীচের সারণীতে মেদিনীপুর জেলার শহরের জনসংখ্যা দ্রষ্টব্যঃ

Return of Population in Towns containing more than 5000 Inhabitants in Midnapur District.

Name of Towns	Hindus	Muhammedans	Christians	Others	Total Population
Midnapur	23,831	7,232	273	155	31,491
Chandrakona	20,933	378	-	-	21,311
Ghatal	15,130	361	1	-	15,492
Tamluk	5,044	800	4	1	5,849

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামের জনসংখ্যা যেমন সেইমতো গ্রাম প্রধানরা গ্রামের সমস্যা, বিবাদ, ঝামেলার মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করত। কোন কোন সময় একই ব্যক্তি দুটি গ্রামের প্রধান হিসাবেও কাজ করত। আবার গ্রামের জনসংখ্যা বেশী হলে দুইজন বা তিনজনেও প্রধান হিসাবে থাকত। আর এই গ্রাম প্রধানরা মনোনীত হতেন গ্রামবাসীদের দ্বারাই। এই প্রথা ব্রিটিশ শাসনের বউ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এমনকি মুসলিম শাসনামলেও সরকার দ্বারা নিযুক্ত হতেন। এই সমস্ত প্রধানদের যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হত ও তাঁরা জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন না, স্বাধীন থাকতেন। গ্রাম প্রধানরা সেসময় পাঁচটি পদের নাম অলঙ্কৃত করতেন। যেমন – বরুয়া, মুখ্যা বা মুখিয়া, মন্ডল, আমিন ও প্রধান। তবে এ সমস্ত পদগুলি সবই সাম্মানিক পদ ছিল। ইদানীং কালেও বাংলার বিভিন জেলার অনেক গ্রামে এখনও গ্রামপ্রধান, মুখিয়া বা মুখ্যাদের অস্তিত্ব রয়েছে, যাদের কাজ হল গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করা বা গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের চিন্তা করা। যদিও পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রাম প্রধানের বা মুখিয়াদের ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বা তাদের ভুমিকা ম্লান হয়ে পড়েছে। কিন্তু অস্তিত্ব এখনও বিলীন হয়ে যায়নি। ১৮৭৩ সালে মেদিনীপুর জেলার ডেপুটি কালেক্টর বাবু কালী প্রসন্ন রায় চৌধুরী এ সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট পেশ করেছেন। এছাড়াও সেখানে তিনি বিস্তৃতভাবে গ্রামের চৌকিদার(Village Watchman), তহশীলদার(Tax Collector), সর্দার(Head of Police Paiks), মহাজন(Village Merchant), গণক(Fortune Tellers), নাপিত, ধোপা, কামার, কুমোর, কাঁসারী, মালাকার,

কীর্তনীয়া ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৭২ সালে মি. সি.এফ.ম্যাগ্রথস্(Mr. C.F.Magrath) মেদিনীপুর জেলার জনসংখ্যার রিপোর্ট তৈরীর সময় জাতিগত ভাগ করেছেন। সেখানে তিনি কৈবর্তদের সংখ্যা দেখিয়েছেন ৬,৯২,১৪০ জন।[৪] এছাড়া জেলিয়া কৈবর্তদের সংখ্যা দেখিয়েছেন ২৯,৪৫০ জন, যা আসলে কৈবর্তদেরই একটি শাখা। এমনকি মালো, মাঝি, তিয়র, কেওট-সহ নামধারী সমস্ত মৎসজীবিরা রয়েছে তাদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, প্রায় এক লক্ষের মতো। তিনি আবার কৃষিকাজে নিযুক্ত সবমিলিয়ে সংখ্যা দেখিয়েছেন ১,০১৮,৬৮৬ জন। তাহলে সহজেই অনুমেয় যে জেলার মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশই কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর মানুষজন। এরপর আমরা পরবর্তী জনগণনা অর্থাৎ ১৮৮১ সালের আদমশুমারির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করবো।

ঔপনিবেশিক সরকারের দশ বছর অন্তর জনগণনার যে আইন সেই অনুযায়ী ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় জনগণনা নিঁখুতভাবে করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। এই আদমশুমারিতে জাতি-ধর্ম, পেশা-সহ বিভিন্ন পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল। এই জনগণনার মূল দায়িত্বে ছিলেন ডব্লিউ.সি.প্লাওডেন(W.C.Plowden). তিনি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ সালে বাংলার জনগণনার কাজ শুরু করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীতে জাতিগুলিকে ভাগ করে স্থান নির্দেশ করেছেন। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, সমাজে সম্পন্ন জাতি, তথাকথিত আদিবাসী জাতি বা aboriginal ইত্যাদি নামে বিভক্ত করেন। এই জনগণনায় মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,১৫,৫৬৫জন। অর্থাৎ ১৯৭২ সাল অপেক্ষা বেড়ে ওঠার বদলে অনেকটা কম দেখা যাচ্ছে। কেননা বর্ধমান জ্বরে মৃত্যুর কারণেই এই সংখ্যা কমে যায়। সেখানে কৈবর্তদের স্থান

ও সংখ্যা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আর সমগ্র বাংলায় কৈবর্তদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২,১০০,৩৭৯জন। প্লাউডেন জীবিকার ভিত্তিতে মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করেন। তার লেখা 'জার্নাল অব দ্য রয়্যাল স্ট্যাটিসটিক্যাল সোসাইটি' প্রবন্ধে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

১৮৯১ সালের জনগণনায় কমিশনারের দায়িত্বে ছিলেন জারভো অ্যাথেলস্টেইন বেইনস্(Jervo Athelstane Baines)। তিনি ১৮৮১ সালের জনগণনায় যেভাবে জাতি ভাগ করা হয়েছিল তার কিছুটা পরিবর্তন করেন। তিনি কাস্ট বা জাতির ভিত্তিতে ভাগ করেন তবে ধর্মকে আলাদা করে দেখেন। ১৮৯১ সালের পর জমিদার, মহাজন এবং ব্রিটিশ অনুগত শ্রেণীর কৈবর্তরা চাষী কৈবর্ত জাতি হিসাবে স্বীকৃত হয় এবং কৈবর্তদের দরিদ্রতম অংশ বা মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকার সাথে যুক্ত কৈবর্তরা জেলে বা জালিয়া কৈবর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই আদমশুমারিতে মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ২,৬৩১,৪৬৬ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১,৩১৫,৮২০ জন ও মহিলা ১,৩১৫,৫৭৬ জন। আবার মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের জনসংখ্যা ৮,০৩,৯৯৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩,৯৯,৭৪৬জন এবং মহিলা ৪,০৪,২৫২জন।[৫] আর জেলিয়া কৈবর্তের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। এই জনগণনায় এলাকাভিত্তিক এবং মহকুমা ধরে ধরে ধর্মীয় জনসংখ্যা আলাদা করে দেখানো হয়েছে।[৬] আবার আমরা দেখি এইসময় বাংলায় কৈবর্তরা কৃষিকাজে নিযুক্ত ২,২৩১,৫০০ জন।[৭]

বাংলার প্রধান কয়েকটি জেলায় কৈবর্ত জনগোষ্ঠী (১৮৯১)

জেলা	কৈবর্ত জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মেদিনীপুর	৮,০৩,৯৯৮	৩,৯৯,৭৪৬	৪,০৪,২৫২
হাওড়া	১,৭৮,১৫৫	৮৬,২৫৯	৯১,৮৯৬
চব্বিশ পরগণা	১,৬৩,৯৭০	৮৩,৩১২	৮০,৬৫৮
হুগলী	১,৪৩,৭৮০	৭১,১৫৮	৭২,৬২২
নদীয়া	৯৯,৪১৯	৪৯,৫৭৪	৪৯,৮৪৫

বিংশ শতকের গোড়াতেই ১৯০১ সালে ব্রিটিশ ভারতের জনগণনার দায়িত্বে যিনি ছিলেন তিনি হলেন এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত বিশেষজ্ঞ হার্বাট হোপ রিসলে (Herbert Hope Risley, 1851-1911)। রিসলে ১৮৭৩-৮৫ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৫ সালে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা চালান যা ‘এথনোগ্রাফিক সার্ভে অফ বেঙ্গল’ নামে পরিচিত। পরে ১৮৯১ সালে ‘The Study of Ethnography in India’ নামে প্রকাশিত হয়। একই বছরে তার অপর একটি বই চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ‘The Tribes and Castes of Bengal’ নামে।[৮] এর দুটিতে এথনোগ্রাফিক গ্লোসারি এবং অপর দুটিতে নৃতাত্ত্বিক তথ্য গ্রথিত আছে। ১৯০১ সালের রিপোর্টে মোট ১৬৪৬টি জাতির কথা বলা হয়েছে, যা ১৯৩১ সালে ৪১৪৭ টি জাতিতে গিয়ে দাঁড়ায়। রিজলে তাঁর গ্রন্থে দেখান যে

কৈবর্তরা - কৈবর্ত, দাস কৈবর্ত, চাষী দাস, হালিয়া দাস, পরাশর দাস, ধীবর, খেয়ান – এইরকম নামে পরিচিত ছিল। এমনকি বাংলায় কৈবর্তদের পদবী, গোত্রের উল্লেখ করেছেন।

মেদিনীপুর জেলার কৈবর্তদের একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে। মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগই কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর মানুষজন। ১৯০১ সালে মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা ২,৭৮৯,১১৪ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১,৩৯০,২৩৩ জন আর মহিলার সংখ্যা ১,৩৯৮,১৮১ জন।[৯] সারা বাংলায় তখন কৈবর্তের সংখ্যা ২,০৩৬,১২৯ জন। আর শুধুমাত্র মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তের সংখ্যা সাড়ে আট লক্ষের মতো। আবার এখানে জেলে কৈবর্ত জনসংখ্যা ২,৬২,৪১৩ জন। সেই সময়কালে সমগ্র বাংলা প্রদেশের জনসংখ্যা ৪২,৮৮১,৭৭৬ জন।[১০] ১৯০১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতির একটি পরিসংখ্যান দিলেই তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে।[১১]

মেদিনীপুর জেলার প্রধান প্রধান জনগোষ্ঠী (১৯০১)

জাতি	জনসংখ্যা	জাতি	জনসংখ্যা
কৈবর্ত	৮৮৩,৪০৪	করণ	৪৯,৩৮০
বাগদি	১,৪৮,৮১৮	ভুঁইমালী	৪৪,২৩৩
সাঁওতাল	১,৪৮,২৫১	কায়স্থ	৪১,৪৮৬

সদগোপ	**১,৩০,৮৬১**	**নাপিত**	**৪০,৯৪৯**
বৈষ্ণব(বৈরাগী)	**৯২,৯০৮**	**নমঃশূদ্র(চণ্ডাল)**	**৩৬,৮৫৭**
তাঁতি	**৮৭,৭০৮**	**পোদ**	**২৮,৫৪৭**
গোয়ালা	**৫০,১১৬**	**কুমার**	**২৭,৯৩২**

তথ্যসূত্রঃ ও ম্যালি, ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মেদিনীপুর জেলা, ১৯১১, পৃ. ৫৭.

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভেই জনগণনা শুরু হয় **১৯১১** সালে। এই জনগণনার দায়িত্বে ছিলেন এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট গেইট (Edward Albert Gait, 1863-1950)। **১৯১১** সালে মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা ২,৮২১,২০১ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১,৪১০,৭১৪ জন আর মহিলার সংখ্যা ১,৪১০,৪৮৭ জন। আর মেদিনীপুরের কৈবর্ত জনসংখ্যা ৮,৮৩,৪০৪ জন। সারা বাংলায় কৈবর্তের সংখ্যা ২,৪৮৪,৬৫৫ জন। সেখানে জেলে কৈবর্তের সংখ্যা ২,৮৫,০২০ জন। এছাড়া তীবর, পাটনী ইত্যাদি নামে অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। এইভাবে দেখা যায় সমগ্র কৈবর্ত জাতির জনসংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী জনগণনা আমরা দেখতে পাই **১৯২১** সালে। এই সময় বাংলার দায়িত্বে ছিলেন জে.টি.মার্টিন (J.T.Marten)। এখানে কৈবর্তদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল। মেদিনীপুরে কৈবর্তদের মধ্যে কিছু জমিদার ও তালুকদার হিসেবে পরিগণিত হতেন। তবে বেশিরভাগ কৈবর্তই চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। **১৯০১** সাল থেকেই চাষী কৈবর্তরা

অনেকে মাহিষ্য নামে নিজেদের পরিচিতি ঘটানোর চেষ্টা করে। তাই ১৯২১ সালের জনগণনায় চাষী কৈবর্তদের পরিসংখ্যান দেওয়ার সময় চাষী কৈবর্ত(মাহিষ্য) উল্লেখিত আছে। আসলে চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য একই জাতি। একই সঙ্গে কৈবর্তদের অন্য ক্ষুদ্র অংশ মৎস্যজীবী ও মৎস্যব্যবসায়ে নিযুক্তরা জেলিয়া কৈবর্ত বা আদি কৈবর্ত নামে পরিচিতি লাভ করে। সেইজন্য তাদের পরিসংখ্যানও আলাদা করে দেখানো হয়। সমগ্র মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা যেখানে ২৮,৬৬,২০১ জন। সেখানে মেদিনীপুরের কৈবর্তের জনসংখ্যা ৮,৫৬,০৪৭ জন। আর সারা বাংলা প্রদেশে মোট কৈবর্তের সংখ্যা ২৫,৯৪,৭৩৩। তার মধ্যে পুরুষ ১৩,১১,৯৩২জন এবং মহিলা ১২,৮২,৮০১ জন এবং জেলে কৈবর্তের সংখ্যা ৩,৮৩,২২৫ জন। এখানে বাংলার প্রধান তিনটি জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল।[১২]

বাংলার প্রধান তিনটি জনগোষ্ঠী (১৯২১)

জাতি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
কৈবর্ত	২৫,৯৪,৭৩৩	১৩,১১,৯৩২	১২,৮২,৮০১
নমঃশূদ্র	২০,০৬,২৫৯	১০,১৯,০৫৭	৯৮৭,২০২
রাজবংশী	১৭,২৭,১১১	৮,৯৭,০৩৫	৮,৩০,০৭৬

তথ্যসূত্রঃ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯২১, Vol. I, Part-II, Table- XIII, P. 160

একইসঙ্গে এইসময় সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বাংলার কৈবর্তদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে পারি। তবে এখানে চাষী কৈবর্ত এবং জেলিয়া কৈবর্ত এই দুইটি অংশেরই পুরুষ- মহিলা নির্বিশেষে বিবাহাদির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল জনগণনার রিপোর্টের ভিত্তিতে।[১৩]

বাংলায় কৈবর্তদের সামাজিক (বিবাহিত) অবস্থান (১৯২১)

জাতি	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	অবিবাহিত	বিবাহিত	বিধবা
কৈবর্ত চাষী (হিন্দু)	২২০৬৩৪৮	**১১১১৪১০**	**১০৯৪৯৩৮**	**৮৫৫৫৪৮**	**৯৭৯৯৯৯**	**৩৭০৮০১**
কৈবর্ত জালিয়া (হিন্দু)	**৩৮৩২২৫**	**১৯৭৭৬৭**	**১৮৫৪৫৮**	**১৫৪৩১২**	**১৬৯৫২৭**	**৫৯৩৮৬**

তথ্যসূত্রঃ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, **১৯২১**, Vol. I, Part-II, Table- XIII, P. 166

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ ভারতের যে জনগণনা হয় তার দায়িত্বে ছিলেন জে. এইচ. হাটন (J.H.Hutton)। এইসময় বাংলা প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৮,৬৫,৮০,৭২৩ জন। এই জনগণনায় চাষী কৈবর্তের স্থলে চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) নাম প্রথম জুড়ে দেওয়া হয়। **১৯২১** সালে মি. থমসন তাদের ডিপ্রেসড ক্লাস হিসাবে জুড়ে দেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশনের কাছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সেইসঙ্গে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী জানাতে থাকে।[১৪] তাদের সংখ্যা পাওয়া যায় ২৩,৮১,২৬৬ জন। যা **১৯২১** সাল অপেক্ষা ৭.৭ শতাংশ জনসংখ্যা বেড়েছে। আর আদি কৈবর্ত বা জেলিয়া কৈবর্তের জনসংখ্যা হল ৩,৫২,০৭২ জন। এই

সময়ে মেদিনীপুরের মোট জনসংখ্যা ২,৭৯৯,০৯৩ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১,৪১৭,০২৫ জন আর মহিলার সংখ্যা ১,৩৮২,০৬৮ জন। আর মেদিনীপুরের কৈবর্ত জনসংখ্যা ৮,৮৩,৩৬৭ জন। সারা বাংলায় কৈবর্তের সংখ্যা ২,৪৮৪,৬৫৫ জন। সেখানে জেলে কৈবর্তের সংখ্যা ২,৮৫,০২০ জন। এছাড়া তীবর, পাটনি ইত্যাদি নামে অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া আছে।

১৯৩১ সালের জনগণনা আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা এরপর থেকে আর সমস্ত জাতির বিস্তারিত খবরাখবর আমরা পাই না। তবে এই সময় পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখতে পাই চাষী কৈবর্তরা হল বঙ্গদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'Report of the Age of Consent Committee -1928-29' তে আমরা জানতে পারি সেকথা। সেখানে উল্লেখ রয়েছে – 'In Bengal the Chasi Kaibartta class is the largest caste among the Hindus, its population being over 2 millions. The members belong to the Depressed Classes.'[১৫] এই সময় থেকে আরো কিছু জিনিস খেয়াল করা যায় তা হল এই সময়ের পূর্বে কৈবর্তদের সরকারি দলিল দস্তাবেজে জাতি – কৈবর্ত্ত, পেশা চাষাদির উল্লেখ থাকত। এরপর থেকে লেখা হল জাতি- মাহিষ্য অথবা হিন্দু। অর্থাৎ ১৯৩১ সালের পরে বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনায় জাতি হিন্দু লিখিতে বাধ্য হয়। ১৯২৩ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড কমিশনের রিপোর্টেও চাষী কৈবর্ত ও জেলিয়া কৈবর্তকে চারিবর্ণের বাইরে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে দেখানো হয়েছে। এরপর চাষী কৈবর্তের সংখ্যা আমরা সহজে পেতে পারি না। তবে আমরা জেলে কৈবর্তের সংখ্যার উল্লেখ

পাই। যদি ১৯৩১ সালের চাষী কৈবর্তের সংখ্যার গড় করে নিই তাহলেও বলা যায় আনুমানিক পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান নয় কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় তিন কোটির মতো। এখানে ১৯৪১ এর জাতিভিত্তিক কৈবর্তদের পরিসংখ্যান দেওয়া গেল না তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে। এবার পরবর্তী জনগণনাগুলিতে ১৯৪১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত জেলিয়া কৈবর্তদের সংখ্যাটা পাওয়া যায়।

যাইহোক সবশেষে আমাদের আলোচ্য জেলা মেদিনীপুরে বিংশ শতকের শেষে ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৬১০,৭৮৮ জন। যেখানে ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৮০,১৭৬,১৯৭ জন। তার মধ্যে স্বাক্ষর পুরুষ মহিলা মিলিয়ে ৬১৬৪৩১৬ জন এবং নিরক্ষরের পরিমাণ ৩,৪৪৬,৪৭২ জন। এবার আমরা ১৯৪১ সাল থেকে বাংলায় জেলিয়া কৈবর্তের জনসংখ্যা এক নজরে দেখে নিতে পারি।[১৬]

সাল	জেলিয়া কৈবর্তের সংখ্যা
১৯৪১	৭২,৭২৪ জন
১৯৫১	৮৪২১৮ জন
১৯৬১	১১৭৩৮৪ জন
১৯৭১	২০৪৬৭৯ জন
১৯৮১	৩১৮৩৪৫ জন
১৯৯১	৪৪২৭৮৩ জন
২০০১	৪০৯৩০৩ জন

মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ভিত্তিক প্রতি স্কোয়ার মাইলে জনঘনত্বের একটা পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যেতে পারে ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত।[১৭]

মহকুমা	**১৯৫১**	**১৯৪১**	**১৯৩১**	**১৯২১**	**১৯১১**	**১৯০১**	**১৮৯১**
গড় ঘনত্ব (লোক স্কোয়ার মাইল)	৬৩৯	৬০৭	৫৩৩	৫০৮	৫৩৭	৫৩১	৫০১
সদর	৫১৯	৪৭১	৪২২	৪১১	৪৫৮	৪৫০	৪৪১
কাঁথি	৮১২	৮২৯	৬৯৪	৬৭৩	৬৭৮	৬৬২	৫৯৮
তমলুক	১০৫৩	১০০৫	৮৫৯	৭৯৫	৮০৩	৭৭৯	৭১৪
ঘাটাল	৮৪৫	৮০০	৭৪২	৭৩২	৮১৮	৮৮২	৮৯০
ঝাড়গ্রাম	৩৮৯	৩৫৯	৩২৮	২৯৫	৩০৯	৩০৪	২৭৪

মেদিনীপুর জেলার নারী-পুরুষ অনুপাতের একটা পরিসংখ্যান দেখে নেওয়া যেতে পারে ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত।[১৮]

	১৯৫১	**১৯৪১**	**১৯৩১**	**১৯২১**	**১৯১১**	**১৯০১**
মোট	৯৫৫	৯৫৫	৯৭৫	৯৯১	১০০০	১০০৬
গ্রামভিত্তিক	৯৬১	৯৬৬	৯৮৫	৯৯৭	১০০৬	১০০৯
শহরভিত্তিক	৮৮৫	৭৯৮	৮০৩	৮২৯	৮৪৭	৯৩৫

১৯৭১ সালে মেদিনীপুরে জনগনায় কৈবর্তের সংখ্যা পাওয়া যায় নি। তবে এই সময় মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৫৫০৯২৩৬ জন। জনঘনত্ব প্রতি স্কোয়ার কিমিতে ৪০১ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে নারী হল ৯৪৫ জন। এই সময়কালে স্বাক্ষরতার হার ৩২.৮৭%।[১৯] ১৯৮১ সালের জনগণনায় মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৬,৭৪২,৭৯৬ জন। এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল পূর্বের তুলনায় ২২.৩৯%। জনঘনত্ব প্রতি স্কোয়ার কিমিতে ৪৭৯ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে নারী হল ৯৫১ জন। এই সময়কালে স্বাক্ষরতার হার ৪২.৭৩%।[২০] ১৯৯১ সালের জনগণনায় মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৮,৩৩১,৯১২ জন। এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল পূর্বের তুলনায় ২৩.৫৭%। জনঘনত্ব প্রতি স্কোয়ার কিমিতে ৫৯২ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে নারী হল ৯৪৪ জন। এই সময়কালে স্বাক্ষরতার হার ৬৯.৩২%।[২১] পরবর্তী জনগণনায় অর্থাৎ ২০০১ সালের জনগণনায় মেদিনীপুর জেলার মোট জনসংখ্যা ৯,৬১০,৭৮৮ জন। এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হল পূর্বের তুলনায় ১৫.০৩%। জনঘনত্ব প্রতি স্কোয়ার কিমিতে ৬৮৩ জন। নারী-পুরুষ অনুপাত প্রতি হাজার পুরুষে নারী হল ৯৫৫ জন। এই সময়কালে স্বাক্ষরতার হার ৬৮.৬%।[২২] এইভাবে আমরা জনগণনার রিপোর্টের ভিত্তিতে মেদিনীপুর জেলার সংখ্যাতাত্ত্বিক একটা পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদিও পেশাভিত্তিক, চাষাবাদ, জলসেচ ইত্যাদি নানান তথ্য এখানে দেওয়া হল না।

জনগণনার ভিত্তিতে বাংলার প্রতিটি জাতির যে বিবরণ আমাদের কাছে লিপিবদ্ধ থাকত তা ১৯৩১ সালের পরে আর সেইভাবে করা হল না। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন এবং

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে অহিন্দু জাতিগুলি আলাদা করে আর নির্বাচনের সুবিধা পেল না। অতি সম্প্রতি পুনরায় জাতিভিত্তিক জনগণনা করার জন্যে বিভিন্ন রাজ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে জাতিগত জনগণনা চালু হয়ে যাবে। তাহলে একটা সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়। যে জাতির সংখ্যা যেমন তাদের আর্থিক পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষার হার ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য আমাদের কাছে উঠে আসবে। তাহলেই সেই সেই জাতির উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে। এই অধ্যায়ে বিশেষত চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) জাতির যে সংখ্যাতত্ত্ব সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী সময়ের তথ্যের অভাবে বিস্তারিতভাবে তাদের সংখ্যা দেওয়া গেল না। যদিও এই জনগণনার তথ্যকে একেবারে নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শাসকেরা নিজেদের শাসন কাজের সুবিধার্থে যেটুকু নথিভুক্ত রাখার প্রয়োজন ছিল সেগুলিতেই রেখেছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই সময়কালে সংখ্যাতত্ত্ব জানতে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য একেবারে নেই বললেই চলে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে একইভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাই এই জনগণনার রিপোর্ট আমাদের কাছে ঐতিহাসিকভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে জাতিগত জনগণনা না হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে কৈবর্ত জাতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ।

সূত্রনির্দেশ:

১. এসেম্বলি প্রোসিডিংস, অফিসিয়াল রিপোর্ট, ভল্যুম -১০৩, নং ১ ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ লাইব্রেরী, ১৯৯৪, পৃ. ৫৪৮

২. রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ইতিহাস গ্রন্থমালা, পৃ. ৯৮

৩. ডব্লিউ.ডব্লিউ.হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ডিসট্রিক্ট অফ মেদিনীপুর, ভল্যুম-৩, পার্ট-১, দিল্লি: ডি.কে.পাবলিশিং হাউস, প্রথম সংস্করণ ইন্ডিয়া, ১৯৭৪, পৃ. ৪২-৪৩

৪. ডব্লিউ.ডব্লিউ.হান্টার, এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, ডিসট্রিক্ট অফ মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত,

পৃ. ৫০

৫. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৮৯১, প্রভিন্সিয়াল টেবিল, টেবিল নং-ফাইভ, কলকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯৩, পৃ. ২৩৬

৬. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৮৯১, প্রভিন্সিয়াল টেবিল, টেবিল নং-ফোর, কলকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯৩, পৃ. ১৮১-১৮৫

৭. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৮৯১, প্রভিন্সিয়াল টেবিল, টেবিল নং-xvii, পার্ট-বি, কলকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯৩, পৃ. ১৭

৮. হার্বাট হোপ রিসলে, দ্য ট্রাইবস এণ্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল, ৪ ভল্যুম, কলকাতা

৯. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯০১, (https://censusindia.gov.in)

১০. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯০১ (https://censusindia.gov.in)

১১. ও'ম্যালি, ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মেদিনীপুর জেলা, কলকাতা: ১৯১১, পৃ. ৫৭

১২. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯২১, ভল্যুম-১, পার্ট-২, টেবিল-xii, পৃ. ১৬০

১৩. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯২১, ভল্যুম-১, পার্ট-২, টেবিল-xiii, পৃ. ১৬৬

১৪. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৩১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮

১৫. অফ রিপোর্ট অফ দ্য এজ অফ কনসেণ্ট কমিটি – ১৯২৮-২৯, পৃ. ৬৫-৬৬

১৬. রূপ কুমার বর্মন, *ফিসারিস এণ্ড ফিসারম্যান, এ সোসিও ইকোনমিক হিস্ট্রি অফ ফিসারিস এণ্ড ফিসারম্যান অফ কলোনিয়াল বেঙ্গল এণ্ড পোষ্ট কলোনিয়াল ওয়েস্ট বেঙ্গল,* কলকাতা: পৃ. ৫৮

১৭. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৫১, ভল্যুম-৬, পার্ট-১এ, পৃ. ১৭০-১৭১

১৮. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৫১, ভল্যুম-৬, পার্ট-১এ, পৃ. ১৭২

১৯. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৭১, সিরিস-২২, পার্ট-২এ, পৃ. v

২০. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮১, সিরিস-২৩, পার্ট-XIII, পৃ. xv

২১. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৯১, সিরিস-২৬, পার্ট-XIIA, পৃ. vii

২২. সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, ২০০১, সিরিস-২০, পার্ট- A & B, পৃ. ১১৩-১১৮

তৃতীয় অধ্যায়

কৈবর্ত জাতির রাজনৈতিক জীবন

ভারতবর্ষীয়দের কীর্তির প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ লিপিবদ্ধ নেই। একথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেছেন – 'সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই। .....ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগেরই কীর্ত্তি, আমরা যদি হাই তুলি, তাহাও বিশ্বসংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিস্বরূপ চিরকাল আখ্যাত হওয়া কর্তব্য, অতএব তাহাও লিখিয়া রাখা যাউক। এইজন্য গর্বিত জাতির ইতিহাস বাহুল্য; এইজন্য আমাদের ইতিহাস নাই।'[১] বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি সত্যিই যথোপযুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতির অনেক বীরত্বের কাহিনী আমরা শুনতে পাই কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বা ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের কাছে অপ্রতুল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় – 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই....বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?...তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।'[২] তাই আমাদের সকলকেই বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে। এই জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতি সাহেবদের দ্বারা

লিখিত ইতিহাস ছাড়া শ্রী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রমুখের প্রণীত বাঙ্গালার সামান্য কিছু ইতিহাসগ্রন্থ রয়েছে। তবুও বাঙ্গালীর দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস সেই অর্থে অপ্রতুল। তবে আধুনিককালে বেশকিছু ইতিহাসবেত্তা বাংলার ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চা করেছেন ও করছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সরকারি সিলমোহর পড়ে ১৯৩২ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকাকালীন।[৩] সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – 'ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।'[৪] সেরকমই বাংলার একটি আদিম কৌম জাতি হল কৈবর্ত জাতি। এই কৈবর্তদের দীর্ঘ একটা বীরত্বের ইতিহাস আছে কিন্তু সে সম্পর্কে বিশেষ আকর গ্রন্থ বা বিস্তারিত তথ্যাবলি নেই।

গ্রীক ইতিহাসবিদ ও পর্যটক মেগাস্থিনিস গঙ্গারিডি (Gangaridae) নামে এক জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন। এই জনপদের স্থান নির্ণয়ে তিনি রাঢ়দেশকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন – 'এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখনো কোন শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজাগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তিসৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না।...স্বয়ং আলেকজান্ডারও গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন।'[৫] এই গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্মা গঙ্গারাজবংশের আদিপুরুষ। পুরীর মন্দির, কোনার্কের মন্দির এই রাজবংশেরই কীর্তি। এই রাজবংশের

সাম্রাজ্য দক্ষিণে গোদাবরী থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালার ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র মেদিনীপুর, হাওড়া-সহ বর্ধমান ও হুগলীর কিছু অংশ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে কৈবর্তদের বিশেষ আধিপত্য ছিল। মহাভারতে কৈবর্ত জাতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে –

"সমুদ্র সেনং নির্জিত্য চন্দ্র সেনং চ পারথিবম্।

তাম্রলিপ্তঞ্চরাজানাং কবটাধিপতিং তথা।।

সুহ্মণামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসীনঃ।

পূর্বাণ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ।।"[৬]

অর্থাৎ পান্ডুতনয় ভীম দিগ্বিজয়ার্থে পূর্বভারতে এসে সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গের রাজাদের ও সুহ্মরাজকে পরাস্ত করে সাগর তীরবর্তী ভূখণ্ডে আসেন এবং সেখানকার অধিবাসী ম্লেচ্ছদের পরাস্ত করেন।

কৈবর্ত জাতি যে যোদ্ধা জাতি ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীনকালের বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকেই তা জানা যায়। কৈবর্ত জাতি অতীতে বার বার রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তাঁর বহু উদাহরণ পেয়ে থাকি। দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বৃহৎবঙ্গ অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত অঞ্চলে সর্বপ্রথম পাঁচটি দেশের উৎপত্তির কথা জানা যায়। বহু আগে থেকেই এগুলি কৌম জনপদ রূপে এই দেশগুলির পত্তন হয়েছিল। এখানেই পাঞ্চাল, মগধ, কর্বট, শিবি, চেত, তাম্রলিপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ ইত্যাদি ছোটো ছোটো রাজ্যের উল্লেখ পাই। বিদেশী লেখকদের বিবরণেও আমরা পাঞ্চাল, মগধ(প্রাসী), ওদুম্বরী, কর্বট(গাঙ্গেয় কলিঙ্গ), তাম্রলিপ্ত, উৎকল(মধ্য কলিঙ্গ), গঙ্গারিডি বা গঙ্গারিডাই প্রভৃতি জনপদের সবিশেষ উল্লেখ

পাই। এই গঙ্গারিডি, কলিঙ্গ ও প্রাসী এই তিনটি বৃহৎশক্তি মিলিতভাবে গড়ে তুলেছিল একটি যুক্তসাম্রাজ্য (conferedaration)। এই সাম্রাজ্যের গৌরব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। ডিওডোরাস বর্ণিত 'গঙ্গারিডি' কনফেডারেশন হিসাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-আসামের বিস্তীর্ণ এলাকাকেই ধরা হয়।[৭] এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। রাঢ়, বরেন্দ্র, গৌড়, সমতট প্রভৃতি নাম ঐ সময়ের অনেক পরে প্রচলিত হয়েছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমে মেদিনীপুর থেকে আরম্ভ করে হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমানের কিছু অংশকে গাঙ্গেয় কলিঙ্গ হিসাবে ধরা যেতে পারে। আর এই গাঙ্গেয় কলিঙ্গের রাজধানী ছিল পোরটালিস বা পূর্বস্থলী(বর্ধমান)। ঐতিহাসিক অতুল সুরের মতে মহাভারতে এই অঞ্চল কর্বট রাজ্য নামে বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান বাংলার কৈবর্তগণ এই কর্বট-কৌমের বংশধর।[৮]

পাল আমলে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিতম্' কাব্যে পালবংশের অন্তিমপর্বে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত বিদ্রোহের ঘটনার উল্লেখ আছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ সারা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। আনুমানিক ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে বরেন্দ্রভূমিতে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করে কৈবর্ত নেতা দিব্য বা দিব্যোক গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন। দিব্যোক, তাঁর ভাই রুদ্রক এবং রুদ্রকপুত্র ভীম বেশকিছুদিন বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত শাসন চালিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে পাল বংশের সম্রাট রামপাল, সামন্তচক্রের সাহায্য নিয়ে ভীমকে পরাজিত ও নৃশংসভাবে হত্যা করে রাজকীয় আধিপত্য উদ্ধার করেছিলেন। সাহিত্যিক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে রক্তক্ষয়ী কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামক উপন্যাসে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিস্তারিত কাহিনী রচনা করেছেন। তিনি তাঁর মুখবন্ধে বলেছেন – 'প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা কেউই কৈবর্ত বিদ্রোহকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি।

.....কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল এক শ্রেণী সংগ্রাম – পদদলিত এক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।'[৯] তিনি আরও বলেন যে, 'রামপাল যুদ্ধান্তে রাজধানী ডমর ধ্বংস করেছিলেন। শ্রেণীবিদ্বেষ আর কত নৃশংস হবে। হাজার হাজার কৈবর্ত পরিবার বরেন্দ্রভূমি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল রাঢ়বঙ্গের হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরে।'[১০]

কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আমরা যথেষ্টই লক্ষ্য করতে পারি। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রামচরিতের কিছু শ্লোকের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন কৈবর্ত বিদ্রোহ শুধু একটি জাতির বিদ্রোহ নয় বরং এটি ছিল একটি জনসাধারণের বিদ্রোহ। যেখানে দিব্যোক নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন মাত্র। কৈবর্ত বিদ্রোহের নায়ক দিব্য বা দিব্যোক পালদের পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি যে জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন তা রামচরিতে উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দও এই বিদ্রোহের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে কৈবর্তরা অনেকে ধীবরের পেশা অবলম্বন করলেও সমাজে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। শাসক হিসাবে দিব্যোকের উত্তরাধিকারী ভীমের জনপ্রিয়তা থেকেই সেকথা বুঝতে পারা যায়। কৈবর্ত সমাজে ভীম আজও বিদগ্ধ মানুষ বলেই পরিচিত।[১১] আবার অনেকে মনে করেন এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল না, এটি আসলে উত্তরবঙ্গের অনেক সামন্তের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তবে সেখানে কৈবর্তদের প্রাধান্য অবশ্যই ছিল। মার্ক্সীয় ইতিহাসবিদগণ এই বিদ্রোহকে কৃষক বিদ্রোহ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মা একে কৈবর্ত তথা কৃষকগোষ্ঠীর সম্মিলিত বিদ্রোহ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে এই বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী

শাসকের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদস্বরূপ।[১২] আসলে এর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে তিনিই প্রথম তুলে ধরেছিলেন। তাঁর মতে বেলোয়া তাম্রপট্টে কৈবর্তদের বৃত্তি থেকে উচ্ছেদ করে সেই জমি ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। পাল রাজারা কৃষিজীবি কৈবর্তদের জমি থেকে উৎখাত করেছিল যার ফলস্বরূপ তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তীকালে এই অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নিয়েছিল। তাদের এই সংগ্রাম ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কৈবর্তরা মহিষের পিঠে চড়ে অতি সাধারণ অস্ত্র দিয়ে পালদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে ভীমের নেতৃত্বে দ্বিতীয় যে বিদ্রোহটি হয়েছিল তা অনেক বেশী জনপ্রিয় ছিল। কৈবর্তদের নিপীড়িত শ্রেণী হিসাবে প্রমাণ করার জন্য তিনি রামচরিতের কিছু বর্ণনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১৩] ঐতিহাসিক বিনয় চন্দ্র সেনের মতে এই বিদ্রোহ ছিল বৌদ্ধ পাল রাজাদের বিরুদ্ধে শৈব ধর্মীয় কৈবর্তদের সম্মিলিত প্রতিবাদ অর্থাৎ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর কাছে এই বিদ্রোহ সমানভাবে ধর্মীয় তাৎপর্যবাহী ছিল।[১৪] আবার অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই বিদ্রোহ ছিল দলিতদের একটি বিদ্রোহ।[১৫] সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি অথবা প্রভাবশালী বলেই পাল আমলের ভূমিদান পট্টগুলিতে কৈবর্তদের উল্লেখ রয়েছে বার বার। যদিও দ্বিতীয় গোপালের সময়কালে তাম্রপট্টে গ্রামীণ সমাজের নীচুতলার অন্যান্য জাতি মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল ইত্যাদির সাথে কৈবর্তদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রসুকে ফুরুই-এর মতে কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল সমাজের উঁচুতলায় কৈবর্তদের উত্তরণের ইঙ্গিতবাহী। তবে পাল রাজাদের অন্য কোন লেখতে কিন্তু চন্ডালদের সাথে কৈবর্তদের এক আসনে বসানো হয়নি। অর্থাৎ চন্ডালদের মতো তাদের সমাজে হেয় করা হত না। রংপুর তাম্রপট্টের সম্পাদক রসুকে ফুরুইয়ের মতে এই লেখতে কৈবর্তদের ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত

করা হয়েছে।[১৬] তাদের মধ্যে গোষ্ঠীচেতনার আবির্ভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে পারি। যা পরবর্তী সময়ে দিব্যোকদের একেবারে সামনের সারিতে উঠে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। স্বভাবতই কৈবর্তরা আর সমাজের নীচুতলায় থাকতে রাজী ছিল না। এছাড়াও সন্ধাকর নন্দীর রামচরিতে কৈবর্তদের সম্পর্কে এরকম আরো বেশ কিছু তথ্য আমরা পেয়ে থাকি।

মেদিনীপুরের বিভিন্ন জমিদার ও রাজবংশ:

বাংলার উত্তরাংশের মতো পশ্চিমাংশেও কৈবর্তদের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কর্বট রাজ্যে ও তাম্রলিপ্তি এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাজা ও জমিদার রাজত্ব করতেন। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে এদের মধ্যে অনেকেগুলিতেই কৈবর্ত রাজবংশ স্বমহিমায় রাজত্ব করত। তাম্রলিপ্তিতে ধ্বজ বংশের রাজারা বেশকিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। দশকুমার চরিতে সুহ্মের রাজধানী হিসাবে দামোলিপ্তি বা তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত একটি মূল্যবান পুঁথিতে তাম্রলিপ্তির রাজা হিসাবে গোপীচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতকে তাম্রলিপ্তির কৈবর্ত রাজা কালু ভুইঞা-র উল্লেখ পাওয়া যায়। কালু ভুইঞার পরে যথাক্রমে ধাঙ্গড়, মুরারি, হরবার, ভাঙ্গড় ও রাজারাম প্রমুখ কৈবর্ত রাজারা এখানে রাজত্ব করেছিলেন।[১৭] পরবর্তীকালে রাজারাম ভুইঞার দুই পুত্র শ্রীমন্ত রায় ও ত্রিলোচন রায় রাজত্ব করেন। কৈবর্তরাজ শ্রীমন্ত রায়ের রাজত্বকাল ছিল ১৫৬৬ থেকে ১৬১৭ সাল পর্যন্ত। মুঘল আমলে এই ভুইঞাদের ‘রায়’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শ্রীমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই ও ছেলেদের মধ্যে জমিদারী ভাগ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে ১৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ রায় এই জমিদারীর একা অধিকারী হন।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কমল নারায়ণ জমিদারী পেলেও ১৭৫৭ সালে খাজনা বাকী থাকায় এই সম্পত্তি নবাবের খাসদখলে চলে যায়। ১৭৬৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, মহারাজা নন্দকুমার ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মধ্যস্থতায়, কোম্পানী নরনারায়ণের স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া ও তাঁর পরিবারবর্গকে জমিদারী ফিরিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে এই জমিদারীর বেশিরভাগ মহিষাদল রাজবংশের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল।[১৮]

একইরকমভাবে সবং ও ময়নার রাজবংশও কৈবর্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র বসুর মতে এই এলাকা সেইসময় জৌলিতি দন্ডপাঠ গঠিত ছিল। কৈবর্ত জাতিভুক্ত কালিন্দীরাম ছিলেন এখানকার প্রথম সামন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কালিন্দীরাম ছিলেন উৎকল রাজের অধীন এবং এদের বসবাস ছিল বালিসীতা অঞ্চলে। কালিন্দীরামের পরে পর্যায়ক্রমে মুরলীধর, বৈষ্ণবচরণ, চৈতন্যচরণ ও নন্দীরাম সামন্ত হয়েছিলেন। নন্দীরামের পুত্র গোবর্দ্ধনানন্দ, সঙ্গীত ও মল্লবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর এই শিল্পকলায় সন্তুষ্ট হয়ে উৎকলরাজ তাঁকে 'রাজা' ও 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি দিয়েছিলেন। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ময়নাগড়ের রাজবংশের সূচনাকালে রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ছিলেন এই বংশের মুখ্য পুরুষ। তাঁর বংশধরগণ বহুবছর এখানে রাজত্ব করেছিলেন। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে এই রাজবংশের জমিদারীর বেশীরভাগ অংশই খন্ড খন্ড করে নিলাম হয়ে গিয়েছিল।[১৯]

মেদিনীপুর শহর নিকটস্থ কর্ণগড়ের রাজা সুরথ সিংহের উচ্চপদে ছিলেন বলরামপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভীম মহাপাত্র নামে এক কৈবর্ত সন্তান। খড়্গাপুর মহালের সীমানা জুড়ে ছিল এই রাজ্যের বিস্তার। কৈবর্ত রাজা ভীমের পর তার পুত্র হরিচন্দন ও পৌত্র

মুকুন্দরাম রাজা হয়েছিলেন। মুকুন্দরামের পর পীতাম্বর ও শত্রুঘ্ন রাজা হয়েছিলেন। শত্রুঘ্ন খুব প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে এলাকার দস্যুদের উৎপাত দমন করেন ও জঙ্গল কেটে কৃষিকাজের পত্তন করেছিলেন। এইসময় শত শত তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে বলরামপুর দিয়ে পুরী যেতেন। তিনি তীর্থযাত্রীদের রাত্রিযাপনের জন্য তীর্থশালা স্থাপন করেছিলেন। তবে শত্রুঘ্নের পর তাঁর পুত্র নরহরি ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেন। নরহরির মৃত্যুর পর ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে বলরামপুরের রাজা হন বীরপ্রসাদ চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে জমিদারী নিয়ে নিজেদের মধ্যে গোলযোগ বাধে। শেষ পর্যন্ত খাজনা বাকী পড়ায় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে জমিদারী নিলাম হয়ে যায়।[২০]

হিজলী রাজ্যের অবসান ঘটলে মেদিনীপুরে সুজামুঠা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশও জাতিতে কৈবর্ত। গোবর্ধন রণঝাঁপ ছিলেন এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি হিজলীর নবাব সরকারে উঁচু পদে আসীন ছিলেন। সুজামুঠার রাজধানী ছিল বর্তমান ভগবানপুর থানার কাজলাগড়ে। এই গোবর্ধনের পর যথাক্রমে মাধবচন্দ্র, শ্রীধরনারায়ণ, গোপালনারায়ণ ও গোরাচাঁদ জমিদারীর অধিকারী হন। গোরাচাঁদের পর নরেন্দ্রনারায়ণ জমিদারী পান। তাঁর মৃত্যুর সময় ছেলেরা ছিল নাবালক। তাই তাঁর স্ত্রী জমিদারীর কাজ দেখাশুনা করতেন। পরে বড় হয়ে রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র গজেন্দ্রনারায়ণ ও পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ জমিদার হন। তাঁর সময়েই সুবিখ্যাত নবরত্ন মন্দির ও বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। আর মহেন্দ্রনারায়ণের পর দেবেন্দ্রনারায়ণ এবং ১৮০৭ সালে গোপালেন্দ্রনারায়ণ সুজামুঠা রাজবংশের জমিদার হন। কিন্তু তিনি অপুত্রক অবস্থায় ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে চলে যায়। তবে ঐ বংশের গোলকেন্দ্রনারায়ণের সময়ে এই

জমিদারী নিলাম হয়ে যায় ও বর্ধমানের রাণী কিনে নেন। এইভাবে এই রাজবংশ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

খন্ডরুই রাজবংশ ও তুর্কা জমিদারী দাঁতন থানার অন্তর্গত তুর্কাচৌর পরগণায় অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে একে তরকোল মহালও বলা হয়। জাতিতে কৈবর্ত কৃষ্ণদাস গজেন্দ্র মহাপাত্র ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পেশায় ছিলেন একজন দক্ষ সৈনিক। ষোল শতকে কৃষ্ণদাস খন্ডরুই রাজবংশের পত্তন করেন। কৃষ্ণদাসের পর ক্রমান্বয়ে লালবিহারী, লোলবিহারী, যশোদানন্দন এবং গঙ্গানারায়ণ এখানকার জমিদারী লাভ করেন। গঙ্গানারায়ণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটি বিরাট দীঘি নির্মাণ করান। তাঁর পুত্র পঞ্চানন গজেন্দ্র মহাপাত্র সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন। পরবর্তীতে এই রাজবংশের জমিদার কালীপ্রসন্ন প্রখ্যাত রাজনারায়ন বসুর সমসাময়িক ছিলেন।

আইন-ই-আকবরীতে বালিসাহী মহালের নামোল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে এই মহাল কালিন্দী ও উড়িষ্যা বালিসাহী নামে দুটি পরগণায় বিভক্ত হয়ে যায়। জাতিতে কৈবর্ত বিশ্বনাথ দাস ভুইঞা উড়িষ্যা বালিসাহীতে জমিদারী প্রতিষ্ঠিত করেন। উড়িষ্যার রাজা তাঁকে চৌধুরী উপাধি দেন। বিশ্বনাথের পরবর্তী সময়ে অষ্টম পুরুষ পদ্মনাভ পর্যন্ত প্রত্যেকের জ্যেষ্ঠপুত্র জমিদারীর অধিকারী হয়েছিলেন। পদ্মনাভের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে গোলযোগ বাঁধলে জমিদারী দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। এইভাবে ১৮০৮ সালের পর থেকে কুড়িজন জমিদারের নাম পাওয়া যায়। মোগলমারীর যুদ্ধের সময় জগদীশচন্দ্র ভুইঞা মোগলদের সাহায্য করে সুনাম অর্জন করেন ও সম্রাট কর্তৃক পুরস্কৃত হন। পরবর্তীকালে এই বংশের জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে চলে গিয়েছিল। এইভাবে আমরা দেখতে পাই

মেদিনীপুরে কৈবর্তরা বিভিন্ন রাজবংশ ও জমিদারী নিজেদের অধীনে রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কৈবর্তদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড:

বাংলা তথা ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে। কখনও শক, হুন, পাঠান বা মোঘল। আবার কখনো পর্তুগীজ বা ইংরেজ। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তাদের বাণিজ্যের আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালিয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদদৌলাকে পরাজিত করে ইংরেজদের বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত করার চেষ্টা করে। এই যুদ্ধে নবাবের হয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল। তিনি ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত পরিবারের সন্তান। ঐতিহাসিক নরোত্তম হালদার তাঁর ‘গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা’ নামক গ্রন্থে বলেছেন মোহনলাল কৈবর্ত(মাহিষ্য) সম্প্রদায়ের ছিলেন।[২১]

পলাশীর যুদ্ধে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে সেই ক্ষমতা পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নেয়। ফলে ১৭৬৫ সালে কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। এই সময় চাকলা মেদিনীপুরও কোম্পানীর অধীনে আসে। দেওয়ানী লাভের পর চলতে থাকে ইংরেজ কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্য, শাসন ও শোষণ।এরই সাথে উপকূলবর্তী জেলা মেদিনীপুরের মানুষের নিত্যবছরের সঙ্গী ছিল ভয়াবহ বন্যা। ক্ষতিগ্রস্ত হত হাজার হাজার মানুষ। এইভাবে শাসন শোষণ চলতে চলতে দেশীয় মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে

থাকে জমিদার, মহাজন ও সবশেষে এই ইংরেজদের ওপর। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যা মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহের আঁচ মেদিনীপুরেও পড়ে। সেখানে শেখাওয়াত ব্যাটালিয়নের পল্টন বিদ্রোহ শুরু হয়। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের পরিবর্তে শুরু হয় ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসন ও শোষণ। বিভিন্ন সময়ে দেশীয় (প্রায় ৫৫০ জন) রাজাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও নানারকম আইনের বাঁধনে চলল ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার। একইসঙ্গে চলতে থাকে ইংরেজদের স্বার্থে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক বিধি নিয়ম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার ভাগ্য ব্রিটিশের অধীন হলে ১৭৬০ সালে মীরকাশিম অবিভক্ত বাংলার কিছু জেলা ইংরেজ কোম্পানীকে দান করেছিল। মেদিনীপুর ছিল তাদের মধ্যে একটি। তখন থেকেই মেদিনীপুরের পরাধীনতার শুরু। তবে তখন থেকেই মেদিনীপুরবাসী কিন্তু সহজে পরাধীনতা মেনে নেয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীনেতার নেতৃত্বে আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংগঠিত করেছে। এসময়ের বিভিন্ন বিদ্রোহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চুয়াড় বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, নায়েক বিদ্রোহ ইত্যাদি। সেইসমস্ত আন্দোলনে প্রচুর সংখ্যক কৈবর্ত মানুষ অংশ নেয়। এতগুলি বিদ্রোহ ভারতের অন্য কোন স্থানে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বে ঘটেনি। একমাত্র মেদিনীপুরই তার ব্যতিক্রম। নীলবিদ্রোহে নদীয়ার বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর বিশ্বাস কৈবর্ত বাড়ির সন্তান। যদিও সবক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকার চরম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করতে সচেষ্ট হয়েছে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর প্রচেষ্টায় কলকাতায় স্থাপিত হয় ভারতসভা(Indian Association)। ভারতসভার প্রতিষ্ঠাবর্ষেই মেদিনীপুর জেলাতেও এর

২৯ টি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।[২২] এইভাবে বিংশ শতকের গোড়া থেকেই মেদিনীপুরের মাটিতে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিস্তার নিরন্তর ঘটতে থাকে। এদিকে সমান্তরালভাবে চলতে থাকে ইংরেজদের শাসন আর শোষণ।

এইভাবে যখন আর্থিক শোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল ও ব্রিটিশদের প্রতি ক্ষোভ বেড়ে চলল তখন এই ক্ষোভ প্রশমনের জন্য ব্রিটিশ কর্মচারী অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের নেতৃত্বে গড়ে উঠল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)। এই জাতীয় কংগ্রেসে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষজন, জমিদার ও নেতৃত্বস্থানীয় মানুষ যুক্ত ছিলেন। এটি আসলে ইংরেজদের কাছে 'সেফ্‌টি ভালব' হিসাবে কাজ করেছিল। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী মনোভাব ও ভিক্ষার নীতি অবলম্বনে ভারতবাসী কোন প্রকার দাবী আদায়ে বিশেষ সফল হল না। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের মধ্যেই চরমপন্থী মনোভাব দেখা দেয় বেশ কিছু নেতৃবৃন্দের মধ্যে। ইতিমধ্যে বাংলায় যুগান্তর, অনুশীলন সমিতি-সহ বেশ কিছু গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে। যাদের ধ্যান জ্ঞান হয়ে ওঠে চরমপন্থী উপায়ে বিপ্লবী কাজের মাধ্যমে বিদেশী শাসনকে উচ্ছেদ করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। যার ফলে অবিভক্ত বাংলার বিপ্লবীদের কর্মকান্ডে ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন চক্রান্ত করে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। সেখানে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার হেমচন্দ্র কানুনগো থেকে শুরু করে বহু বিপ্লবী ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমরা দেখতে চেষ্টা করব

বিংশ শতকের প্রথম থেকে স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সংঘটিত আন্দোলনে বাংলা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান মেদিনীপুর ও সেখানকার কৈবর্ত সন্তানদের বীরত্বের ঘটনা।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে কৈবর্তদের অবদান

ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য বিংশ শতকের গোড়া থেকেই মেদিনীপুর জেলায় সুপরিকল্পিত সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। বাংলার মেদিনীপুরে প্রথম বিপ্লবী সমিতি গড়ে ওঠে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর অধীনে।[২৩] পরবর্তীতে এর প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় কলকাতার হেদুয়ার কাছে ২১ নম্বর মদন মিত্র লেনে একটি ভাড়া বাড়িতে। সেসময় এখানেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়। এর প্রধান কর্ণধার ছিলেন বিপ্লবী প্রমথনাথ মিত্র। যিনি পেশায় ব্যরিষ্টার। এই সমিতির অনুকরণে মেদিনীপুর জেলাতেও ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বারীণ কুমার ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় যার নাম 'আনন্দমঠ'। সেসময় বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে মেদিনীপুরে আসেন ও এই কেন্দ্রে যোগদান করেন। ঐ বছরেই ভগিনী নিবেদিতাও মেদিনীপুরে এসে ঐ সমিতিতে গিয়ে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[২৪] এছাড়া যুগান্তর দল নামে যে সশস্ত্র সংগ্রামী সংস্থা গড়ে ওঠে, যার শাখা মেদিনীপুরেও প্রবলভাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করে। এইভাবে মেদিনীপুরের নানা স্থানে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। তমলুকেও সুরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের বাড়িতে পরিচালিত সমিতির নাম হয় 'মাতৃসদন'। এরকমই মেদিনীপুর শহর, কাঁথি, সবং, মুগবেড়িয়া, পটাশপুর, এগরা প্রভৃতি স্থানে গুপ্তসমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতিগুলিতে

যোগব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরা চালানো ইত্যাদি শেখানোর মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হত। একইসঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতি ও চরিত্রগঠনের জন্য গীতা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহ পাঠদান করা হত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক যুগান্তর(১৯০৬), বিপিন চন্দ্র পালের সম্পাদনায় ইংরেজি দৈনিক বন্দেমাতরম(১৯০৬), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সন্ধ্যা, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত সাপ্তাহিক নবশক্তি(১৯০৭), স্বরাজ, সোনার বাংলা, সুপ্রভাত, পল্লীচিত্র, দেশবার্তা, কর্মযোগিন, ধর্ম ইত্যাদি নানা ধরণের পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হতে থেকে। এই সমস্ত পত্র-পত্রিকার লেখা থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হত। আর এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই সেসময় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার যুবসমাজকে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে এইসমস্ত পত্রিকাগুলি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। সেকারণেই ব্রিটিশ সরকার এগুলির কর্তৃপক্ষের উপর বারংবার আঘাত হানে ও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তাই বলে দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করতে পারেনি।

অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাবী ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে ব্যর্থ হয়। ফলে রাজনীতি সচেতন মানুষের জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী নীতি ও পদ্ধতির প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের সাথে সমঝোতা করার পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখত। ফলে এই আবেদন নিবেদন নীতি ছেড়ে তীব্র রাজনৈতিক কার্যকলাপের জোরালো দাবী ওঠে। একইসঙ্গে নরমপন্থী চরমপন্থী ও বিপ্লববাদীদের কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। এই জেলারই কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা

কৈবর্ত সন্তানেরা দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বিপ্লবীদের পিতামহ সতীশ চন্দ্র সামন্ত, বিপ্লবীদের অস্ত্রগুরু সুশীল ধাড়া প্রমুখেরা জনগণকে বোঝাতে থাকেন যে তাঁদের এই দুরবস্থার প্রতিকার তাদেরই করতে হবে। এইভাবে তাদের নিরলস চেষ্টা ও উদ্দীপনায় জনগণের রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটে ও সেইসঙ্গে শুরু হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিঃস্বার্থ লড়াই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার গণসংগ্রাম একটি গৌরবময় অধ্যায়। মেদিনীপুরের এই মহান কৈবর্ত নেতৃবৃন্দের ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা ও চারিত্রিক মাধুর্যে খুশি সারা দেশবাসী। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার কার্যকলাপে বীরভূমি মেদিনীপুরের কৈবর্ত সন্তানেরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য গান্ধীজীর পথে বাংলার প্রতিটি প্রান্তে অতি সন্তর্পণে প্রচারকাজ চালিয়ে যান। জাতীয় বিদ্যালয় পরিকল্পনা, চরকা ও খদ্দরের প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন, পল্লীসমিতি গঠন, স্থানীয় মানুষের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের মাধ্যমে সংগঠনকে মজবুত করে তোলেন। সারা বাংলাব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন, লবন আইন অমান্য, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন-ট্যাক্স প্রতিরোধ আন্দোলন এবং সবশেষে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্বদান করে মেদিনীপুরের বীর কৈবর্ত সন্তানেরা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে বীরভূমি মেদিনীপুরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থানে পরিণত করেছিল। সেইসঙ্গে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অজস্র শহীদের আত্মত্যাগ আর বলিদানের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথটি ত্বরান্বিত হয়েছিল।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগ আইনটি কার্যকরী হয়। ইংরেজ যেহেতু বণিকের মানদণ্ড রাজদন্ডে পরিণত করেছিল তাই ব্রিটিশ শাসকগণ সর্বদাই সজাগ থেকে দেশের কোনো অংশে বা কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হলে তা রাজশক্তি সহ্য করতে পারত না। লর্ড কার্জন ছিলেন তৎকালীন বড়লার্ট। আর কলকাতা যেহেতু সমগ্র ভারতের রাজধানী তাই কার্জন ১৯০৩ সালের শেষে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই সেই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার চেষ্টা করলেন। জাতীয় কংগ্রেস সহ দেশের মানুষ দেশব্যাপী প্রতিবাদ শুরু করলেন বিভিন্ন সভা, সমিতি, বিক্ষোভ কর্মসূচীর মাধ্যমে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মিজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন – '১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য সভা হয়েছিল যেখানে এর প্রতিবাদ করা হয়। আর প্রতিটি সভায় অন্তত ৫০০-৫০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকত।[২৫] কিন্তু যেহেতু লর্ড কার্জন ও তাঁর ইংরেজ গোষ্ঠীর গোপন উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি জাতির সংহতি ও প্রভাব বিনষ্ট করা এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা। তাই তারা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয় এবং ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই বঙ্গবিভাগের সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন জেলাতে যেমন নানান প্রতিবাদ সভা হয় সেইমতো মেদিনীপুর জেলাও সর্বতোভাবে এগিয়ে আসে। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বেলী হলে ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচীর জন্য এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় সহস্র ছাত্র এই সভায় যোগদান করে।। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। 'মেদিনী বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দেবদাস করণ এই সভায় পৌরোহিত্য করেন। গতিকৃষ্ণ বাগের

জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এই সভার সূচনা হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ছাত্র সমাজকে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ছাত্রভান্ডার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। **১৯০৫** সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে তিনদিনের জন্য সকলে জুতো, কোট এবং ছাতা ব্যবহার না করে তারা শহরের সমস্ত পথগুলি পরিক্রমা করে পদযাত্রা করে। তাদের মুখে চলল জাতীয় চেতনাময় সঙ্গীত। জেলার শাসক এই শোভাযাত্রার বিরোধিতা করল কিন্তু বিরোধীতা অগ্রাহ্য করেই চলল শোভাযাত্রা। **১৯০৫** সালের **১৬** অক্টোবর জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমগ্র বঙ্গদেশে রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। বাঙালিকে আইন দিয়ে পৃথক করা যাবে না, তারা একই মিলনসূত্রে আবদ্ধ- ঐ দিন মেদিনীপুরের জনসভায় এই শপথবাণী গ্রহণ করা হয়। সেদিন মেদিনীপুরের হাজার হাজার জনতা নগ্নদেহে, নগ্ন পায়ে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইতে গাইতে কংসাবতী নদীতে স্নান সেরে নিকটবর্তী সমাবেশে যোগদান করেছিল। আর 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' মন্ত্র উচ্চারণ করে একে অপরের হাতে রাখী বেঁধেছিল। মেদিনীপুরে শুরু হল লবণ উৎপাদন, চরকায় কাটা তুলোর সুতো দিয়ে গ্রামে গ্রামে বহু তাঁত চলতে লাগল। মেদিনীপুরের রামজীবনপুর, চন্দ্রকোনা, নিমপুর, প্রভৃতি স্থানের তাঁতের মিহি কাপড়ের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ছিল। বস্ত্রবয়ন শিল্পের সূচনায় মূলধন সংগ্রহের জন্য কাঁথিতে এক বিপুল সমাবেশ হয়।[২৬] এখানে সুতা প্রস্তুতের কাজ ও বয়ন শিল্পের জন্য শপথ নেওয়া হয়। এর প্রস্তাবক ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এছাড়া বনবিহারী মুখার্জী, দ্বারিকানাথ ধর, বিধুভূষণ গিরি প্রমুখ উত্তাল ভাষণ দেন। এইভাবে প্রায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা জুড়ে তুলাজাত সুতায় তাঁতশিল্পের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। এই স্বদেশী কর্মসূচীর সাথে বয়কটও সমানভাবে চলার জন্য ব্যাপক প্রচার

হয়। গরীবের বাড়িতে কাঁচের রেশমী চুড়ি প্রবেশ করেছিল অল্পদামে। এই রেশমী কাচের চুড়ির বর্জন স্বদেশী কর্মধারার প্রধান অঙ্গ হয়েছিল। কবি গেয়েছেন – ‘ছেড়ে দাও বঙ্গনারী রেশমী চুড়ি, কভু হাতে আর পরো না’। মেয়েরা তাদের সখের কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলত। জানা যায় এক রকমের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল যাদের কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুড়ি ভাঙ্গা। এইভাবে ছাত্র যুবদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল স্বদেশী আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। তাদের পোষাক ছিল দেশী মিলের ধুতি, দেশী মিলের থানে তৈরি জামা আর মাথায় সাদা পাগড়ি। সঙ্গে হাতে থাকত বাঁশের লাঠি। ছাত্রসভা ও জনসভাগুলিতে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত চারিদিক। কবি রজনীকান্ত গাইলেন – ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে তোদের তাঁর বেশী আর সাধ্য নাই’। ঘরে ঘরে এর প্রতিধ্বনি শোনা গেল। মেদিনীপুরের কৃষক অধ্যুষিত জেলায় এই আন্দোলনের উন্মাদনা ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল।

বিংশ শতকের প্রথমদিকেই মেদিনীপুরে বহু আখড়া গড়ে উঠল। যেখানে যুবকদের শরীর ও মন দুটোই শক্ত হল। এই আখড়াগুলিতে লাঠিখেলা, ফুটবল, কুস্তি করার মাধ্যমে শরীরচর্চা চলতে থাকত। এভাবেই চলত যুবশক্তিকে নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার কাজ। পরবর্তী সময়ে এই আখড়াগুলিই হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসস্থল।[২৭]

এই সময়ের সংবাদপত্রগুলিও শাসকের অত্যাচার আর সমাজের নগ্ন চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলত। এসময়কার সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সন্ধ্যা, যুগান্তর, নবশক্তি, হিতবাদী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ‘যুগান্তর’ প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা ও যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার কাজ করত। কিংসফোর্ড-এর সমালোচনায় একটি

প্রবন্ধের জন্য ভূপেন্দ্রনাথের ১ বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্রের ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকা বয়কটের কর্মকান্ডের প্রচার করত। মেদিনীপুর থেকে দেবদাস করণ সম্পাদিত ‘মেদিনী বান্ধব’ পত্রিকা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, রজনীকান্ত, গোবিন্দ চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালী প্রসন্ন, মুকুন্দ দাস, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী প্রমুখ কবিদের কাব্য, গান ও কবিতা, নাটক সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করেছিল।[২৮] ১৯০৫ সালে মেদিনীপুর নিকটস্থ চন্দ্রাকর ময়দানে এক বিশাল জনসভা হয়। সেখান থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয় এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে।[২৯]

এইভাবে দেখা যায় যে সমগ্র মেদিনীপুর জুড়ে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার কাজ ও সেইসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কর্মকাণ্ড চলতে লাগল। এমনকি বিলিতি বস্ত্র ও দ্রব্য বর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বচসা ও সংঘর্ষ বাধে। কোথাও কোথাও ফৌজদারী মামলারও সূত্রপাত ঘটে। মেদিনীপুরের খেজুরি থানায় আজানবাড়ি সহ বিভিন্ন হাটে স্বেচ্ছাসেবকরা দোকানের মজুত কাপড়ে কাঠের উপর খোদাই ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছিল। অর্থাৎ দোকানের বিলিতি কাপড় শেষ হলে পুনরায় নতুন বিলিতি কাপড় রাখা চলবে না, আর পরে রাখলে দোকানদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।[৩০] স্বেচ্ছাসেবকেরা যখন বিলিতি দ্রব্যের বিরুদ্ধে পিকেটিং করে তখন পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে খেজুরির ঠাকুরনগর গ্রামে। পুলিশ মামলা রুজু করে। মামলায় অভিযুক্ত হয় ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঁইয়া, শশীভূষণ বেরা, সৃষ্টিধর জানা, যামিনীকান্ত পড়িয়া, রমেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রমুখ।[৩১] এঁরা সকলেই সমাজের শিক্ষিত যুবক। ব্যারিস্টার কে.বি.দত্ত এঁদের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু বিচারে দশ মাস হলেও তা হ্রাস করে তিনমাস করা হয়। এই মামলার অন্যতম আসামী ক্ষীরোদ নারায়ণ ভুঁইয়া পরবর্তী জীবনে হাইকোর্টের উকিল হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এইভাবে ঘাটাল, কাঁথি সহ জেলার বিভিন্ন মহকুমাতে স্বদেশীর প্রচার ও কর্মকাণ্ড চলেছিল। হৃষিকেশ গায়েনের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা' নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে গোপীনাথপর, বাঘাদাঁড়ি, কলাবেড়িয়া, বায়েন্দা প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন আখড়া কেন্দ্রগুলি দীর্ঘকাল চলেছিল।[৩২] এছাড়া কলাগেছিয়ার জমিদার গিরিশচন্দ্র মাইতির পুত্র জগদীশচন্দ্র মাইতি স্বদেশী আন্দোলনের এক সুপরিচিত যুবনেতা ছিলেন। কাঁথি হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্র মহেন্দ্রলাল করণ স্বদেশী আন্দোলনে মনপ্রাণ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। খেজুরির প্রথম স্নাতক ক্ষীরোদচন্দ্র দাস সভা সমিতিতে সক্রিয় অংশ নেন। এছাড়া দক্ষিণ কলাগেছিয়ার রাজেন্দ্রনাথ দিন্দা, লালমোহন সামন্ত প্রমুখের মতো সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও স্বদেশী আন্দোলনে যথেষ্ট এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন।[৩৩]

অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের মাত্রা ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসক কিংসফোর্ড সেই সময় ব্রিটিশ শাসনের রক্ষক হয়ে বিভিন্ন ধরণের অত্যাচারের নিয়ন্ত্রা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর শাস্তি প্রদানের জন্য বাংলার দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে ডিসট্রিক্ট জজ পদে বদলি হয়ে চলে যান। সেখানেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। উপরন্তু দুজনেই ধরা পড়েন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ও প্রফুল্ল চাকী নিজের রিভোলবার দিয়ে

আত্মহত্যা করেন। এইরকম সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্তেরও ফাঁসি হয়েছিল। মেদিনীপুরের গড়বেতা থানার অধিবাসী বসন্ত কুমার সরকার এবং তমলুকের ময়না থানার গণেশচন্দ্র দাসের সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বসন্ত কুমার বি.এ. পড়ার সময় হিন্দু হস্টেলে থাকতেন। সেসময় তিনি 'ম্যাটসিনি সোসাইটি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। ১৯১২-১৩ সালে বসন্তবাবু পুনরায় সংঘবদ্ধ হন। ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সময় বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মাভেরিক জাহাজের চাঁদবালিতে থেকে অস্ত্রশস্ত্র রাখার ভার পড়েছিল তারই উপর। আবার ১৯১৫ সালে একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে মেদিনীপুর জেলার ভার ছিল বসন্ত কুমার সরকার, বিপিন হাজরা, পঞ্চানন সরকার প্রমুখ আট জনের উপর। তারা সেন্ট্রাল জেল দখল করে কয়েদিদের মুক্ত করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি।[৩৪] তিনি ১৯১৫ সালে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হন। মেদিনীপুর জেলে এক মাস থাকার পর কাকদ্বীপে নজরবন্দী থাকেন। আবার ১৯২২ সালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে ছয় মাস ছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাবের সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ১৯৩০ সালে বাড়িতে বোমা তৈরীর অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করে ও এক বছরের সাজা হয়। ১৯৪২ সালে গড়বেতা থানা কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে গ্রেপ্তার হন এবং দমদম সেন্ট্রাল জেলে থাকেন। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনুরূপভাবে গনেশচন্দ্র দাসও স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন।

কলকাতায় ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন বসে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে। এখানেই অসহযোগ কর্মপদ্ধতির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মেদিনীপুরের নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই প্রস্তাবের অনুকুলে ভোট দেন। ১৯০১ সালের বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের একটি অধিবেশন হয় মেদিনীপুরের পোড়া বাংলার ময়দানে বর্তমান বার্জ টাউনে। নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন এই সম্মেলনের সভাপতি। আর সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত। এই মেদিনীপুরেই ১৯০৭ সালে এবং ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সম্মেলন হয়েছিল। ১৯১৯ সালে প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা এবং অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী আইনজীবী উপেন্দ্রনাথ মাইতি। ১৯২০ সালের পরে নাগপুর অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি ব্যবসা ত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা। এসময় দেশে আন্দোলনের জোয়ার আসে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে প্রায় ৫০ হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। মেদিনীপুর জেলার ছাত্র-যুবদের মধ্যেও অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেসময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সভাপতি এবং দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ সম্পাদক নির্বাচিত হন। আন্দোলনে হাত মিলিয়ে মেদিনীপুর কোর্টের আইনজীবীগণ উকিলের পেশা ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন। একইসময়ে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে বীরেন্দ্রনাথ তার সভাপতি এবং কিশোরীপতি রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিশোরীবাবু ছাড়াও মেদিনীপুর কোর্টের উকিল মন্মথনাথ দাস, জহরলাল অধিকারী, নগেন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বেরা প্রমুখ আইন ব্যবসা ত্যাগ করে এখানে

যোগ দেন। এরকম বহু আইনজীবী তাদের পেশা ত্যাগ করে জেলার কংগ্রেসের কর্মসূচীতে যোগদান করেন।[৩৫]

সমগ্র মেদিনীপুর জেলার অসহযোগ আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত জোয়ার দেখা গেলে সে সময়ে জেলায় একটি নতুন আইন প্রবর্তন করেন সরকার বাহাদুর। বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন আইনের প্রবর্তন ও সেই অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের চেষ্টা চলে। এর মারাত্মক ফলের কথা চিন্তা করে বীরেন্দ্রনাথ অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ড আন্দোলন শুরু করেন। কেননা এই আইনে গ্রামসমাজ কুক্ষিগত হলে প্রচুর ট্যাক্স বৃদ্ধি হবে ও জেলাবাসীর জন্য তা অশুভ ইঙ্গিতবাহী হবে। বীরেন্দ্রনাথ তাই কালবিলম্ব না করে আন্দোলনে এগিয়ে এলেন এবং এই আইন অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদানে অস্বীকৃতির জন্য প্রচার করেন। কিন্তু সরকার তার সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। মেদিনীপুর জেলায় মোট ২২৭ টি ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। কাঁথি শহরে স্থাপিত হল প্রথম বোর্ডটি। বীরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সভায় এই বোর্ডের অপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। দেশবাসী বীরেন্দ্রনাথের মতকেই সমর্থন করেন। কাঁথি, রামনগর, সুতাহাটা প্রভৃতি থানাতে প্রবল প্রতিরোধ দেখা যায়। সুতাহাটা থানায় কুমার চন্দ্র জানা ও সতীশচন্দ্র মাইতি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলার বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় সঙ্গীত, হরিনাম সংকীর্তন, জপ করতে করতে শোভাযাত্রা চলতে থাকে। সকলের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ফলে সরকারি অফিসার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সমস্ত স্থানে ট্যাক্স অনাদায়ে মাল ক্রোক হলেও বহনের লোক পাওয়া গেল না। এমনকি মাল নিলামেরও ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ফলত ১৯২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ৫০২৫ নং বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২২৭ টি ইউনিয়নের মধ্যে পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া ২২৬ টি বোর্ড বাতিল বলে ঘোষণা করা

হয়। তবে ১৯২২ সালে ৩১ জানুয়ারি গোপালনগর বোর্ডও বাতিল হয়। অর্থাৎ মাত্র দশমাস চলার পর ইউনিয়ন বোর্ডের চিহ্নমাত্র রইল না বীরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও আন্দোলন পরিচালনার জন্যে। এই আন্দোলন পরিচালনা ও সফলতার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের বিপুল জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলনে মেদিনীপুরের ছাত্র যুবরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিল। মেদিনীপুরের বিভিন্ন মহকুমার অসহযোগী শিক্ষকরা হলেন- নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, পরেশনাথ মাইতি, গিরিশচন্দ্র মাইতি, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, অঘোরচন্দ্র দাস, পদ্মলোচন সাহু প্রমুখ। আর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে বিপ্রচরণ মাইতি, রাজেন্দ্রনাথ গুড়্যা, কুমারচন্দ্র জানা, সতীশচন্দ্র সামন্ত, হেমচন্দ্র রাউত, হংসধ্বজ মাইতি, অনঙ্গমোহন দাস, শ্রীধর চন্দ্র সামন্ত, অবিনাশ চন্দ্র দাস, সচ্ছিদানন্দ ভৌমিক, জীবনকৃষ্ণ মাইতি, বিজয়কৃষ্ণ মাইতি, বসন্ত কুমার দাস, ভীমাচরণ পাত্র, শশিশেখর মণ্ডল, ভূতেশ্বর পড়্যা, বিভূতিভূষণ মাইতি, সতীশচন্দ্র জানা, কাঙ্গালচাঁদ গিরি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মান্না, রঘুনাথ মাইতি প্রমুখ।[৩৬] এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে আইন অমান্য ও বিশেষত ভারত ছাড়ো আন্দোলন-সহ মেদিনীপুরের স্বাধীন সরকার গঠনে ও চালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মেদিনীপুর জেলার অসহযোগ আন্দোলনের সময় জেলার বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি কর্মসূচীর কাজ হয়েছিল। ১৯২১এর ১ মার্চ কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, জগদীশচন্দ্র মাইতি এই স্কুলে যোগদান করেন। বিভিন্ন জায়গার ছাত্ররাও দলে দলে বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করে। এই স্কুলগুলি হয়ে ওঠে জাতীয় কংগ্রেসের এক

একটি কার্যালয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯২৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কলাগাছিয়া জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। সেখানে এসে তিনি তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন- 'জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাথা উঁচু করিয়া থাকে ইহাদের মধ্যে দেশমাতৃকার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত। ইহারা নরনারায়ণের সেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত'।[৩৭] একইভাবে কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ও ১৯২১ সালের ৭ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরেন্দ্রনাথ তাঁর কাঁথি শহরের বাড়িটি জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেন। তমলুকের সুতাহাটা থানার অনন্তপুর জাতীয় বিদ্যালয় অসহযোগী ছাত্র কুমারচন্দ্র জানার প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়টিও সমগ্র থানার জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তমলুকের কাঁকুড়দহ গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয়, কাঁথিতে মির্জাপুর জাতীয় বিদ্যালয়, নাড়ুমা জাতীয় বিদ্যালয়, এগরা জাতীয় বিদ্যালয়, বনমালী চট্টা জাতীয় বিদ্যালয়, বায়েন্দা জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি। এইভাবে জেলায় গড়ে উঠেছিল অনেকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়। এগুলির মাধ্যমে দেশব্যাপী একটি স্বাবলম্বনের মাধ্যমে মুক্তির বাতাবরণ তৈরি করা হয়। অবহেলিত কৃষক, শিল্পী বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সুযোগ পেল। চারণ কবি মুকুন্দ দাস ১৯২৩ সালে কাঁথি পরিভ্রমণে এসে গান গাইলেন- 'ধন্য দেশের চাষা তাদের চরণধূলি মাথায় নিলে প্রাণ হয়ে যায় খাসা', 'করমেরই যুগ এসেছে – সবাই কাজে লেগে গেছে আমরা কি রইব শয়ান'। এইসমস্ত সঙ্গীতের মাধ্যমে কর্মের আহ্বান ও শ্রমশক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছিল। সেদিন মেদিনীপুর জেলার কৃষক সমাজ এক নতুন উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

তবে শুধুমাত্র জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনই নয়, চরকায় সুতাকাটা প্রবর্তন ছিল অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধী এই চরকার প্রচার করেছিলেন। ১৯২৫

সালে মেদিনীপুর পরিভ্রমণকালে গান্ধীজীর পৌঁছাতে দেরী হওয়ায় রাত্রি ১১ টার সময়েও আধ ঘন্টা চরকা কাটার পরে শয়ন করেন।[৩৮] জেলার জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে চরকা ও তকলীতে সুতাকাটা আবশ্যক হল। গান্ধীজীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় মিশ্রিত সুতায় প্রস্তুত বস্ত্রকে খদ্দর নামে অভিহিত করা হয়। ১৯২৩ সালে খাদিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মেদিনীপুরের কর্মীগণ অসহযোগের ১৮ দফা কর্মসূচী রূপায়নে মনোযোগী হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। বিভিন্ন স্থানে খাদি কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আবার কংগ্রেসের মধ্যে আদালত বর্জন ও কার্যধারা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল। তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের জন্য দেশপ্রাণ অনেক জায়গায় ঘুরেছিলেন ও জনসভা করেছিলেন। সব জায়গাতেই বক্তৃতায় মহিলাদের এই আন্দোলনে যোগদানের আহ্বান জানানো হয়। কাঁথির সরস্বতীতলার জনসভায় বিশেষ করে মহিলাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন এই সভার সভাপতি। প্রধান বক্তা শরৎচন্দ্র ঘোষ ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায়। সেই জনসভায় তাঁরা বলেন- স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দেশবাসী নরনারীর প্রতি যে ত্যাগের আহ্বান এসেছে তা প্রাণস্পর্শী এবং উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বর্ণনা করেন। আরো বলেন- দেশের নারীসমাজ অগ্রসর হয়ে না এলে এই ব্রত পূর্ণ হতে পারে না। সেই শৈলবালা দিন্দা, পরমেশ্বরী বালা, মোক্ষদায়িনী, ভবানী বেরা, শশীভূষণ দাসের পুত্রবধূ সহ আরো অনেকে তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সোনার গয়না খুলে দান করেছিলেন এখানে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে।[৩৯] শুধুমাত্র কাঁথি মহকুমাতেই বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্বরাজ্য ভাণ্ডারে ২৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করে দেন। যদিও তিনি নিজে বঙ্গীয় তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। যাইহোক এইসমস্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে আনা হল নানান অভিযোগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রাণ

বীরেন্দ্রনাথের বিচার শেষ হল ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২। বিচারে তাদের ছয় মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। ১৯২২ সালের ৯ আগস্ট তারা মুক্তি পান। মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা নামে পরিচিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সেনাপতি, জননেতা বীরেন্দ্রনাথকে জেলাবাসী বীরের সম্মান প্রদর্শন করেছিল।

তবে আন্দোলনের তীব্রতা ও অত্যাচার বাড়তে থাকায় এবং চৌরিচৌরার মতো ঘটনা ঘটলে গান্ধীজী মর্মাহত হন। তিনি সত্যাগ্রহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে দেশবাসী হতাশ হয়ে পড়েন। আর গান্ধীজীর প্রতি দেশবাসীর এই মনোভাব বুঝতে পেরে সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেন। এই পরিস্থিতিতে ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু থাকলেও কিছু মতবিরোধ হওয়ায় তিনি সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ তাঁকে সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক করলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে। পরে বীরেন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবুও তিনি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, বিভিন্ন দপ্তরের ব্যাপক উন্নয়নের জন্য নানান স্কীম তৈরি করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ওঠেন। তাঁর সময়ে জেলাবোর্ডের ডাক্তারখানা ৭ থেকে বেড়ে ৩১ হয়েছিল। এই সময়েই একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। ১৯২৩ সালে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন তৎকালীন বাংলার গভর্ণর মেদিনীপুর পরিদর্শনে এলে তাঁকে গিয়ে দেখা করতে বলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিউবার্ট গ্রেহাম। কিন্তু সরকারি কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি দেখা করতে যেতে রাজী হলেন না। এতে সরকার তাঁর প্রতি বিরক্ত হন। এইভাবে বীরেন্দ্রনাথের তেজস্বিতা ও

জনপ্রিয়তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। আবার ১৯২৬ সালে জেলাবোর্ড নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সরকারি কমিশনার অনুমোদন না দেওয়ায় তা স্থগিত থাকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে নাড়াজোলের জমিদার দেবেন্দ্রলাল খাঁনকে ১ বছরের জন্যে চেয়ারম্যান করা হয়। বীরেন্দ্রনাথের মেয়াদ শেষ হয় ৬ আগস্ট ১৯২৬। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচনে কাঁথি ও ডায়মন্ডহারবার থেকে দাঁড়িয়ে জয়ী হন। তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে অধিকাংশ আসন দখল করেন। আর মেয়র হন চিত্তরঞ্জন। এই সময় চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর অন্যতম সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথকে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার) পদে নিতে চাইলে কলকাতা কংগ্রেসের অভিজাত শ্রেণীর বিগ ফাইভ নেতৃত্বের বিরোধিতায় (বিগ ফাইভ – নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনী রঞ্জন সরকার, তুলসী চরণ গোস্বামী, ড. বিধান চন্দ্র রায় এবং শরৎচন্দ্র বোস) নিতে পারলেন না।[৪০] বাধ্য হয়ে নিতে হল সুভাষচন্দ্র বসুকে। এই সিদ্ধান্তে বীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। এখানে একটা কথা না উল্লেখ করলেই নয়। আসলে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর জাত্যাভিমান কাজ করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে উঠে আসা কৈবর্ত জাতের কৃষক সন্তান বীরেন্দ্রনাথকে কর্মাধ্যক্ষ করাটা নিজেদের মর্যাদা হানিকর। এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে ‘মেদিনীপুরের ক্যাওট’ এসে কলকাতায় রাজত্ব করবে?[৪১] ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এক পত্রে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে লেখেন –‘....কলকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer এর পদ আপনারই প্রাপ্য বলিয়া আমরা জানিতাম কিন্তু স্বরাজ্য দলের কি অভিসন্ধি ছিল জানি না। আপনাকে coolly

ignore করিল'।[৪২] অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক শ্রেণীতে জন্ম নেওয়াই ছিল হয়তো তাঁর অপরাধ। তবে বলা যায় এই দুই দেশনেতার বিচ্ছেদ সমস্ত দিক দিয়েই ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদিও ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলের নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু হলে চিত্তরঞ্জন বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি সমূহ বিপদের কথা আঁচ করতে পেরে ১ নভেম্বর ১৯২৪ তারখে শাসমলকে একটি চিঠি লেখেন – 'প্রিয় শাসমল, আমরা এখন সংকটের সম্মুখীন এবং তোমাকে আমার নিতান্ত দরকার। আমি আশা করি তুমি পূর্ব কথা ভুলিয়া ক্ষমা করিবে এবং বর্তমান অবস্থায় তোমার শক্তি নিয়োগ করিবে'।[৪৩]

তবে একথা এখানে বলা একান্ত প্রয়োজন যে দেশবন্ধুর পর বীরেন্দ্রনাথ বাংলার অন্যতম নেতার পদ গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন সেকথা তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দও জানতেন। তাই ১৯২৬ সালে জানুয়ারিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বীরেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লেখেন – 'আপনার উদ্ধৃত দেশবন্ধুর কথা হইতে জানা যায় যে বাংলা দেশকে আপনারই চালিত করার কথা – এরূপ ব্যক্তি আপনি অনিষ্টকারীদের ভয়ে বিচলিত হইয়া কার্যকরী সমিতি ছাড়িয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করিয়াছেন ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি'।[৪৪] তবে দেশপ্রাণ কেন্দ্রীয় রাজনীতি থেকে সরে এলেও মেদিনীপুরের নেতৃত্ব যে ত্যাগ করবেন না এই ছিল মেদিনীপুরবাসীর দৃঢ় আশা এবং ভরসা। ১৯২০র দশকে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বি.পি.সি.সি., এস.পি (স্বরাজ পার্টি) যৌথভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল যা বাঙালির ইতিহাসে অভিনব।[৪৫] কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পরেই বাংলা কংগ্রেস দুইভাগে ভাগ হয়ে চিত্তরঞ্জনের স্বপ্নকে চুরমার করতে উদ্যত হল। এই দুই গোষ্ঠির একদিকে কলকাতা কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর 'বিগ-৫' আর অন্যদিকে কংগ্রেসের অধীন

কর্মীসংঘ যা বি.পি.সি.সি'র অধীন বিপ্লবী দল। কলকাতা কেন্দ্রিক গোষ্ঠী প্রচার করতে লাগল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হল চিটাগাঁও-এর ফাউল এবং শাসমলকে মেদিনীপুরের কেওট বলে। অর্থাৎ তাঁকে নীচু জাতের বলে অবজ্ঞা করতে লাগল। তবে ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরেই কাঁথির আসন শূন্য হলে বীরেন্দ্রনাথ স্বাধীন প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করে আইনসভায় প্রবেশ করেন। চিত্তরঞ্জন দাস বেঁচে থাকাকালীন বাংলা কংগ্রেস এক বিশাল শক্তি অর্জন করেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সেই ঐক্য আর সেভাবে থাকল না। এমনকি মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত আলাদা সংগঠন হল কৃষক প্রজা পার্টি(কে.পি.পি)। যাদের কাজ হল মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করা। ইতিমধ্যে ১৯২৬ সালে ২১ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয় নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। সেখানে বীরেন্দ্রনাথ অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এরপর কংগ্রেসের অভিজাত শ্রেণীর দলাদলিতে তিনি অসম্মানিত বোধ করেন এবং পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ফলে কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে বাংলা কংগ্রেস কণ্টকহীন নেতৃত্ব হয়ে গেল। কিন্তু আখেরে অনতিবিলম্বে কংগ্রেসের দুর্দশা ঘনিয়ে আসে এবং বীরেন্দ্রনাথের অভাব অনুভূত হয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের শেষে লালা লাজপত নগরে জাতীয় কংগ্রেসের বেদীমূলে যে স্বাধীনতার পতাকা উড়ল এরই মহত্ব ছড়িয়ে পড়ল ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারির সকাল বেলায়। এই স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমগ্র ভারতের গ্রামগঞ্জে, শহরে নগরে, পথে প্রান্তরে কোটি কোটি নরনারীর গলায়। ২৬ জানুয়ারির সংকল্প বাক্য ভারতের আত্মশক্তির প্রকাশরূপে কোট কোটি প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তিতে অভিষিক্ত হল। গান্ধীজি বললেন- ব্রিটিশ শাসন চলতে দিলে তা মানুষ ও ঈশ্বরের

বিরুদ্ধে অপরাধ হবে। এজন্য ব্রিটিশের সম্পর্কশূন্য পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নেই। অহিংস সংগ্রামের পথে আইন অমান্য, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতি কর্মসূচী অনুসরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হবে। এই সংকল্পবাক্য ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে কোটি কোটি ভারতবাসী গ্রহণ করল। ঠিক হল সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক লবণ আইন অমান্য করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করা হবে। লবণ আইন সম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৩০) সংখ্যায় লিখলেন 'বায়ু ও জলের ঠিক পরেই লবনকে জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু বলা যেতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে স্বাদ সৃষ্টির ইহাই একমাত্র বস্তু। লবণব্যতীত গোজাতির জীবন রক্ষা হতে পারে না। বহু পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে লবনের প্রয়োজন হয়। ইহা সাররূপে মাটিতে প্রভূত পরিমাণে উর্বরতার সৃষ্টি করে'।[৪৬] লবণআইনের অত্যাচার কিরূপ হয়েছিল সে সম্পর্কে ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চের আনন্দবাজার পত্রিকার উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয় – '১৮২৬ সালের সময়ে সময়ে জনসাধারণ চড়া দরের জন্য লবণক্রয়ে অসমর্থ হইয়া সমুদ্রের জলে খড় কুটা ভিজাইয়া বাড়িতে আনিতে লাগিল এবং উহার ক্ষার ভাতে মাখাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিল। এইজন্য এই সালে গভর্ণমেন্ট আইন করেন যে সমুদ্রের জলে কিছু ভিজাইয়া তাহার ক্ষার করা অপরাধজনক। নবাবদের আমলে যে দরে লবণ তৈয়ারি হইত তাহার উপর শতকরা আড়াই টাকা হইতে পাঁচ টাকা ট্যাক্স যোগ হইত। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এই ট্যাক্স ৫০০ হইতে ৬৫০ গুণ বৃদ্ধি পায়'।[৪৭] ১৯৩০ সালে গান্ধীজী ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে জানালেন কি কারণে ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসীর পক্ষে অভিশাপ হয়ে উঠছে। তিনি এও জানালেন যে তিনি সত্যাগ্রহ স্থগিত রেখে আলোচনা করতে চান। কিন্তু ভাইসরয় জানালেন

যে গান্ধীজী আইন ভঙ্গের ও দেশে অশান্তি সৃষ্টির পথ অবলম্বন করার সংকল্পে তিনি দুঃখিত। গান্ধীজী তাঁর প্রত্যুত্তরে জানালেন – 'আমি নতজানু হয়ে আহার প্রার্থনা করেছিলাম কিন্তু পেলাম এক টুকরো প্রস্তর খণ্ড'।[৪৮] তাই গান্ধীজী ১২ মার্চ ১৯৩০ সালে একষট্টি বছর বয়সে ৭৮ জন আশ্রমবাসীকে নিয়ে সবরমতি আশ্রম থেকে ডাণ্ডির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে যাত্রা করলেন। অবশেষে ৬ এপ্রিল ডান্ডিতে সমুদ্রের এক মুঠো লবণ তুলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লবণসত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। আর এই ঢেউ বাংলার মেদিনীপুর জেলার কর্মীদের মধ্যেও তীব্র বেগে ধ্বনিত হল। ১৯ মার্চ মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত জেলার প্রায় সমস্ত কর্মীদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয়। মহাত্মার প্রদর্শিত পথে জেলার সমস্ত কর্মীগণ ১৮ মার্চ মেদিনীপুর শহরে পৌঁছে যান। চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল পদযাত্রীদের ধ্বনিতে। মেদিনীপুরের দেশভক্ত জমিদার দেবেন্দ্র লাল খানের মেদিনীপুর শহরের বাড়িতে সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট হয়। মেদিনীপুরে সর্বপ্রধান লবণকেন্দ্রের স্থান হল কাঁথি মহকুমার পিছাবনীতে। এই স্থানটি স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ৬ এপ্রিলের কিছু পূর্বে পিছাবনীর নিকটবর্তী গ্রামে পুলিশ ১৭ জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করে ও কাঁথির আদালতে বিচার হয়। বিচারে লবণআইন ভঙ্গের অপরাধে তাদের প্রত্যেকের ৫০০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৭ দিন করে কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়।[৪৯] তবে এরপর জেলার বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি ও প্রচার কাজ চালিয়ে লবণসত্যাগ্রহের বার্তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময় কাঁথিতে গঠিত হল আইন অমান্য পরিষদ। জাতীয় কংগ্রেসের মহকুমা সম্পাদক তথা জেলার কৈবর্ত সন্তান সতীশ চন্দ্র জানা হলেন তার সম্পাদক। এই আইন অমান্য পরিষদ থেকে কাঁথির মহকুমা শাসকের নিকট আইন ভঙ্গের বিজ্ঞপ্তি আগেই

পৌঁছে দেওয়া হয়। কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ে সত্যাগ্রহ শিবিরের অন্যতম ঘাঁটি হয়ে ওঠে। এককথায় মেদিনীপুর জেলার লবণকেন্দ্রগুলি সংগ্রামী মেদিনীপুরবাসী নরনারীর অহিংস স্বরাজ সাধনার তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এবং যার ফলে সমগ্র জেলা থেকে গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তনের সমগ্র সার্কুলারটি বাতিল করে একসঙ্গে ২৫২ টি ইউনিয়ন বোর্ড সরকার তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল, তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জনগণের গভীর আত্মবিশ্বাস। একইসঙ্গে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে জয়লাভ চিরবিদ্রোহী জেলাবাসীর সুপ্ত শক্তির পুনরায় জাগরণ ঘটেছিল। মেদিনীপুর জেলার মহকুমাগুলিতে নিজ নিজ কর্মধারা নির্ধারণ ও অনুসরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। খাদি প্রতিষ্ঠান ও অভয় আশ্রমের নেতাগণ কাঁথির সমুদ্রতীর পরিদর্শনে আসেন। এই লবণসত্যাগ্রহে জেলার হাজার হাজার কৈবর্ত সন্তান যোগ দিয়েছিল। পিছাবনীতে শিক্ষক কৈবর্ত সন্তান কৃষ্ণপ্রসাদ দিন্দা মহাশয়ের সৌজন্যে সত্যাগ্রহীগণ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের কর্মী শিবিরে উপস্থিত হন। এসমস্ত কিছুই সরকারি পক্ষে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে রেখেছিল। জেলাশাসক মি. পেডি, জেলার পুলিশ কর্তা কিড, কাঁথির এ.এস.পি. মি. সামসুজ্জোহা আইন অমান্যকারীদের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছিলেন। সত্যাগ্রহী দল ‘বন্দে মাতরম’, মহাত্মা গান্ধী কি জয়’ ধ্বনি দিতে দিতে শিবিরে ফিরে গেল।[৫০] এইভাবে সত্যাগ্রহীরা পিছাবনী খালের দুইপাশে তেঘরি, গোপালপুর, ঠাকুরচক প্রভৃতি গ্রামে লবণকেন্দ্র খুলে ফেলল। তবে কর্তৃপক্ষ

আর কালবিলম্ব না করে চতুর্থ দিনের পর আইনভঙ্গকারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১১ এপ্রিল ঝড়েশ্বর মাঝি, সুরেন্দ্রনাথ দাস ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করল। পিছাবনীর সরকারি তাঁবুতে স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট গোফুর সাহেবের আদালতে প্রত্যেকের দুই বছর জেল ও ২৫০ টাকা জরিমানা ঘোষণা করা হয়, অনাদায়ে ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। একইদিনে হাতিবেড়্যা গ্রামের গোবিন্দ প্রসাদ ঘোড়ই, রাধামোহন ঘোড়ই, ভোলানাথ দাস, কালাচাঁদ জানা, গোকুল মণ্ডল ও বঙ্কিম সুরকে তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইসময় থেকে ক্রমে লবণকেন্দ্রগুলিতে অত্যাচারের মাত্রা অতিরিক্ত রকম বেড়ে যায়। লবণকেন্দ্রে গিয়ে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেওয়া, সত্যাগ্রহীদের বেত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্তাক্ত করে দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়া লবণজলে ডুবিয়ে দেওয়া, জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া, কেড়ে নেওয়া, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা, কিছু মানুষকে ধরে গাড়িতে করে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা ইত্যাদি অত্যাচার হতে লাগল। এমনকি ঝড়েশ্বর মাঝির জরিমানা আদায়ের জন্য বাড়ির গরুগুলি ক্রোক করে নেওয়া হয়। বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র নেওয়া ও শেষে গরুর খাদ্য খড়ের গাদাতে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়েছিল। শাসকদল প্রচার করল আইন ভাঙ্গলে ঝড়েশ্বর মাঝির মতো তাদের দশা হবে। তবে এর বিরুদ্ধে পিছাবনীতে এক বিরাট জনসভা হয়। কাঁথির অন্যতম কংগ্রেস নেতা নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি ছিলেন অন্যতম বক্তা। এছাড়াও গৌরহরি সোম, চপল তালুকদার প্রমুখ নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনার জন্য কাঁথিতে ১৯ ও ২০ এপ্রিল জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশাল জনসভা হয়। তার আগে ১৭ তারিখ কাঁথিতে একটি সাড়া জাগানো শোভাযাত্রাও হয়। কাঁথির জনসভাতে বিরাট অঙ্কের মহিলাদের অংশগ্রহণ এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে বক্তৃতা করেন ক্ষেমঙ্করী রায়,

শান্তি দাস, ইন্দিরা দেবী প্রমুখ। সভার শেষে সকলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল। পাশাপাশি একটি দল মির্জাপুর লবণকেন্দ্রে গিয়ে জনসভার আয়োজন করেন। ২৫ এপ্রিল পিছাবনী লবণকেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা ও কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ভূতেশ্বর পড়্যাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এক বছর কারাদণ্ডে দন্ডিত করে ও তিনশত টাকা জরিমানা করে, অনাদায়ে আরো তিনমাস কারাদণ্ড হয়। এছাড়াও বিশ্বনাথ প্রধান, মুরারি মোহন প্রধান, দুর্যোধন পাল, গোবিন্দ প্রসাদ সাঁতরা, পঞ্চানন মান্না, কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ ব্যক্তিকে পিছাবনী পুলিশ ক্যাম্পে ধরে এনে স্পেশ্যাল পুলিশরূপে কাজ করতে বলা হয় এবং লবণকেন্দ্রগুলি নষ্ট করার কথা বলা হয়। কিন্তু প্রত্যেকেই তা করতে অস্বীকার করে। এমনকি তারা বলেন যে তারা এই আদেশ মানবেন না আর প্রাণ থাকতে এই কাজ করবেন না। নিমদাসবাড়ের ভাগবত চন্দ্র মান্না ও দুর্যোধন পালের বাড়িতেও অত্যাচার করা হয়। এমনকি দুর্যোধনের গর্ভবতী স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শাসমল কংগ্রেসকে সাহায্য করার দরুন তার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পিছাবনীর নাম বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন জেলা থেকে কংগ্রেস কর্মীরা পিছাবনী সংগ্রাম ক্ষেত্রে আসতে লাগল। তবে কর্মীসংখ্যা যাতে খুব বেশী না হয় তাই তাদেরকে অন্যান্য কেন্দ্রের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করা হয়।

মেদিনীপুর জেলায় লবণআইন অমান্য অন্দোলনে লবণকেন্দ্রগুলি সুনিয়ন্ত্রিত করার কাজে বিশেষ নেতৃত্ব দেন- রসুলপুর গ্রামের ক্ষেত্রমোহন সামন্ত, উমাপদ প্রধান, ষড়ানন মাইতি; রতনপুরের গোবিন্দ প্রসাদ সাঁতরা; নিমদাসবাড়ের কৃষ্ণপ্রসাদ দিন্দা, মুরারি মোহন প্রধান, ঝড়েশ্বর দিন্দা, পঞ্চানন মান্না; বেলতলা গ্রামের সারদা প্রসাদ মিশ্র; বহলিয়ার কার্তিক

চন্দ্র মণ্ডল, সুরেন্দ্রনাথ মাইতি; সুবর্ণদীঘির নরেন্দ্রনাথ মাইতি; সাহাজাদপুরের হরেকৃষ্ণ খাটুয়া; হাতিবেড়্যার ভগবান চন্দ্র ঘোড়ই, গোবিন্দ প্রসাদ ঘোড়ই; গোপালপুরের বসন্ত কুমার বিদ্যালঙ্কার, শরৎকুমার দাস; সমুদ্রপারের নারায়ণ চন্দ্র বর; দাউদপুরের প্রতাপচন্দ্র শাসমল ও ভূতনাথ মাইতি; ভড়ুবসানের গিরিশ চন্দ্র রাণা; নয়াপুটের প্রাণকৃষ্ণ শী, অতুল চন্দ্র শী, রাখাল চন্দ্র চন্দ; বলভদ্রপুরের জ্ঞানদাচরণ মাইতি, গোবিন্দ প্রসাদ মাইতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ গিরি; ঠাকুরচকের গিরিজাচরণ ঘোড়ই প্রমুখ ব্যক্তিগণ।[৫১] এখানে দেখা যায় বেশীরভাগ নেতৃবৃন্দই জেলার কৈবর্ত মায়ের সন্তান। যারা নিজেদের জীবনকে উতসর্গ করেছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে। যাদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কাঁথির আইন অমান্য পরিষদ বেআইনী ঘোষিত হলে গোপনে কাজকর্ম চালানো হয়। কাঁথি থানার অন্তর্গত কালিনগর লবণকেন্দ্রটিও নানা কারণে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাঁথি থেকে ছয় মাইল দূরে মির্জাপুর লবণকেন্দ্রটিও কংগ্রেস কর্মীদের এক শক্তিশালী ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। এরই পাশাপাশি গোপালপুর লবণকেন্দ্র গরে উঠেছিল। এইভাবে কাঁথির নিকটবর্তী প্রায় শত শত লবণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল।

কাঁথির সত্যাগ্রহী শিবিরে ছাত্রদের অংশগ্রহণ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সেখানে যোগদানকারী ছাত্রদের মধ্যে মুগবেড়িয়া স্কুলের হৃষিকেশ গায়েন, বিনয় কৃষ্ণ হাজরা, অতুলকৃষ্ণ হাজরা, শ্রীপতি চরণ মাইতি, ভগবানপুর স্কুলের নিত্যগোপাল মাইতি প্রমুখ লবনকেন্দ্রে যোগদান করেন। পরবর্তীতে হৃষিকেশ গায়েন রচিত ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে

ভগবানপুর থানা' গ্রন্থটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আমাদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য দলিল।[৫২]

একইসঙ্গে জেলার লবণআইন অমান্য আন্দোলন বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আকার নেয়। একতারপুর, জুখিয়া, কলাবেড়্যা প্রভৃতি কেন্দ্র বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে। এরসঙ্গে গোপীনাথপুরে একটি লবণকেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেস নেতা নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি, ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ এলাকায় সভা করে আইন অমান্য কর্মসূচী প্রচার করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৩০-এ গোপীনাথপুর আইন অমান্য সমিতি নামে একটি সত্যাগ্রহী সমিতি গঠিত হয়। সমিতির সভাপতি হন নগেন্দ্রনাথ মাইতি আর সম্পাদক হন গোপালপুরের পুলিনবিহারী মাইতি। এখানে ব্যাপক উদ্দীপনার সঙ্গে লবণউৎপাদন ও আইন অমান্য চলতে লাগল। পুলিশ গোপীনাথপুর সহ নিকটবর্তী ৩১টি গ্রামের জন্য বাহিনী মোতায়েন করল। তারা স্বেচ্ছাসেবক ধরার অছিলায় গ্রামের পর গ্রাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজা জানালা ভেঙ্গে খাদ্য দ্রব্য ও গৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল। এই সময় দোকান লুঠপাঠ পুলিশের একটি নিত্যকর্মে পরিণত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপীনাথপুরের ঘটনায় ১৯৩০ সালের কেস নং ২০৪জি নামে মামলায় আসামী ছিল কুড়ি জন। তারা হলেন- নরেন্দ্র দে, ইন্দ্র জানা, ধরণীধর মান্না, প্রসন্ন কুমার মাইতি, গিরিশ চন্দ্র মাইতি, প্রতাপ চন্দ্র দাস, রাধানাথ মাইতি, বনবিহারী জানা, বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি, ধরণীধর বেরা, মন্মথ পানাধি, ক্ষীরোদ শীট, সতীশ মিত্র, বিভূতিভূষণ প্রামাণিক, মুকুন্দ শীট, বসন্ত জানা, যতীন্দ্র দে, গজেন্দ্র দাস, মণি কর, খেলারাম মাইতি। এদেরকে আই.পি.সি. ১৪৭, ৩৫৩ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। তবে ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির জন্য সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করে নেন।[৫৩] আইন অমান্য আন্দোলনে

মেদিনীপুরের মহিলারা দলে দলে এগিয়ে আসে এবং আইন অমান্য করে দলে দলে জেল ভর্তি করে ফেলেন। এই সময় নীহার পত্রিকা লিখলো- মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য হিজলী বন্দীশালার সংলগ্ন সাব-জেলটিকে মহিলা কারাগারে পরিণত করা হয়েছে।[৫৪]

এইভাবে পটাশপুর থানা, এগরা থানা, রামনগর থানা, খেজুরি থানা, তমলুক মহকুমা জুড়ে লবণকেন্দ্র গড়ে ওঠে। তমলুকের নরঘাট একটি বিখ্যাত লবণকেন্দ্রে পরিণত হয়। খেজুরি থানার চারিদিকেই লবণজলে বেষ্টিত। এখানে উল্লেখযোগ্য লবণ কেন্দ্রগুলি হল – অজয়া, টিকাশী, হেঁড়্যা, বিক্রমনগর, মৌহাটি, কুলঠা, কামারদা, জাহানাবাদ, কুঞ্জপুর, পানখাই, আজানবাড়ি, গোপীচক প্রভৃতি স্থানে। অজয়াতে ছিল থানা কংগ্রেস কার্যালয়। এখানে ১১ জুন লবণসত্যাগ্রহের বিশেষ দিন হিসাবে প্রতিপালিত হয়। এখানে সম্পাদক বসন্ত কুমার মাইতি ও সহ-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মাইতি থানার বিভিন্ন লবণকেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে প্রচার কাজ চালান। তেমনি তমলুক রাজবাড়িতে সত্যাগ্রহীদের শিবির স্থাপিত হয়। সেখান থেকে ৬ এপ্রিল যাত্রা শুরু হয়। সত্যাগ্রহীরা প্রথমে কৈবর্তদের আরাধ্য দেবী পবিত্র বর্গভীমা মন্দিরে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ নিয়ে নরঘাট লবণকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। প্রায় পাঁচশত মহিলা ও শত শত দর্শক এঁদের সহগামী হয়েছিল। ব্যবর্তার হাটে ও নন্দকুমারে দুটি জনসভা হয়। মহেন্দ্রনাথ মাইতি, কুমার চন্দ্র জানা, চন্ডীচরণ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ কংগ্রেস নেতাগণ সভায় বক্তৃতা করেন। সত্যাগ্রহী দলের নায়ক হংসধ্বজ মাইতি তিরিশ জন সত্যাগ্রহী সহ নরঘাটে হাজির হন বিকেল চারটের সময় লবণপ্রস্তুতের কাজে। এইদলে ছিলেন ইন্দ্রজিৎ সিংহ, রাখাল চন্দ্র পান, ক্ষুদিরাম ডাকুয়া, কুঞ্জবিহারী মাইতি, ললিত কুমার ধাড়া ও নলিনীকান্ত হোতা। এই সময় *আনন্দবাজার পত্রিকা* ১০ এপ্রিলের কাগজে

একটি উদ্দীপনাপূর্ণ খবর প্রকাশ করে।[৫৫] তমলুকের অন্যতম কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় ১৫ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন। বিচারে তার এক বছর তিন মাস কারাদণ্ড হয় ও তিনশো টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে তমলুক শহরে হরতাল পালিত হয়। ঠিক্ক পরের দিন ১৬ এপ্রিল জেলার অপর এক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তার এক বছর কারাদন্ড হয়। আবার ১৭ এপ্রিল বিশিষ্ট কর্মী নলিনী রঞ্জন হোতা গ্রেপ্তার হন এবং এক বছর কারাদণ্ড হয়। ঐ একই দিনে বালুঘাটার বিরাট জনসভায় প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা কুমার চন্দ্র জানা গ্রেপ্তার হন। তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। একইদিনে নরঘাট লবণকেন্দ্র থেকে ললিত কুমার ধাড়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও বিচারে তাঁর তিনমাস জেল হয়। এর প্রতিবাদে জেলার আইনজীবীগণ আদালত বর্জন সম্ভবপর না হওয়ায় (দিনাজপুর সম্মেলনের আলোচনা অনুসারে) তাঁরা বেআইনি লবণবিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পথে পথে ঘুরে লবণপুরিয়া বিক্রয় করেন। এরপর ৩০ এপ্রিল বারের নেতা মহেন্দ্রনাথ মাইতি, বিধুভূষণ হাইত, হরিসাধন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবীগণ সরকার সমর্থিত টাউন ক্লাবের সদস্যপদে ইস্তফা দেন। ১৮ এপ্রিল নরঘাট লবণকেন্দ্রে পুনরায় একটি বিরাট জনসভা হয়। তাতে জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, ক্ষেমঙ্করী দেবী, চারুশীলা দেবী প্রমুখ মহিলা নেত্রীগণ বক্তৃতা করেন। সভাতে বিপুল জনসমাবেশ হয়। ১৪৪ ধারা জারি করে সভাভঙ্গের বৃথা চেষ্টা করা হয়। এইভাবে নরঘাট লবণকেন্দ্রটি প্রায় চারমাস চলেছিল। এই লবণ কেন্দ্রকে বাংলার ডান্ডি বলা হয়ে থাকে। এইভাবে তমলুক থানার প্রায় সকল ইউনিয়নে লবণকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে হাকোলা, খারুই, আলিনান, বল্লুক, গোবিন্দপুর, কোলন্দা, আমগেছিয়া, শ্রীরামপুর, মির্জাপুর, নিমতৌড়ির নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলের পরিচালন সমিতিতে মহেন্দ্রলাল মাইতি, বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি প্রমুখ নেতাগণ যুক্ত থাকায় সরকার স্কুলের সাহায্য বন্ধ করে দেয়। তমলুক মহকুমার বুলেটিন 'মুক্তিদূত' এর সম্পাদক বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী রমেশ চন্দ্র করকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এইভাবে যে সকল বিশিষ্ট কর্মী আত্মগোপন করে গ্রামে গ্রামে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ ইত্যাদি কংগ্রেসের কর্মসূচী রত ছিলেন তাদের অনেকেই একে একে ধরা পড়তে লাগলেন। সেকারণে সাময়িকভাবে হলেও আন্দোলন সংক্রান্ত কাজকর্ম শিথিল হলেও লবণকেন্দ্রগুলিতে আবার কাজকর্মের সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু ৫ মে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার সমগ্র ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। তমলুকে ৬ মে হরতাল পালিত হয়। ১৩ মে শ্রীরামপুরে মহকুমা কর্মী সম্মেলনের অধিবেশন হয় সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন প্রভাবতী মাইতি। তিনি গ্রেপ্তার হন। ব্যবর্তার হাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে প্রভাবতী মাইতির ছয় মাস ও ক্ষীরোদের এক বছর কারাদণ্ড হয়।

মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম থানাতেও এই লবণআইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ থেমে থাকেনি। সেখানে ২৬টি লবণকেন্দ্র খোলা হয়। এগুলি পরিচালনার জন্য সতীশচন্দ্র সাহু, ধরণীধর প্রধান, হৃষীকেশ দাস, যমুনাকান্ত রায়, বরদাকান্ত দাস, কুঞ্জবিহারী ভক্ত, রাজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া, বরেন্দ্রনাথ খাঁড়া, পরেশচন্দ্র জানা, নগেন্দ্রনাথ সরকার, মায়া দাস প্রমুখ কর্মীগণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর এই সমস্ত নেতৃবৃন্দ সহ প্রায় সকল কর্মীরাই ছিল জেলার কৈবর্ত জাতির।

একইভাবে জেলার সুতাহাটা থানাতেও কংগ্রেসের নিরলস সহযোগী কুমার চন্দ্র জানার নেতৃত্বে এলাকার বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতির মাধ্যমে প্রচার কাজ চলে। এখানে ৩০ মার্চ বালুঘাটা ও দেউলপোতার জনসভায় প্রায় এক হাজার স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। ১৭ এপ্রিল বালুঘাটা বাজারে এক বিরাট জনসভা হয় যার প্রধান বক্তা ছিলেন কুমার চন্দ্র জানা। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। এরপর অন্যতম কংগ্রেস কর্মী হীরালাল মাইতি স্থানীয় আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন। এখানে বাড় বাসুদেবপুর, রাজারামপুর, বাবুপুর, আতাপাল, উদ্ধবপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে অতি উৎসাহের সঙ্গে লবণউৎপাদন চলতে থাকে। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, বঙ্গীয় ব্যাবস্থাপক সভার সদস্য পি. ব্যানার্জী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ডায়মন্ড হারবারের পথে কুকরাহাটি হয়ে নিপীড়িত স্থানগুলি পরিদর্শন করতে যান। তারা সুতাহাটা তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেন ১৮ নভেম্বর ১৯৩০ সালে।

অন্যদিকে জেলার পাঁশকুড়া থানা এলাকায় লবণপ্রস্তুতের উপযুক্ত জল বা মাটি কম। তাই দূরবর্তী এলাকা থেকে লবণাক্ত জল এনে প্রকাশ্যে লবণপ্রস্তুত করা হত। স্বেচ্ছাসেবকেরা মাটির পাত্র করে জল বয়ে আনতেন। এখানের লবণকেন্দ্রগুলি হল – রামগাছতলা, বনকেটকী, তেলিপুকুরের মাঠ ইত্যাদি। এইসমস্ত জায়গায় পুলিশের অত্যাচার ভীষণভাবে হয়েছিল। তেলিপুকুরে যে জনসভা হয় সেখানে অন্যান্যদের সাথে শুধু পাঁচ শতাধিক মহিলাও যোগদান করেছিল।

তবে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ময়না থানার অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯২১ সালে যখন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনের ডাক

দিয়েছিলেন তখন ময়না থানার অধিবাসীগণ ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। একইভাবে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনেও এলাকার ছাত্র-যুবরা সমানভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময় থানা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন ভোলানাথ দাস ও সভাপতি অনঙ্গমোহন দাস। তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন এলাকায় প্রচারকাজ চলে। আর ১৯৩২ সালে ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস সভাপতি এবং শরৎচন্দ্র দাস সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই থানা ১৯৩০-৩২ সালে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৩২ সালে কংগ্রেস কমিটি বেআইনি ঘোষিত হলে থানায় সমর পরিষদ গঠিত হয়। দেউলা গ্রামের শ্রীমতী প্রভাবতী মাইতি প্রথম সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। তাঁর গ্রেপ্তারের পর শরৎচন্দ্র দাস সর্বাধিনায়ক হন। ১৯৩০ সালে ময়না থানার দুটি মহিলা সমিতি গঠিত হয়। দক্ষিণ ময়না গ্রামে সভানেত্রী ছিলেন কিরণময়ী দাস এবং সম্পাদিকা কিরণবালা দাস। আসনান গ্রামে স্থাপিত মহিলা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন বিনোদিনী ওরফে ননীবালা দাস, আর সম্পাদিকা প্রভাবতী মাইতি। এই মহিলা সমিতিগুলি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ব্যাপক সহায়তা করেছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমাও বিশেষ অবদান রাখে। সেখানে দাসপুর থানা এলাকার রূপনারায়ণ নদী তীরবর্তী শ্যামগঞ্জ একটি বড় লবণকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। কাঁথি ও তমলুক মহকুমাতে অনেকগুলি জায়গা সরাসরি বঙ্গোপসাগরের লবণ জলের বন্যা আসত। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র রূপনারায়ণই ছিল একমাত্র উপায়। এই স্থানে ৭ এপ্রিল(১৯৩০) লবণ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়। তমলুক মহকুমায় লবণ সত্যাগ্রহ সফল করে তুলতে পদযাত্রা করে মেদিনীপুরের নাড়াজোলের রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে সকলে রওনা দেয়। এই পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত,

হংসধ্বজ মাইতি, নলিনীরঞ্জন হোতা, সুশীলকুমার ধাড়া প্রমুখ।[৫৬] দাসপুর থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বিনোদবিহারী বেরা, সহ-সম্পাদক বিনোদবিহারী হড় ও অরবিন্দ মাইতি, ঘাটাল মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং হৃষীকেশ পাইন, মোহিনী মোহন মণ্ডল প্রমুখ এই কেন্দ্রে শক্তি জোগাতে থাকেন। তবে দাসপুর থানার দারোগা ভোলানাথ ঘোষের সত্যাগ্রহী দলের উপর অত্যাচারের তাণ্ডব মনে রাখার মতো। তিনি তাঁর সঙ্গী অনিরুদ্ধ সামন্ত সত্যাগ্রহীদের উচিত শিক্ষা দিতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। তারা লাঠি, বেতমারা, ভাঙচুর, এমনকি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি ও তাদের পিতৃমাতৃকূলের প্রতি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ সর্বদাই করতেন। কিন্তু তাতেও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। তবে ৩রা জুন ১৯৩০ সালে গোপীগঞ্জ থেকে ১০ মাইল দূরে চেঁচুয়া হাটে এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। যা চেঁচুয়াহাট হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। এব্যাপারে দিবাকর ঘোষ প্রণীত ‘স্বাধীনতা আন্দোলনে চেঁচুয়াহাট’ নামক গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত জানা যায়। এছাড়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত যোগেন্দ্রনাথ হাজরা, ডা. অখিলেশ সামন্ত প্রমুখ ব্যক্তিদের বিবৃতি যথেষ্ট। এই ঘটনায় পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার সহস্রগুণে বেড়ে যায়। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি, এ.ডি.এম. আব্দুল করিম ও নবনিযুক্ত দারোগা ইয়ার মহম্মদ চেঁচুয়ার গ্রামবাসীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার নামিয়ে আনেন। পরবর্তী সময়ে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ৬ জুন ১৯৩০ ১৪ জনের মৃত্যু হয়। তারা হলেন- চন্দ্রকান্ত মান্না, শশিভূষণ মাইতি, কালিপদ শাসমল, ভৃগুরাম পাল, দেবেন্দ্রনাথ ধাড়া, সতীশচন্দ্র মিদ্যা, রামচন্দ্র পাড়ুই, নিতাই পড়্যা, অবিনাশ দিন্দা, অশ্বিনী দোলই, সত্য বেরা, কালী দিন্দা, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, মোহন চন্দ্র মাইতি। এই চৌদ্দজনের প্রায় সকলেই কৈবর্ত বাড়ির সন্তান। আর অষ্টম হাজরার

নাকের উপর গুলি লেগেছিল। ডা. অটল বিহারী সামন্ত তাঁকে চিকিৎসা করে গুলি বের করেন।[৫৭] তবে এইসমস্ত নিহত ব্যক্তি ছাড়াও গুলিতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন। আর তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করে। এরপর পুলিশ থেমে থাকেনি। তারা নতুন উদ্যমে শুরু করে নির্যাতন, নিপীড়ন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি ও পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেবের কাছে খবর যায় যে দাসপুর থানার মানুষ সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ফলে চেঁচুয়াতে ১৫০ গোরা সৈন্য পাঠানো হল। মেদিনীপুর থেকে আরো সৈন্য, অস্ত্র শস্ত্র, মেশিনগান এনে মোতায়েন করা হয়। এরপর পেডি বাড়ি ফিরে চলে গেলেও চলতে থাকে অত্যাচার, লুঠ আর নারী ধর্ষণ। অত্যাচারের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে অনেকে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। এককথায় দাসপুর থানা হয়ে ওঠে পুলিশ ও সেনাদের এক বড় ঘাঁটি। এই চেঁচুয়াহাট মামলার জন্য বিশেষ আদালতও গঠিত হয়েছিল।মোট ৪৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা, আর ষড়যন্ত্রের মামলা রুজু করা হয়েছিল।(case no. 1, 1930, Midnapur District Emperor vs Mrigendra Nath Bhattacharjee 32 others vs 302/120B 147. 169/pub302 302/34. 201. 304. IPC). বিচারে কারো দুই বছর, কারো সাত বছর কারাদণ্ড, সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তবে বেশ কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দারোগা হত্যার ফায়ারিং কেসে যোগেন হাজরা ও সুরেন বাগের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এছাড়াও অষ্টম হাজরা, রজনী পাঁজা, প্রাণকৃষ্ণ গুছাইত, ক্ষিতীশ মণ্ডল, বিনোদ বেরা ও ভূতনাথ মান্নার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আসামীদের মামলা চালানোর জন্য কলকাতা থেকে রীতিমতো যাতায়াত করতেন এবং যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন।

তবে বলা যায় দাসপুর থানার শ্যামগঞ্জ লবণ কেন্দ্রের পুলিশী অত্যাচারের অগ্রণী দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও অনিরুদ্ধ সামন্তের হত্যার পরে গ্রামে গ্রামে যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল এবং গ্রামবাসীদের উপর বর্বরোচিত সন্ত্রাসের কবলে পড়তে হয়েছিল সেই শোচনীয় পরিস্থিতি সকলের মনে শিহরণ জাগায়।

অপরদিকে মেদিনীপুর শহরে লবণ আইন ভঙ্গের বিশেষ কোন সুযোগ না থাকায় সেখানে সভা সমিতি করে মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার চেষ্টা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ দাস, দেবাদিদেব রায় প্রমুখ কর্মীগণের উৎসাহে ও নেতৃত্বে প্রতিদিন একটি স্বেচ্ছাসেবক দল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করত। বঙ্কিমবাবুর উপর গানের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। তাঁর স্বরচিত গান 'জাগো ভীমা (বর্গভীমা) করালিনী রুদ্রাণী বেশে' দেশবাসীর মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করত। সমগ্র শহরের আন্দোলনের দায়িত্ব ছিল আইনজীবী উমেশ চন্দ্র বেরার উপর। কলাইকুন্ডা রাজার মেদিনীপুর শহরের বাড়িতে একটি স্বেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপিত হয়। উমেশবাবু এই শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন। এদিকে সভা সমিতির বাড়াবাড়ি দেখে পুলিশ যথেষ্ট তৎপর হয়ে ওঠে। চন্দ্রাকর মাঠে চারুশীলাদেবী সভা করে গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেস নেতা চারুচন্দ্র দাসের কন্যা নির্মলা দাস অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে পুলিশকে নিরস্ত্র থাকতে বাধ্য করেছিল। মেদিনীপুর সদর মহকুমার থানা সংখ্যা ছিল ১২ টি। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি থানার আইন অমান্য কাজ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। যেমন- পিংলা থানা, নারায়ণগড় থানা বিশেষ ভূমিকা রাখে। তবে এসময় এখানে লবণ আইন ভঙ্গের কাজ বিশেষ না হওয়ায় পরবর্তী কর্মসূচী চৌকিদারী ট্যাক্স আন্দোলনের প্রতি কর্মীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আবদ্ধ হয়। থানার প্রতি অঞ্চলে সংগঠন সৃষ্টির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গঠনকর্মী

অটল বিহারী দাস, খগেন্দ্রনাথ দিন্দা, সুধাকৃষ্ণ দাস প্রমুখ কর্মীগণ পিংলা থানায় ক্যাম্প গড়ে তোলেন। এখানে প্রায় সাতশো জন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয়। তাদের অধিকাংশই শিবিরে বাস করেন। বড়িশা গ্রামের ডা. পরমেশ্বর দাস শিবিরে থাকা সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া দাওয়ার জন্য ব্যয়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫৮] এই থানায় যে বুলেটিন বা প্রচারপত্র বিলি করা হত তার নাম ছিল 'ধূমকেতু'। যজ্ঞেশ্বর দাস ও পুলিনবিহারী মাইতি এই বুলেটিনটির পরিচালনা করতেন। হেমচন্দ্র রায় ও বেণীমাধব দাস কখনো পাগল, কখনো ভিখারীর বেশে থানার বিভিন্ন স্থানে ও পার্শ্ববর্তী থানা এলাকায় গিয়ে বুলেটিন প্রচার করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তারা কখনো ধরা পড়েননি।

১৯৩০ সালের ১লা জুন অটল বিহারী দাস ও দেবেন দাসের নেতৃত্বে ক্ষীরাই গ্রামে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। বলা হয় কোন চৌকিদার যেন থানাতে রিপোর্ট না করেন এবং ট্যাক্স আদায়ের জন্য জুলুমবাজী না করেন। নতুবা শঙ্খধ্বনি দিয়ে বিপদ সংকেত দেওয়া হবে। ক্ষীরাই-এর ত্রৈলোক্যনাথ মাইতি, বিপীন বিহারী দাস, রাখাল চন্দ্র ধাড়া, কার্ত্তিক চন্দ্র জানা, পঞ্চানন বেরা, হেমাঙ্গ শেখর ধাড়া, অমল চন্দ্র জানা, কার্ত্তিক চন্দ্র মাজি, গোপীনাথ খাঁড়া, ভজহরি খাঁড়া, ভূবন চন্দ্র খাঁড়া, বিপিন বিহারী মাইতি, হারাধন সামন্ত প্রমুখ আরো অনেকের নামে থানায় হাজিরার নোটিশ সহ বিভিন্ন মামলা রুজু করে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়।[৫৯] কিন্তু কেউই থানায় হাজির হননি। এমনকি ট্যাক্স আদায় দেবার কোন মনোভাব দেখাননি। এরপর পুলিশ ১০ জুন সকলকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে যান। ৭০-৮০ জনের একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী ওয়ারেন্টসহ অভিযুক্তদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অত্যাচার ও ভাঙচুর চালায়। কেননা বেশীরভাগ বাড়িতে পুরুষেরা ততক্ষণে

নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল গ্রামে পুলিশ ঢুকলে মহিলারা শঙ্খধ্বনি দ্বারা সংকেত দিত। এখানে পুলিশের গুলিতে মোট সতেরো জনের মৃত্যু ঘটে। এঁরা হলেন – ভীমাচরণ জানা, গোপীনাথ খাঁড়া, অদ্বৈতচরণ ধাড়া, অধরচন্দ্র সিং, নরেন্দ্রনাথ পাড়ই, বাবুলাল জানা, ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল, নরেন্দ্রনাথ দাস, গোবিন্দ চরণ সিংহ, পূর্ণেন্দু ঘোড়ই, লক্ষণ বেরা, রামপদ বেরা, মহেশ্বর মাইতি, শ্রীমন্ত মাইতি, কালাচাঁদ মাজী, জগন্নাথ ভক্তা এবং ত্রৈলোক্য গুছাইত। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামে শ্মশানের স্তব্ধতা দেখা দেয়। এই সময় অন্যান্য থানা এলাকার মতো কাঁথি মহকুমাতে সুধীর দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পথের আলো বুলেটিন।[৬০] এইসমস্ত নামগুলি মেদিনীপুরের ক্ষীরাই শহীদ স্মৃতি ভবনে রক্ষিত ফলকে লেখা রয়েছে। তবে জেলাশাসক পেডি ব্রিটিশ শাসনকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়েছিলেন বা সেইমতো প্রজা শাসন করছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই ক্ষীরাই হত্যাকাণ্ড। ক্ষীরাই-এর এই শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ স্মৃতি বেদী, স্মৃতিভবন, শহীদ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, চরখা কেন্দ্র, ডাকঘর স্থাপিত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপলদা গ্রামের কৈবর্ত সন্তান বিষ্ণুপদ সামন্ত এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কর্মী ছিলেন। তবে মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস কমিটি বেআইনী ঘোষিত হলে ১৯৩৩ সালে ডিসেম্বরে বীরেন শাসমলের কলকাতার বাড়িতে জেলার নেতাদের এক মিটিং হয় এবং এর বিকল্প হিসাবে গড়ে ওঠে মেদিনীপুর ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন।[৬১]

আবার এই জেলার নারায়ণগড় থানাতেও আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। চিরস্মরণীয় বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর জন্মস্থান হল এই

নারায়ণগড়। তার বিপ্লব কাহিনী ও আন্দামান দ্বীপে দীর্ঘ সময় নির্বাসনে কাটানো আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। তিনি বোমা তৈরীর এক অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই থানার কিশোরী মোহন অধিকারী, জগদীশচন্দ্র অধিকারী, যাদবচন্দ্র রায়, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, দ্বারকানাথ রায়, হরিহর দাস, প্রমুখ ব্যায়ামের আখড়া তৈরী করেছিলেন। তারাই এলাকায় স্বদেশী প্রচার করেছিলেন অতি উৎসাহের সঙ্গে। এসময় বিদেশী পণ্য, বস্ত্র পুড়িয়ে তারা আসামী হয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টার কে.বি.দত্তের চেষ্টায় ছাড়াও পেয়েছিলেন। লবণ আইন অমান্য শুরু হলে জেলার অন্যান্য থানার মতো এখানেও বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ১৯৩০ সালে ১৯ মার্চ মেদিনীপুরের নাড়াজোল রাজ কাছারীতে জেলা সম্মেলনের অধিবেশন বসে, সেখানে নারায়ণগড়ের কর্মীগণ পদযাত্রা করে গিয়ে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে নারায়ণগড় ও সবং থানার মিলিত কংগ্রেস কমিটি 'নাড়মা-উচিতপুর কংগ্রেস কমিটি' নামে পরিচালিত হয়। এর সভাপতি দ্বারকানাথ রায় এবং সম্পাদক গোপাল চন্দ্র মাইতি এবং সহ-সম্পাদক পুলিনবিহারী রায়। এঁদের উদ্যোগে ১৯২৯ সালে মদনমোহনচকে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেখানে একটি কর্মী শিবির হয়েছিল। ঐ বছর জানুয়ারি মাসে নাড়মাতে জেলা কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে এক বিশাল সম্মেলন হয়। সেখানে প্রায় পাঁচশো প্রতিনিধি ও সহস্রাধিক দর্শক যোগদান করে। তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে স্থির হয় স্বাধীনতা লাভই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেইমতো ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির হয় ও আইন অমান্য প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এসময় নারায়ণগড়, সবং, পিংলা, খড়্গপুর এই চারটি থানায় নিয়মিতভাবে প্রচারিত হত 'সতী সমর পরিষদ বুলেটিন' নামে প্রচারপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন পুলিনবিহারী মণ্ডল, লেখক ছিলেন ডা. গোপাল চন্দ্র মাইতি ও পুলিনবিহারী রায়। এই

থানার মধ্যে লবণকেন্দ্র খোলার উপযুক্ত স্থান না থাকায় তারা কাঁথির পিছাবনীতে ৪০-৫০ জন কর্মী প্রেরণ করেন। তবে জেলায় ইতিমধ্যে তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হত্যা হওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলনের পথভ্রষ্ট হচ্ছে বলে এ আই সি সি'র সভা দুঃখ প্রকাশ করে। সেখানে কিছু প্রস্তাব গান্ধীজীর কাছে পাঠানোর জন্য দেবেন্দ্রলাল খান, বীরেন শাসমল প্রস্তাবিত করেন ও সমর্থিত হয়।[৬২] এককথায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই থানার মানুষজন তাদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

একইভাবে খড়্গাপুর নামক রেলওয়ে উপনিবেশকেও উদ্দীপ্ত করেছিল এই আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ। এখানে শ্রী দেবেন দাস কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান পরিচালক ছিলেন। কেশিয়ারী থানার নেতৃস্থানীয় কর্মী মৃত্যুঞ্জয় জানার নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সম্মিলিত কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। তেঁতুলিয়া গ্রামে যতীন্দ্রনাথ ধাড়ার বাড়িতে থানা কংগ্রেস অফিস খোলা হয়। তিনিই কর্মী সম্মেলনের আহারের ব্যবস্থা করতেন। সেজন্য পুলিশ মাঝে মাঝে এই বাড়িতে হানা দিত। এককথায় পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এই বাড়ির উপর। তবে এই থানায় লবণ উৎপাদন না হলেও বেআইনি লবণ বাইরে থেকে এনে বিভিন্ন হাটে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে পুলিশ অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং অসংখ্য কর্মী আক্রান্ত হতে থাকে।

মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও মোহনপুর থানাতেও উপযুক্ত পরিবেশ না থায় সেখানে লবণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। তারা পিছাবনী লবণকেন্দ্রে কর্মী পাঠিয়েছিল। সেখানে পাঠানো হয়েছিল যোগেন্দ্র নাথ মহাপাত্র, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, ক্ষেত্রমোহন খাটুয়া, গোপীনাথ সাহু, প্রিয়নাথ শীট প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। তবে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের জন্য এই থানার প্রসন্ন কুমার

গিরি, দেবেন্দ্রনাথ দাস, প্রবীর কুমার দাস, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, বনবিহারী দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মহকুমার অন্যতম নেত্রী চারুশীলা দেবী এই সভায় বক্তৃতা দেন। ফলে ট্যাক্স আদায়ে সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে চলল নির্যাতন। সোনাকানিয়া, মালপাড়া, পলাশিয়া, ললিতপুর, নিমপুর, গড়হরিপুর, গরদপুর প্রভৃতি গ্রামে পুলিশ বাহিনী সহ মহকুমা শাসক শঙ্কর সেন ট্যাক্স আদায় অভিযান চালান। অত্যাচারিত হয়ে গ্রামবাসীগণ অনেক গ্রাম ত্যাগ করে চলে যেত। অধিকাংশ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন প্রসন্ন কুমার গিরি, নগেন্দ্রনাথ মাইতি, যোগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, দেবেন্দ্রনাথ দাস, নিরঞ্জন দত্ত, অতুলচন্দ্র দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। নিত্যানন্দপুর থানার বৈকুণ্ঠনাথ দাস ও দেবেন্দ্র পাহাড়ী প্রমুখ কর্মীরা কাঁথি মহকুমার লবণ আন্দোলনের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহে নামেন। দাঁতন ও মোহনপুর কর্মীদের চেষ্টায় একটি বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। এই বুলেটিন প্রচারের জন্য পুলিশ মহেশ্বর জানা, শ্রীনিবাস গিরি, ভবানী শঙ্কর জানাকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে প্রত্যেকের তিন মাস করে কারাদণ্ড হয়। এখানে উল্লেখ্য জে় ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহিলা রাষ্ট্রসংঘ নামে প্রথম মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। লতিকা ঘোষ এর সূচনা করেন এবং সুভাষচন্দ্রের মাতা প্রভাবতী বোস এই সংগঠনের সভাপতি নিযুক্ত হন।[৬৩] ফলে আইন অমান্য আন্দোলনে মহিলারা সর্বত্র আন্দোলনে এগিয়ে আসতে থাকে। এইসময় স্কুল ও কলেজে ছাত্রীসংঘ ও মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের উদ্যোগে পিকেটিং শুরু হয়। পুলিশ তাদের হয়রানি করত। তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সাধারণ যানবাহনের অগম্য স্থানে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসত।[৬৪]

মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার অধীন কেশিয়াড়ী থানা তসর শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই থানার মধ্যে লবণজল না থাকায় এখানের কর্মীরা অর্থ ও কর্মী সংগ্রহ করে

কাঁথি মহকুমার পিছাবনী লবণকেন্দ্রে পাঠিয়েছিল। এখানেও থানা কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় জানা এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক। চরকা প্রদর্শনী ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজ দেখে মহকুমা শাসক দমন নীতি প্রয়োগ করেন। পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় জানাকে গ্রেপ্তার করে এবং বিচারে তার ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

আর কেশপুর থানা এলাকাতেও লবণ সত্যাগ্রহ ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। শহীদ ক্ষুদিরামের পৈতৃক বাড়ি এই থানারই মোহবনী গ্রামে। এই থানা এলাকার মানুষজন স্বদেশী থেকে অসহযোগ, আইন অমান্য প্রভৃতি আন্দোলনে ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার সংকল্প নেওয়ার পর থানার বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যায়। প্রায় তিনশো মানুষ কংগ্রেস কার্যালয় থেকে শোভাযাত্রা করে কুয়াই বাজারে পৌঁছলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এখানে এলুনি গ্রামের অধিবাসীরা ট্যাক্স আদায় আন্দোলনে বিশেষভাবে প্রতিরোধ করেছিল। তবে এখানে লবণ কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও তমলুক ও পিছাবনীতে সত্যাগ্রহী কর্মীদের পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। গান্ধী আরউইন চুক্তি অচল হলে এই থানার বিশেষ উদ্যোগে পুনরায় আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কেশপুর থানার পতাকা সত্যাগ্রহ দিবসে পুলিশ শ্রীযুক্তা ননীবালা দাসকে উলঙ্গ করে প্রহার করা হয়েছিল। আর বাসনা দাসীকে পেটে বুকে, প্রস্বাবদ্বারে লাথি মেরে সাংঘাতিক রকম আঘাত করেন। ঐ দিন তিরিশজন মহিলাকে আহত করা হয়। ১৯৩২ সালের ৭ মার্চ কংগ্রেস নেতা সেখ ফকির মহম্মদ কারাবরণ করেন। কয়েকটি মুসলমান প্রধান অঞ্চলে অনেক মুসলমান কর্মী সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি হত্যার পর বঙ্কিমচন্দ্র রায়কে জেলা

থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরপর ট্যাক্স আদায়ের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন মি. বার্জ। তার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী কুয়াই-এর গ্রাম ঘেরাও করে। বঙ্কিমবাবু পুলিশের কাছে বলেন- তাঁর বাবা ও কাকা ট্যাক্স না দিয়ে জেলে গেছেন তাই তিনিও জীবন থাকতে ট্যাক্স দেবেন না। এই কথায় রেগে গিয়ে মি. বার্জ তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দেন এবং পুলিশ বঙ্কিমবাবুকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। আবার এখানে যে সমস্ত মহিলাকর্মী ছিলেন তারাও বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন – কুঁয়াই গ্রামের সুগন্ধা দাসী, ভিক্টোরিয়া রায়, সুবোধবালা রায়, ননীবালা দাসী, স্নেহলতা ঘোষ, বিদ্যুৎবালা পড়্যা, কাত্যায়নী রায়, শশীমুখী গড়াই, চারুবালা পড়্যা প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৩ সালে গোবিন্দপুর গ্রামের ত্রৈলোক্যনাথ কর ট্যাক্স বন্ধের মিটিং করার জন্য কালীমণ্ডপ বাজারে গ্রেপ্তার হন এবং তিনমাস সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হন।

সবং থানাতেও বিভিন্ন আন্দোলনে এলাকাবাসী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জন পিকেটিং খুব শক্তিশালী রূপ নিয়েছিল। এসময় তিলপাড়া গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি, মণীন্দ্রনাথ মাইতি; ভেমুয়া গ্রামের ফণিভূষণ দাস; দশগ্রামের নবকুমার শেঠ তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন আর সতীশচন্দ্র দাস অধিকারী, ড. গিরিশচন্দ্র দাস, ফকির চন্দ্র দাস ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলনে এই থানা এলাকা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সবং থানা এলাকার লবণ সত্যাগ্রহে বিভিন্ন কেন্দ্র খোলা হয়। চাকুলিয়া, আমড়াখালি, কাঁটাখালি, সিউলিপুর, রাসপোতা প্রভৃতি স্থানে অখিলচন্দ্র মাইতি, কেদারচন্দ্র প্রামাণিক, জিৎনারায়ণ ঘোড়ই, নরেন্দ্রনাথ মান্না, রামদাস সামন্ত,

কানাইলাল ভুঁইয়া প্রমুখের নেতৃত্বে লবণ কেন্দ্রগুলি খোলা হয়। শত শত নরনারী বিপুল উৎসাহে বেআইনি লবণ প্রস্তুত করতে লাগল। কাছাকাছি হাটে সেই লবণ বিক্রিও হতে লাগল। তখন পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। লাঠি চালানো, বেত্রাঘাতসহ নানা ধরণের অত্যাচার শুরু করেছিল। থানা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আদিত্য কুমার বাঁকুড়া ১১ এপ্রিল ১৯৩০ তারিখে সবং-এ তিন চার হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করে গ্রেপ্তার হন। আর ২৫ জুলাই ১৯৩০ আদিত্যবাবু সহ গোপালচন্দ্র দাস অধিকারী, নবকুমার শেঠ, গোপালচন্দ্র মাইতির এক বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়।(vide Sabong P.S. non. FIR Case no 4 Dated 7.5.1930 u/s 107 CRPC). আবার বড়চারা গ্রামের কুশধ্বজ সাহু, দাঁতড়দার গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি, উত্তর খামারের অমূল্য চরণ মাইতি চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনসভা করার অপরাধে তিনমাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (vide Sabong P.S. Case no. 5 Dated 13.7.1930 M/S of Ordinance VI, 1930). এর প্রতিবাদে বসন্তপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক পশুপতি মাইতি পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। সবং থানা কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠিত হয়। পশুপতিবাবুকে থানা কংগ্রেসের সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। আর সভাপতি হন ঈশ্বরচন্দ্র মাইতি। এই থানার অধীন ‘সমরবার্তা’ নামে একটি সাপ্তাহিক বুলেটিন বের হত। গোপালচন্দ্র দাস অধিকারী ও নবকুমার শেঠ এই বুলেটিন পরিচালনা করতেন। এঁদের গ্রেপ্তারের পর পশুপতি মাইতি দায়িত্ব নেন। তবে এই থানার অধীনে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরো জোরদার আকার ধারণ করেছিল। ৪ নং ইউনিয়নের দায়িত্বে ছিলেন কেদার প্রামাণিক, ৩ নং ও ১৩ নং এর দায়িত্বে নরেন্দ্রনাথ মান্না, চুড়াধারী মান্না (১নং), আশুতোষ মাইতি(২নং),

গুণধর মাইতি(৫নং), গিরিধারী সাউ(৬নং), গোপালচন্দ্র দুয়ারি(৭নং), নবদ্বীপ খাটুয়া(৮নং), কার্তিকচন্দ্র মাঝি(৯নং), বেণীমাধব মাইতি(১০নং), অতুলচন্দ্র মাইতি(১১নং), রাখালচন্দ্র মহাপাত্র(১২নং) দায়িত্বে ছিলেন। আসলে প্রতিটি ইউনিয়নের পঞ্চায়েত কমিটিগুলি যাতে অচল হয়ে যায় এটাই ছিল ইউনিয়নের শিবিরগুলির প্রধহান কাজ। থানার এক বিবরণে দেখা যায় ১৩ টি ইউনিয়নের ১৩ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে ১০জন, ৩৯জন সহকারীর সকলেই, ১৩জন দফাদারের মধ্যে ১২জন, আর ১৭৭ জন চৌকিদারের মধ্যে ১৭৩ জন পুদত্যাগ করেছিল।[৬৫] তাহলে সহজেই অনুমেয় যে আন্দোলন কতটা গভীরে প্রবেশ করেছিল যে কারণে এইরকম প্রভাব পড়েছিল। এইভাবে সবং থানা একটি ইংরাজ শাসন বর্জিত এলাকায় পরিণত হয়েছিল। যে কয়েকজন সরকারের সাহায্য করত তারা জনসাধারণের কাছে নানাভাবে লাঞ্ছিত হত। এর ফলে সরকারি অত্যাচার বেড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেয়। পুলিশ গুলি চালনা করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। প্রথমেই হৃদয়রঞ্জন বাগ পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পরে এবং মৃত্যুবরণ করেন। পরে হৃদয়রঞ্জন কামিলা, কালিপদ সাউদের মৃত্যু হয়। এছাড়া পুলিশের গুলিতে প্রচুর মানুষ আহত হন। সমগ্র সবং থানায় সরকারি দমননীতি রুদ্ররূপ ধারণ করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ ধরে আনল ও ভীষণভাবে প্রহার করতে লাগল। উকিল উপেন্দ্রনাথ মাইতি, ঈশ্বর মাইতি, কংগ্রেস কর্মী মনীন্দ্র মাইতির বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটানো হয়। গুণধর মাইতির প্রায় ১০০ মণ ধানের গোলাতে আগুন লাগিয়ে দেয় পুলিশ। পদত্যাগী পঞ্চায়েত আদায়কারী জ্ঞানেন্দ্র মান্নার ঘর বাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে যারা যারা সরকারি পদ থেকে সরে গিয়েছিল তাদের সকলকে নানাভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। এখানে ‘সবং সমর বার্তা’ নামে একটি

সাপ্তাহিক বুলেটিন প্রকাশ হত। এটাই থানা কংগ্রেস কর্মীদের আইন অমান্য আন্দোলনের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল।

এবার আমরা মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও শালবনি থানার আন্দোলন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোকপাত করব। এই থানার মানুষজনেরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই গড়বেতা থানা বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। এমনকি ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও গড়বেতা থানার নেতৃস্থানীয় রাধানাথ কুণ্ডু, ফকির কুণ্ডু, রামসুন্দর সিং, বসন্ত কুমার সরকার প্রমুখ কর্মীগণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রামসুন্দর সিং-কে এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৩০ সালের ৩০ এপ্রিল গড়বেতাতে একটি কর্মী সম্মেলন হয়। সেখানে থানার তিরিশটি ইউনিয়িন থেকে প্রায় ৫০০ কর্মী যোগদান করে। এই থানা এলাকায় লবণ প্রস্তুতের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় অন্যান্য কাজের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। আবার অন্যদিকে শালবনির নাম চুয়াড় বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। এই থানা এলাকার কর্ণগড় এবং তাঁর রাণী শিরোমণির অবদান বিশেষভাবে জানা যায়। তিনি অত্যাচারী ব্রিটিশদের হাত থেকে চুয়াড়দের বাঁচিয়েছিলেন। এই থানার অন্যতম নেতা পশুপতি সামন্ত ছাত্র জীবনেই স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তবে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে শালবনির গুরুত্ব মনে রাখার মতো। এই থানা এলাকায় পীড়াকাটা, ভীমপুর, সিজুয়া, দগড়খানা প্রভৃতি স্থান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যথেষ্ট উন্মাদনা দেখিয়েছিল। শালবনির খুব কাছেই গোদাপিয়াশালের জমিদারিতে ম্যানেজার মি. ক্রলির অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন গুরুতর আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত প্রজারা বাধ্য হয়ে সংঘবদ্ধভাবে ক্রলি সাহেবকে আক্রমণ করে ও বেঁধে প্রহার করে। এই ঘটনায় পুলিশ ২৫-

৩০ জনের নামে মামলা রুজু করে। মেদিনীপুরের কৈবর্ত সন্তান ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আসামী পক্ষ সমর্থন করে জয়ী হন এবং আসামীরা মুক্তিলাভ করে। এইভাবে ডেবরা থানা বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের অবদাআন চিরস্মরণীয় করে রাখে। এসময় বালিচকে শরীরচর্চার একটি আখড়া গড়ে ওঠে। নেশন, হিতবাদী, আত্মদর্শন প্রভৃতি সংবাদপত্র আখড়ার যুবকদের পড়ানো হত। লবণ আইন অমান্যের জন্য ডেবরা থানা এলাকার তিনিটি প্রধান কেন্দ্র খোলা হয়। সেগুলি হল –পাটনা, মহসিমপুর, হিজলদা। এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় বলাই চন্দ্র হাজরা প্রণীত ‘ডেবরা থানার ইতিকথা’ নামক গ্রন্থে। বলাই চন্দ্র হাজরা নিযে সংগঠন ও অর্থ সংগ্রহ বিভাগের সত্যাগ্রহী কর্মী ছিলেন। তাই তাঁর এই বিবরণী আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় এখানে যে বুলেটিন বের হত তার নাম ছিল ‘বিদ্রোহী’। সাপ্তাহিক এই পত্রিকাটির দায়িত্বে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ সেন ও রোহিনীকান্ত বেরা। এই প্রচারপত্র বিনামূল্যে সকলকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে বিলি করা হত। চন্দ্রকোনা থানার কুয়াপুর গ্রামের রাখাল চন্দ্র অধিকারী ও কুমুদিনী দেবীর কন্যা চারুশীলা দেবী মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মহিলা নেত্রী হিসাবে চিরস্মরণীয়।

তবে জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার চরিত্র একটু অন্যরকম। জঙ্গলাকীর্ণ এই মহকুমা যদিও নবীন। ১৯২২ সালে এই মহকুমার সৃষ্টি। এই ঝাড়গ্রাম মহকুমা আইন অমান্য আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই মহকুমায় থাআনার সংখ্যা ছিল ছয়টি – ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম, জামবনী ও গোপীবল্লভপুর। স্বদেশী আন্দোলন থেকে স্বরাজ লাভ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে এখানকার অধিবাসীদের প্রাণশক্তির বিশেষ পরিচয়

পাওয়া যায়। আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গের ৭৮ জন আশ্রমবাসীর মধ্যে মতিবাস দাস ছিলেন এই ঝাড়গ্রামের অধিবাসী। ১৯২২ সালের মে-জুন মাসে অসহযোগ আন্দোলনের নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে অভ্যর্থনার জন্য গিধনীতে এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। জমিদারী কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন চন্দ্রমোহন রানা, গোবিন্দ প্রসাদ অধিকারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হলে কংগ্রেস নতুন প্রাণ ফিরে পায়। অসহযোগী ত্যাগব্রতী, সুদক্ষ প্রশাসক বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমগ্র জেলায় কংগ্রেসের কর্মধারা নতুন উদ্যমে বলীয়ান হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে বিনপুরে এক বিরাট জনসভা হয়। বিহারীলাল পড়্যা এখানে কংগ্রেসের সংকল্প বাক্য পাঠ করেন। এছাড়া এগরা থানা, রামনগর থানা এলাকায় চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। কিয়া গ্রাম ও চোরপালিয়া গ্রামের মর্মান্তিক ঘটনা সকলকে অবাক করে দেয়। এই ঘটনায় কুলটিকরির দিবাকর বেরা(২২), কনকপুরের বৈকুণ্ঠনাথ জানা(১৮), সরিষার গোপীনাথ দাস(৪০), জাগুলিয়ার কার্তিকচন্দ্র রাণা(১৯), বহড়দার রুদ্রনারায়ণ শাসমল(৪৫) মৃত্যুবরণ করেন। এই নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। তবে তমলুক মহকুমাতেও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এব্যাপারে তমলুকের বনবিহারী বারিক, জগদীশচন্দ্র প্রধান, নলিনীরঞ্জন মাইতিকে বেদম প্রহার করা হয়। বনবিহারী ও জগদীশচন্দ্রের ছয় মাস করে কারাদণ্ড হয়। ৮ জুলাই ১৯৩০ খোলাপুকুর গ্রামের ফণীভূষণ জানা ও হৃষীকেশ জানা সুতাহাটা থানার কুকরাহাটি

বাজারে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের প্রচার করে গ্রেপ্তার হন। প্রত্যেকের সাত মাস করে কারাদণ্ড হয়। আবার ২৪ অক্টোবর ১৯৩০ তারিখে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের জন্য বিশিষ্ট কর্মী সতীশচন্দ্র সাহু ও ধরণীধর প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাদের দশ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৪ নভেম্বর ১৯৩০ তারিখে সুধাংশুশেখর ভুঁইয়াকে গ্রেপ্তার ও ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। তমলুক সমর পরিষদের রবীন্দ্রনাথ গিরিকে ১৮ অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয় ও বিচারে তাঁর ১৬ মাস কারাদণ্ড হয়েছিল। এছাড়াও আরো অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল এই চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রচেষ্টায় কলিকাতাতে একটি অনুসন্ধান সমিতি স্থাপিত হয়। তাদের Law and order in Midnapur অখ্যায় লিখিত রিপোর্টটি আইন অমান্য আন্দোলনের সময়কার সরকারি অত্যাচারের একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

মহাত্মা গান্ধী কারামুক্তির পর ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ এলাহাবাদ থেকে মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন – 'জেলাতে না গিয়েও যতদূর বুঝা যায় আমি তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে ততদূর বুঝতে পেরেছি। তোমরা যে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে সকল কষ্ট সহ্য করেছ তার জন্য আমি তোমাদেরকে সাধুবাদ প্রদান করছি। এইরূপ ক্লেশ সহ্যের মধ্য দিয়েই একটি প্রাণবন্ত জাতির সৃষ্টি হয়। সাংসারিক ধন সম্পদ লাভের দ্বারা স্বাধীনতা বিনষ্টির ক্ষতিপূরণ করা যেতে পারে না। তোমরা যে তোমাদের দুঃখ কষ্টকে তোমাদের স্বাধীনতা বিনষ্টির উর্দ্ধে স্থান দিয়েছ এজন্য আমি আনন্দিত। আমি আশাকরি তোমরা তোমাদের লবণ প্রস্তুতের কর্তব্য অবহেলা করবে না'।[৬৬] ঐ একই দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লিখছেন – 'ভারতের স্বাধীনতার

জন্য যে স্থানগুলি হইতে শহীদদের উদ্ভব ঘটিয়াছে সেগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার একটি সম্মানযোগ্য স্থান রহিয়াছে। স্বাধীনতা দিবস পালনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে এই জেলার কথা স্মরণ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ একটি যোগ্য কার্য হইবে। স্বাধীনতা লাভের জন্য জেলার যে সকল সাহসী নরনারী এইরূপ অসামান্য ক্লেশবরণ করিয়াছেন আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁহাদের প্রতি সম্বর্ধনা জানাই। আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিব তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই কিন্তু এই সংগ্রামের ইতিহাসের উপর হইতে যখন ধুলিজাল অপসারিত হইবে তখন আমরা সংশ্লিষ্ট বহু ক্ষুদ্র ঘটনা ভুলিয়া যাইব। ভারতবাসী বিশেষত ভারতের নারীসমাজ যে বীরত্ব ও ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা ভুলিতে পারিব না। মেদিনীপুর জেলাতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যাওয়াও সম্ভবপর নহে'।[৬৭]

উপরোক্ত আঞ্চলিক আন্দোলন নিয়ে বহু পণ্ডিত ও গবেষকের নানা আলোচনা পাওয়া যায়। বর্তমান গবেষক যথাসম্ভব সেই তথ্য উল্লেখ করে আরো আঞ্চলিক স্তরে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মেদিনীপুর জেলার আন্দোলন ও কৈবর্তদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে মাইক্রো রিসার্চ বা অনুগবেষণা করেছেন যেটি এই গবেষণার মূল বিচার্য বিষয়।

মেদিনীপুর জেলা জুড়ে প্রচুর লবণকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শুধু তমলুকেই ৫৬ টি লবণকেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তমলুকের নিকটে হোগলা গ্রামে ১৪ বিঘা জমিতে এক বিশাল শ্মশান ছিল। সেখানে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধা লবণ প্রস্তুত করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন সকলের পরিচিত কৈবর্ত পরিবারের ঠাকুরদাস মাইতির কন্যা এবং ত্রিলোচন হাজরার পত্নী মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর ডাকে স্বদেশী ও

অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারকাজে নেমে স্বদেশী বস্ত্র বিক্রি করেছেন।[৬৮] তিনি মেদিনীপুরের জেলা কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং সভাগুলিতে গরম গরম বক্তৃতা দেন। শুধু তাই নয় এই বীরাঙ্গনা বারে বারে প্রশাসক ও বিচারকের সামনে দেশের জাতীয় পতাকা তুলে পাশবিক অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও কারাজীবন ভোগ করেছেন। তিনিই গভর্ণর জন হার্বাটের কাছেও এই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এইভাবে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ নেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে 'গান্ধীবুড়ি' বলে ডাকত।[৬৯] এইরকম বিভিন্ন সাহসিকতার পরিচয় দেওয়ায় মেদিনীপুরে কর্মরত ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সেখানকার বিপ্লবীরা হয়ে উঠেছিলেন ত্রাস। তাঁরা বিপ্লবীদের ভীষণ ভয় পেতেন। কেননা পরপর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এই মেদিনীপুরের মাটিতে। তাঁরা হলেন জেমস পেডি (৭ এপ্রিল ১৯৩১), ডগলাস (৩০ এপ্রিল ১৯৩২) এবং বার্জ (২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩)।[৭০]

পরবর্তী সময়ে সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষিতে মেদিনীপুর আরো নতুন উদমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫ অনুসারে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে বাংলার রাজনীতিতে কিষাণ সভার বাংলার শাখা বি.পি.কে.এস (বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কিষাণ সভা) ১৯৩৬এ গঠিত হয়। সমাজের কৃষক ও শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করাই যাদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে হিংসাত্মক কাজকর্ম ছাড়াই দাবী দাওয়া আদায় করতে উদ্যত হয়।[৭১] আর এই বি.পি.কে.এস. গঠনের তিন বছরের মধ্যেই ৫০,০০০ সদস্য নথিভুক্ত হয় এবং ১৯৩৭-৪০ এর মধ্যে ৮০ শতাংশ সদস্য বৃদ্ধি পায়।[৭২] আবার ১৯৩৭

সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে কিষাণ সভা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তারা কে.পি.পি.(কৃষক প্রজা পার্টি)র অধীনে জমিদারি বিরোধী স্লোগান দিতে থাকে।[৭৩] বাংলায় বিশেষত মেদিনীপুর জেলায় কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছিল মাহিষ্য জাতির দ্বারা।[৭৪] মেদিনীপুরের কাঁথি এবং তমলুকে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেছিল। আর এই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভায় মেদিনীপুর জেলা থেকে ছয়জন নির্বাচিত হন। কাঁথি উত্তর কেন্দ্র থেকে ঈশ্বর চন্দ্র মাল, কাঁথি দক্ষিণ থেকে নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, তমলুকে ডা. গোবিন্দ চন্দ্র ভৌমিক, ঝাড়গ্রাম ঘাটাল কেন্দ্র থেকে কিশোরীপতি রায় এবং মেদিনীপুর কেন্দ্রে যুগ্মভাবে কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল এবং কুমার দেবেন্দ্রলাল খান নির্বাচিত হন।[৭৫] এঁদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল ছিলেন নির্দল প্রার্থী আর বাকি পাঁচজন ছিলেন কংগ্রেস দলের। তবে পরে কৃষ্ণপ্রসাদ কংগ্রেসে যোগদান করায় কংগ্রেস একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৩৯ সালে ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার জারী করে ভারতরক্ষা আইন ও অন্যান্য দমনমূলক আইন। ১৯৪১ লাসের ২৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্র বসু নিজ গৃহ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলে যান জাপানে। সেখান থেকে বিভিন্ন দেশে। উদ্দেশ্য বাইরে থেকে বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে দেশকে উদ্ধার করা। এদিকে ১৯৪২ সালে শুরু হল ভারত ছাড়ো আন্দোলন যা আগস্ট আন্দোলন নামে খ্যাত। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট গান্ধীজী, জওহরলাল সহ বহু নেতা গ্রেফতার হলেন। গান্ধীজী তখন বলেন জনগণই নেতা, তারাই আন্দোলন পরিচালনা করবেন। গান্ধীজী আরো বলেছেন –

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে; স্বাধীনতার শেষ লড়াই। ফলে জনগণের মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ল ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। আকাশ বাতাস ধ্বনিত হল 'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়ো'। মেদিনীপুর জেলায় সম্পূর্ণ অহিংস পথে শুরু হল আন্দোলন। ৯ আগস্ট পরবর্তী দিন থেকেই জেলার বিভিন্ন স্থানে সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল প্রভৃতি গণবিক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জেলার মানুষজন। তবে এই সভা সমিতিগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য যথা, মহিষাদলে নবাগতা মহিলা গিরিবালা দে, সুতাহাটার সুবোধবালা কুইতি, কুমুদিনী ডাকুয়া প্রমুখ। জনসভাগুলিতে এইসমস্ত মহিলা নেতৃবৃন্দ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।[৭৬] ১৪ আগস্ট কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন থানায় হরতাল পালিত হয়। কাঁথির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রচাত্রীরা হরতাল পালন করে এবং শোভাযাত্রা করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আভামাইতি এবং স্বদেশ রঞ্জন ভুঁইয়া প্রমুখের নেতৃত্বে।[৭৭] এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোহাই দিয়ে ভারতরক্ষা আইনে খবরের কাগজগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। ১৯৪২-এর ১৬ আগস্ট থেকে ১০ দিনের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা, দ্য টেলিগ্রাফ, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড, বসুমতী, সংক্ষিপ্ত আনন্দবাজার পত্রিকা, বিশ্বামিত্র, মাতৃভূমি, ভারত, দৈনিক কৃষক, জাগৃতি, প্রত্যহ এবং লোকমান্য প্রভৃতি ১৫টি সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিল।[৭৮] এসময় রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু প্রমুখের চেষ্টায় গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকার বাংলা সংস্করণ এবং দৈনিক ভারত পত্রিকা বিভিন্ন প্রান্তে ছেপে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ খানাতল্লাসি চালিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গচুর চালিয়ে ১৮, ২০ আগস্ট বন্ধ করে দেয়। এইভাবে যুদ্ধের দোহাই দিয়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল।

অবিভক্ত তমলুক মহকুমায় নন্দীগ্রাম থানার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ২৪ আগস্ট ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হল থানা সমর পরিষদ। এর সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া এবং সহ-সভাপতি কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস। অপর তিনজন সদস্য হলেন সতীশচন্দ্র সাহু, এবং দুই কলেজত্যাগী ছাত্র বঙ্গভূষণ ভক্ত ও অমূল্যরতন ভৌমিক।[৭৯] সমর পরিষদ ঠিক করেন যে ১৫টি ইউনিয়নের কংগ্রেস শিবিরগুলি সংগ্রাম শিবির নামে অভিহিত হবে। সেইমতো কর্মকান্ড শুরু হল। ২ সেপ্টেম্বর নন্দীগ্রামে ৪টি জনসভা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর মহিষাদল থানার দনীপুর রাইসমিলে চাল পাচারে সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে বাধা দিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। নিহত হলেন তিনজন- টোটাবেড়িয়ার ধীরেন দিগার, অমৃতবেড়িয়ার শশীভূষণ মান্না এবং সুরেন্দ্রনাথ কর।[৮০] পরেরদিন দনীপুর নিকটস্থ ৬টি গ্রাম থেকে খানাতল্লাশি করে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে ও প্রায় ২০০ লোককে সকাল থেকে না খেতে দিয়ে বেলা দুটো পর্যন্ত রোদে বসিয়ে রেখে তারপর ছেড়ে দেয়।[৮১] ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ কাঁথি মহকুমার ছয়টি থানার প্রায় ১০হাজার মানুষ মিছিল সহকারে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ প্রহার, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, গুলিবর্ষণ ও তল্লাশী চালাতে থাকে।[৮২] ১৫ সেপ্টেম্বর পুলিশ বিশিষ্ট জননেতা ও অন্যতম সংগঠক সুধীরচন্দ্র সামন্তকে তমলুক শহরে গ্রেপ্তার করে। ঐ দিনই পুলিশী অত্যাচারের প্রতিবাদে ছাত্ররা কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে মিছিলের আয়োজন করে। এই বিশাল মিছিল দেখে পুলিশ হতভম্ব হয়ে যান। সেদিন পুলিশ ২৮ জন ছাত্র নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করে - পরমেশ্বর পাল, লক্ষ্মীনারায়ন বেরা, অতুল মিশ্র, প্রসন্ন গিরি, অনন্ত জানা, সতীশ মাইতি, অনন্তকুমার দাস, হরিপদ গিরি, অনন্ত বাকির, প্রবোধ ভৌমিক, অনন্ত কুমার দাস,

ব্যোমকেশ মহাপাত্র, সিধাংশু আচার্য, অভিমুন্য গিরি, শ্রীকান্ত বারিক, বঙ্কিম বর, জগদীশ মাইতি, হরিপদ মাইতি, অনিল ভূষণ রায়, শ্রীপতি দাস, সরোজ রাণা, বিরাজ সিনহা, সন্তোষ ভুঁইয়া, বিষ্ণুপদ দিন্দা, কানাইলাল সেন, দীনেন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ব্যানার্জী এবং ঘনশ্যাম পণ্ডা।[৮৩] ১৬ সেপ্টেম্বর তেরপাখিয়া বাজারে হরতাল হলে পুলিশ স্বেচ্ছাসেবকদের বেত্রাঘাত করে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ কাঁথি থানার পিছাবনীতে পুলিশ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তার করলে এলাকায় খহুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সমবেত জনতা বন্দীদের মুক্তির জন্য প্রবল চাপ দিলে পুলিশ পরিস্থিতি বিচার করে বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়। ২২ সেপ্টেম্বর মহিষগেটে পুলিশী অত্যাচারের ভয়ে রাস্তা কেটে দেয়। তখন পুলিশ মহকুমা শাসক নিয়ে হাজির হন এবং জনতাকে রাস্তা মেরামতে বাধ্য করে। কিন্তু কথা কাটাকাটিতে পরিস্থিতি জটিল আকার নিলে পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। এতে কয়েকজন শহীদ হন। এঁরা হলেন যামিনীকান্ত কামিলা, সর্বেশ্বর প্রামানিক, রামপ্রসাদ জানা, অনন্ত কুমার পাত্র, অনন্ত কুমার দাস। এই ঘটনায় আহত হন ২৪জন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন – সুধাকর পণ্ডা, বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান, হরিপদ শাসমল, গঙ্গাধর দাস, গুণধর শাসমল, বসন্ত কুমার দাস প্রমুখ।[৮৪]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারের জন্য মিটিং মিছিল সভা সমিতিতে একটি স্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল সেটি হল-

ইংরেজ এবার ভারত ছাড়ো ভারত থেকে সরে পড়।
করব না হয় মরব মোরা স্বাধীনতা আন ত্বরা।
হিন্দু পার্শী শিখ মুসলমান দেশের কাজে হও আগুয়ান।
ইংরেজ, নেতাদের মুক্তি দাও ভারত থেকে সরে যাও।

ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে পড়   শিক্ষার চেয়ে মুক্তি বড়।

দেশের কাজে লাগতে হবে   স্বাধীনতা আসবে তবে।

বিকের রক্ত দিতে হবে   তবেই দেশ স্বাধীন হবে।[৮৫]

মেদিনীপুর জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে ও পরে তমলুকের মহকুমা ও থানা কমিটিগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় যে এখানেও সতীশচন্দ্র সামন্ত ছিলেন মধ্যমণি। এইসমস্ত কমিটিগুলির সভাপতি ও সম্পাদকদের একটি বিবরণ দেওয়া হল। তাম্রলিপ্ত মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত এবং সহ-সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া এবং সম্পাদক হলেন অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক হলেন সুশীল কুমার ধাড়া; আর থানা কংগ্রেস কমিটিগুলির মধ্যে তমলুক থানার সভানেত্রী সুহাসিনী দেবী, সম্পাদক রমেশ চন্দ্র বর; পাঁশকুড়া থানার সভানেত্রী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, সম্পাদক রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী; মহিষাদল থানার সভাপতি নীলমণি হাজরা, সম্পাদক সুশীল কুমার ধাড়া; নন্দীগ্রাম থানার সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া, সম্পাদক কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস; ময়না থানার সভাপতি অনঙ্গ মোহন দাস এবং সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্র নাথ ভৌমিক; সুতাহাটা থানার সভাপুতি ইন্দুমতি ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী।[৮৬] এভাবে সভা, সমিতি, মিটিং মিছিল, শোভাযাত্রার দ্বারা কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন অনুভব করলেন যে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরুর ক্ষেত্র প্রস্তুত তখন ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে জেলার নেতারা বিশিষ্ট আইনজীবী মন্মথনাথ দাসের কলকাতার চেতলার বাড়িতে এক বৈঠকে মিলিত হন। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, বিরাজমোহন দাস, রামসুন্দর সিং, শৈলজা সেন, ভীমাচরণ পাত্র, আদিত্য কুমার

বাঁকুড়া ও মহেন্দ্র মাহাতো প্রমুখ।[৮৭] এই সভায় স্থির করেন যে ২৯ সেপ্টেম্বর ৩টের সময় একইদিনে সরকারি থানা অফিস সব দখল করা হবে এবং তাঁর আগেরদিন রাস্তাঘাট কেটে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তাঁর ছিঁড়ে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অচল করে দেওয়া হবে। থানা আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ১০ হাজার টাকার একটি তহবিল গঠন করা হল। অভিযানে আহতদের চিকিৎসার কথা মাথায় রেখে গঠিত হয় চারটে মেডিক্যাল ইউনিট। ডা. বিপিন বিহারী গায়েন, ডা. বীরেশ্বর বসু, ডা. সুরেন্দ্রনাথ মাল, ডা. ব্রজেন্দ্রকুমার মাইতি, ডা. বিমল চন্দ্র প্রধান, ডা. বিশ্বনাথ আদক প্রমুখরা স্বতস্ফূর্তভাবে চিকিৎসার দায়িত্ব তুলে নেন।[৮৮] এইরকমভাবে সকলে এগিয়ে আসতে লাগল। তেমনি অবিভিক্ত কাঁথি মহকুমার খেজুরি থানা দখলকে বাস্তবায়িত করার জন্য গঠিত হল থানা সমর পরিষদ। এর সদস্যরা ছিলেন- পুলিন বিহারী সেন, গোবিন্দপ্রসাদ হাইত, রাধিকানাথ সামন্ত, বীরেন্দ্রনাথ মাল, উপেন্দ্রনাথ জানা, কৌস্তভকান্তি করণ, অমৃতলাল দাস, যোগেন্দ্রনাথ পাত্র, পরেশচন্দ্র ঘোড়ই এবং সন্তোষকুমার জানা।[৮৯]

সিদ্ধান্ত হল যে পূর্ব নির্ধারিত দিন ২৯ সেপ্টেম্বর ৩টের সময় একইদিনে সরকারি থানা অফিস সব দখল করা হবে এবং তাঁর আগেরদিন রাস্তাঘাট কেটে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তাঁর ছিঁড়ে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অচল করে দেওয়া হবে। সেইমতো সমস্ত জায়গায় ২৮ সেপ্টেম্বর রাত্রি বারোটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত হ্যাজাক লাইট লণ্ঠন জ্বেলে কয়েক হাজার মানুষ এই কর্মকান্ডে অংশ নিয়েছিল। ‘বিপ্লবী’র চতুর্থ

সংখ্যায় লেখা 'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি' দেখেই বোঝা যায় সকলেই প্রস্তুত।[৯০]

পূর্ব নির্ধারিত ২৯ সেপ্টেম্বর থানা দখলের অভিযানের জন্য ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে তিন চার হাজার স্বেচ্ছাসেবক জমায়েত হলেন আজানবাড়ি বাজারে। ইতিমধ্যে চার পাঁচ মণ চিড়া, গুড়, কয়েকটিন কেরোসিন এবং মশাল তৈরির জন্য বাঁশ, পাট সংগ্রহ করা হয়। সমস্ত প্রস্তুতিই চলল সম্পূর্ণ নীরবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে।[৯১] কিন্তু তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে সম্ভবত ২৮ সেপ্টেম্বরেই সন্ধ্যে ৭ টায় খেজুরী থানার হেড়িয়া খাসমহল দখল করা হয় পূর্নেন্দুশেখর ভৌমিকের নেতৃত্বে। তাঁর বিশেষ সহযোগী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ গিরি, জীবনকৃষ্ণ গিরি, শচীন সামন্ত, সুভাষচন্দ্র সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ বেরা, নারায়ণ চন্দ্র পড়্যা প্রমুখ। খাসমহলের অফিসার নাজিরুদ্দীন আহমেদকে জগদীশ গুড়্যার বাড়ীতে রাখা হয় ও পরে তাঁকে অন্যত্র ছেড়ে দেওয়া হয়। খাসমহল দখলের পর গোড়াহার পুল, পালাবনিয়া পুল ধ্বংস করে কাঁথির সঙ্গে খেজুরীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিসংযোগ করা হয় কালিনগর টোল অফিস এবং সাব ওভারসিয়ার অফিস।[৯২] এইভাবে ২৮ সেপ্টেম্বর বিনা রক্তপাতে খেজুরি থানা ও হেড়িয়া খাসমহল অফিস দখলের পর আন্দোলনকারীরা কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর থানা আক্রমণ করে ২৯ সেপ্টেম্বর নির্দিষ্ট দিনে। পুলিশের গুলিতে আহত হলেন শতাধিক আর শহীদ হলেন ১৭ জন।[৯৩] এঁদের মধ্যে দু-একজন বাদে প্রায় সকলেই কৈবর্ত জাতির মানুষ। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে কালিপদ রায় মহাপাত্রের নেতৃত্বে পটাশপুর থানা আক্রমণ করা হল। বিনা রক্তপাতে দখল

করে দারোগা ও কয়েকজন কনস্টেবলকে বন্দী করা হয়। থানার সমস্ত আসবাবপত্র ও কাগজপত্র ধ্বংস করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।[৯৪] থানা দখলের পর উল্লসিত জনগণ পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হন। এখানে উল্লেখ্য ২৯ সেপ্টেম্বর রামনগর ও কাঁথি থানা আক্রান্ত না হলেও অন্যান্য সরকারি অফিসে আক্রমণ ও ধ্বংস কাজ চলেছিল। আন্দোলনকারীরা কাঁথি থানার অধীন দুটি পোষ্ট অফিস, একটি ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, পঞ্চায়েত ইউনিয়ন অফিস, ঋণ সালিশী বোর্ড, কাঁথি ডাকবাংলো ধ্বংস ও বিভিন্ন স্থানে রাস্তা কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল।[৯৫] এইভাবে পাঁচদিন ধরে মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যে বিশাল কর্মকাণ্ড চলেছিল তাতে ব্রিটিশ সরকার হতভম্ব হয়ে যায়। ১৯৪২-এর অভিযান সম্বন্ধে মেদিনীপুরের তৎকালীন অতিরিক্ত জেলাশাসক মৃগাঙ্ক মৌলি বসু তাঁর রিপোর্টে বলেছেন- 'এমন হঠাৎ করে এবং সর্বত্র একযোগে এই আক্রমণ ঘটল যে আগে থেকে কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ...কারণ সব যোগাযোগ ব্যবস্থা আচল করে দেওয়া হয়েছিল।[৯৬]

২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক শহর অভিযান হবে এই খবর সরকারের কাছে ছিল। সেইমতো শহরে ঢোকার প্রধান পাঁচটি পথে আন্দোলনকারীরা অগ্রসর হতে লাগল। শোভাযাত্রাকারীদের মোকাবিলার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। এই শোভাযাত্রায় অগণিত নরনারী ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তমলুকের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল। শহরের প্রধান প্রবেশ পথের দায়িত্বে ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। তাঁরা থানার সামনে হাজির হল। পুলিশের লাঠিচার্জ অগ্রাহ্য করে এগোলে সেনারা গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন নিহত হন এবং অনেকেই আহত হন। শহরের উত্তর দিক থেকে রূপনারায়ন নদীর ধার

ধরে এগিয়ে আসে অপর মিছিল। এই মিছিলে তমলুকের ২,৩,৪,৭ নং ইউনিয়নের লোকজন যোগদান করেছিল। তমলুক কোর্টের কাছে এলে পুলিশ বাধা দেয়। অনেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে পিছিয়ে আসছে দেখে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেত্রী গান্ধীবুড়ি পতাকা হাতে বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে চললেন। পুলিশের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে মিছিল এগোলে পুলিশ মাতঙ্গিনী ও মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাঁর এক হাতে গুলি লাগলে অন্য হাতে পতাকা হাতে ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যান। কিন্তু পুলিশ পুনরায় অন্য হাতে এবং পরে কপালে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে মাতঙ্গিনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাঁর সঙ্গে শহীদ হলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, পুরীমাধব প্রামানিক, জীবনচন্দ্র বেরা, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত এবং আহত হল অসংখ্য।[৯৭] অপরদিকে ক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতির নেতৃত্বে ৪,৫,৯ নং ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষজন তমলুকের দিকে এগিয়ে চলল। শঙ্করয়াড়া ব্রিজের উপর পুলিশ কোনোরকম সতর্কবার্তা ছাড়াই গুলিবর্ষন করে। উপেন্দ্রনাথ জানা ঘুটনাস্থলেই নিহত হন। অনেকে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দুদিন পরে পূর্ণচন্দ্র মাইতি প্রাণ হারান। পুলিশের গুলিতে অনেকে ছটফট করলেও পুলিশের ভয়ে কেউ জল দিতে এগিয়ে না গেলেও বারাঙ্গনা সাবিত্রী দাসী সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আন্দোলনকারীদের মুখে জল তুলে দেন। তাঁর এই অসীম সাহসিকতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহিষাদল থানার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কংগ্রেস সভাপতি নীলমণি হাজরার নেতৃত্বে সবচেয়ে সুসংগঠিত ছিল। সুশীল ধাড়ার গড়ে তোলা বিদ্যুৎ বাহিনী নিয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যান হাজার হাজার অনুগামীদের নিয়ে। আসলে তিনিই ছিলেন এই

শোভযাত্রার মধ্যমণি। সুশীল ধাড়া একইসঙ্গে সুতাহাটা থানার দায়িত্বেও ছিলেন। ঐ দিন মহিষাদলে শহীদ হন তেরো জন।[৯৮] সুতাহাটা থানার নেতা কুমারচন্দ্র জানা, ক্ষুদিরাম ডাকুয়া, হীরালাল জানা ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলে শুধুমাত্র সুশীল ধাড়ার উপরেই দায়িত্ব থাকে। সুতাহাটা থানার সামনে জনতা এলে পুলিশ আত্মসমর্পণ করে। এই থানার মহিলা কংগ্রেস কর্মীর সংগঠন মজবুত ছিল। এঁদের মধ্যে কুমারচন্দ্র জানার স্ত্রী চারুশীলা দেবী, ক্ষুদিরাম ডাকুয়ার স্ত্রী কুমুদিনী দেবী, কিশোরী মোহন কুইতির স্ত্রী সুবোধবালা দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই এখানেই প্রথম ভগিনী সেনাদল তৈরি হয় ও পরে তা অন্যান্য থানাতেও বিস্তৃতি লাভ করে। আবার নন্দীগ্রাম থানা অভিযানের তারিখ একদিন পিছিয়ে ৩০তারিখ করা হল। কিন্তু পুলিশের ব্যাপক গুলিবর্ষনের সামনে চারজন আন্দোলনকারী শহীদ হন। এঁরা হলেন – শেখ আলাউদ্দিন, বিহারীলাল করণ, বিহারীলাল হাজরা এবং পুলিন বিহারী প্রধান।[৯৯] অন্যদিকে ময়না থানা আর পাঁশকুড়া থানার সংগঠন অন্য চারটির তুলনায় বেশ দুর্বল ছিল। ময়না থানা এলাকার সংগঠনের মূল দায়িত্বে ছিলেন অনঙ্গমোহন দাস। তিনি আন্দোলনের প্রথম দিকেই গ্রেপ্তার হন। সুতরাং নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্যে ছিলেন অবিনাশচন্দ্র দাস, কুঞ্জবিহারী পট্টনায়েক, চৈতন্যচরণ দাস প্রমুখ। ময়না থানা অভিযানে সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভৌমিক, শরৎচন্দ্র দাস, কালিপদ মাইতি, কালিপদ জানা প্রমুখ। এভাবে ময়না থানার সামনে প্রায় দশ হাজার লোকের জমায়েত হয়েছিল। তারা থানার দিকে এগিয়ে ঝুঁকি না নিয়ে নিকটে একটি অশ্বত্থগাছের উপর পতাকা উত্তোলন করে ফিরে যায়। আর পাঁশকুড়া থানার কোন কর্মসূচী নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁরা ২৯ তারিখ রাত্রে তমলুক এলাকার কর্মীদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে কাজ করেন।[১০০]

১৯৪২ সালের ৯ আগস্টের পর কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বহু ব্রিটিশ বিরোধী মিছিল সংগঠিত হয়। তমলুকের মহকুমা কংগ্রেস সমস্ত সরকারি দপ্তর ও আদালত বয়কট করার ডাক দেয়। প্রতিদিন পাঁচ থেকে দশ হাজার নরনারী মহকুমা শাসকের দপ্তর ও আদালতের সামনে জমায়েত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান দাবি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেন।[১০১] মহিষাদল ও তমলুকে সুশীল ধাড়া ও গোপীনন্দন গোস্বামীর নেতৃত্বে ৩০০০ সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে ওঠে। পরে তাদের সংখ্যা বেড়ে ৫০০০-এ পৌঁছায়।[১০২]

১৯৪২-এর আগস্টে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য 'সেনাপতি পরিষদ' গঠিত হয়। তার ছয় জন সদস্যের মধ্যে তিনজন – রাসবিহারী পাল, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও সুধীর দাসকে আন্দোলন চলাকালে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।[১০৩] এরপর কাঁথি মহকুমায় সংগ্রাম পরিষদ প্রত্যেক থানায় এক হাজার করে সংগ্রামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।[১০৪] তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটায় একই ধরণের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং সুশীল কুমার ধাড়া ও তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা তাদের গেরিলা সংগ্রামের কায়দাকানুনে শিক্ষিত করতে থাকেন।[১০৫]

কাঁথি মহকুমায় খেজুরি ও পটাশপুরের থানা আক্রমণ করা হয় ২৮ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে। হঠাৎ আক্রমণের ফলে সংগ্রামীরা থানাদুটি দখল করে নেন। খেজুরি থানার তিনদিক ঘিরে ছয় হাজার সংগ্রামী সম্মুখ সমরে থানা দখল করে। আর পটাশপুরে সাত হাজার সংগ্রামী চারদিক ঘিরে ফেলে পুলিশকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেয় এবং থানা দুটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।[১০৬]

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এইসময় যে শুধু সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল তাই নয়, সেসময় সরকারের তাঁবেদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ জমিদারবর্গের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর সংগ্রামীদের সাথে পূর্ব মেদিনীপুরের জমিদার মহিষাদলের রাজা গর্গ বাহাদুরের প্রবল সংঘর্ষ হয়। তার বিবরণ দিতে গিয়ে জাতীয় সরকারের গোপন মুখপত্র 'বিপ্লবী'তে লেখা হয়- মহিষাদল থানার বিভিন্ন দিক হইতে প্রায় পনেরো হাজার নরনারী শোভাযাত্রা সহকারে থানার দিকে অগ্রসর হলে অহিংস জনতার উপর মহিষাদল রাজকুমারের প্রহরীরা বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকে। .... ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ২০ জন নিহত এবং শতাধিক গুরুতরভাবে আহত হন। ..... রাজকুমার পুলিশকে সাহায্য না করিলে কোনোলোকই হতাহত হত না। ...দুঃখী প্রজাদের অন্নে পুষ্ট, নিষ্ঠুর, শয়তান, দেশদ্রোহী পশু নৃশংস রাজকুমারদের এই অত্যাচারের প্রতিশোধ তাহার নিজ প্রজাগণ লইবে না কি? চিরদিন কি তাহারা জমিদারদের এইরূপ অত্যাচার চোখ বুঝিয়া সহ্য করিবে?'[১০৭] যদিও জনতার প্রচণ্ড ক্রোধ দেখে আতঙ্কিত হয়ে মহিষাদলের রাজকুমার পরে একটি ইস্তাহার ছেপে তাতে তার ও তার দেহরক্ষীদের নৃশংস ব্যবহারের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করেন।[১০৮]

১৯৪২-এর ২ অক্টোবর প্রাদেশিক সরকারকে গোপন রিপোর্ট পাঠিয়ে মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন.এম.বসু, আই.সি.এস. লিখেছিলেন- এইসব আক্রমণ এত আকস্মিকভাবে ও একযোগে হয়েছিল, যে আগের থেকে এই আক্রমণ ঠেকাবার কোনো উপায় ছিল না।[১০৯] সুতরাং এই দুটি মহকুমার বেশিরভাগ অঞ্চল সরকারের হাতছাড়া হয়ে সংগ্রামী কংগ্রেসপন্থীদের হাতে চলে যায়। বিভিন্ন থানার দপ্তর মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম.এন.খান কলকাতায় পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন- বিদ্রোহী কৃষকদের বড়ো বড়ো দল সমগ্র গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সরকারি ছোটো বাহিনি দেখলেই তাদের আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।[১১০] বঙ্গদেশের তৎকালীন গভর্ণর হার্বাট মেদিনীপুরের এইসব ঘটনাকে 'একটি বড়ো ধরণের প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১১১] এইভাবে সংগ্রামীদের দাপটে মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরো সৈন্য পাঠাতে বলেন। সেসময় পুলিশের মনোবল প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিল। পুলিশ সুপার টেলর মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খানকে এক গোপন চিঠিতে লেখেন- সেনাবহরের কর্তৃপক্ষকে বলবেন যে সৈন্যরা যেন ব্রেনগান ও টামিগানের মতো শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্র ও অফুরন্ত বুলেট নিয়ে আসে। কারণ এই জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীরা কতদূর যাবে তা বুঝতে পারছি না।[১১২] তবে এত ফৌজ পাঠানো সত্ত্বেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। কেননা বিদ্রোহী জনগণ যথেষ্ট সুসংগঠিত ও নির্ভীক। সশস্ত্র পুলিশ দলকে বহু জায়গায় জনতা আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করতে লাগল। এইসব ঘটনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘাবড়ে গিয়ে প্রাদেশিক সরকারকে চিঠি লেখেন- গাড়ওয়ালি সৈন্যদের বদলে তারা যেন পাঞ্জাবি মুসলমান সৈন্য বা শিখ সৈন্য পাঠিয়ে দেন।[১১৩] পটাশপুর থানা আক্রমণের সময়ে দেখা গেল বড়ো সৈন্যদলকে দেখে পালিয়ে যাওয়ার বদলে ২৫০০০ জনের এক ক্রুদ্ধ জনতা সেনাবাহিনীর উপর পালটা আক্রমণ চালায়। নরঘাটেও বিদ্রোহীরা উৎকৃষ্ট রণকৌশলে সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে। অন্যান্য সমস্ত জায়গাতেও আতঙ্কিত পুলিশ গুলি চালালে বহু মানুষ হতাহত হন। কিন্তু বিদ্রোহ কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম.এন.বসু তার রিপোর্টে বলেন- মনে হচ্ছে তমলুক মহকুমার বিদ্রোহী জনগণ পুলিশ বা

মিলিটারির তোয়াক্কা করে না।[১১৪] সরকারি রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে পুলিশ ও মিলিটারির উপর বিদ্রোহী জনগণের আক্রমণ খুবই সুপরিকল্পিত ছিল।

অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনে শাসক দল প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছিল। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন.এম.খান ছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। আর তমলুকের এস.ডি.ও সমর সেনও ছিলেন ভয়ংকর অত্যাচারী। এছাড়া অন্যান্য স্পেশাল অফিসারেরা শত শত গ্রামবাসীদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করেছিলেন। এঁদের অত্যাচার খুবই হিংস্র ও ভয়াবহ ছিল। সেকথা সরকারি রিপোর্টেও মেনে নেওয়া হয়।[১১৫]

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পরেই ঘূর্ণি ঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকাবাসী মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। তমলুক ও কাঁথি উভয় মহকুমাতেই জাতীয় সরকার সর্বস্বান্ত জনগণের ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের জন্যে ব্যাপক ত্রাণকাজ সংগঠিত করেছিল।[১১৬] তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার ত্রাণকাজে প্রায় আশি হাজার টাকা খরচ করেছিল। তাদের অর্থ সাহায্যের দ্বারা অনেকগুলি জাতীয় স্কুল গড়ে ওঠে। তমলুক জাতীয় সরকারের নিজস্ব ডাক ব্যবস্থাও ছিল।[১১৭] এছাড়া তমলুক এবং কাঁথি মহকুমাতে নিজস্ব বচার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছিল। কাঁথি মহকুমায় জনপদ পঞ্চায়েত, মহল ধর্মাধিকরণ এবং কেন্দ্রীয় ধর্মাধিকরণ –এই তিন ধরণের বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। উভয় মহকুমাতেই জাতীয় আদালতগুলিতে বৈষয়িক ও ফৌজদারি মামলা উভয়েরই ব্যবস্থা ছিল।[১১৮]

১৯৪৩-এর ১০ ফেব্রুয়ারি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী আন্দোলনের হিংস্রতা সম্পর্কে বড়োলাট লিনলিথগোকে এক চিঠিতে লেখেন- ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে

দখল করে থাকার জন্যই কংগ্রেসের দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। ..... ইতিহাসে এই হত্যাকাণ্ডের কথা চিন্তা করলে দম বন্ধ করার উপক্রম হয়। .... গভর্ণমেন্টই জনগণকে উত্তেজিত করে উন্মাদ করে তুলেছে। তাদের হিংস্রতা এত ব্যাপক যে তা দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়ার নীতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং একজনের অপরাধে দশ হাজার লোককে অপরাধী করা হয়েছে। ... আর যেসব ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার জন্য গভর্ণমেন্টই দায়ী, কংগ্রেস নয়।[১১৯] গান্ধিজির এই অনশন প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী ১৯৪৩-এর ২ মার্চ এক প্রবন্ধে লেখেন- ২১ দিন ধরিয়া যে কৃশতনু মানুষটির জীবনদীপ নিবু নিবু করিয়াও জ্বলিতেছে, তাহা তো কেবল একটি মানুষের জীবনই নহে, তাহাকে ঘিরিয়া জ্বলিতেছে ৪০ কোটি ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের অদম্য দীপশিখাটি। তাই তাহা নিভিবার নহে।[১২০]

১৯৪৩ সালের মার্চ মাস থেকে সরকারি দমন নীতি এতটাই ব্যাপক ও তীব্র হয় যে তমলুকের জাতীয় সরকার প্রকাশ্যে কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৩-এর মে থেকে জুলাই একমাত্র মহিষাদল ছাড়া সর্বত্রই শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। কয়েকদিন পরে বিদ্যুৎ বাহিনীর অধিনায়ক সুশীল ধাড়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। কিন্তু কিছুদিন পরে সুশীল ধাড়া জামিনে ছাড়া পান। আর তাতেই অবস্থা অন্যদিকে মোড় নেয়। সুশীল ধাড়া এবার গোপনে সংগ্রাম পরিচালনা করতে থাকেন। তার নেতৃত্বে তমলুক মহকুমায় আবার ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জোয়ার আসে। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে সরকারি পাক্ষিক রিপোর্টে বলা হল- তমলুকের

পরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়।[১২১] ১৯৪৪ সালের শুরু থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে। কাঁথির সংগ্রামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মুখপত্র ‘স্বাধীন ভারত’ পত্রিকায় ১৯৪৩-এর ৫ ডিসেম্বর লেখা হয়েছিল- বাঁচবার প্রয়োজনে প্রত্যেক গ্রামে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্য কোনো নিরাপদ স্থানে ধান চাল জমা করে রাখতে হবে। যদি অত্যাচারীরা সেই ধান চাল জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে যায়, তবে তাদের সেই উৎপীড়নের হাত কেটে বাদ দিলে কি পাপ হবে? তিলে তিলে ক্ষুধার জ্বালায় মরার চেয়ে অত্যাচার উৎপীড়নের প্রতিরোধ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও শ্রেয়। এই প্রতিরোধ আপনার জন্য পুণ্য সঞ্চয় করবে’।[১২২] যে আগস্ট মাসে বাংলার নতুন গভর্ণর লর্ড রিচার্ড কে.সি. তার এক গোপন চিঠিতে বড়োলাট ওয়াভেলকে লেখেন যে ‘তমলুক মহকুমার অবস্থা এখনও মোটেই ভালো নয়, বরঞ্চ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় সরকারের এখনও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে’। তিনি আরও বলেন যে ‘তমলুকের পরিস্থিতি একেবারেই অসহ্য’।[১২৩]

ব্রিটিশ সরকারের হিংস্র ও দমন নীতি ছাড়াও যে বিষয়টি মেদিনীপুরের মানুষকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করেছিল তা হল সরকারের পুলিশ বাহিনীর মেয়েদের উপর বর্বর অত্যাচার, ব্যাপক নারীধর্ষণ। ১৯৪৩ সালের ২৫ জানুয়ারি ‘বিপ্লবী’তে লেখা হল ৯ জানুয়ারি তমলুক মহকুমার মাশুড়্যা, ডিহি মাশুড়্যা এবং চন্ডীপুর -এই তিনটি গ্রামে ব্রিটিশ ফৌজ তাণ্ডব করে মোট ছেচল্লিশজন মেয়েকে ধর্ষণ করেছে।[১২৪] এদিনের ‘বিপ্লবী’র সংখ্যায় ‘ব্রিটিশ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন’ নামে একটি জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখেছিল। তবে একথা ভাবার কোন কারণ নেই যে মেদিনীপুরের মেয়েরা সকলেই ধর্ষণের শিকার হয়েছিল তারাই কুমুদিনী

ডাকুয়া, গিরিবালা দে, মাখনবালা দাস প্রমুখের নেতৃত্বে মোকাবিলা করেছিল ছুরি, শাবল, দা, বঁটি দিয়ে বীরের মতো। তারাই গঠন করেছিল ভগিনী সেনা। সেইসব দৃষ্টান্ত দিয়ে 'বিপ্লবী' লিখেছিল- মেয়েরা জোটবদ্ধ হইয়া দুর্বৃত্তদের যে কোনো অঙ্গে প্রাণপণে আঘাত করিলে তবেই নরপশুগুলো ঠান্ডা হইবে। সেই আঘাতে যদি ২/৪টা নরপশু মারা যায়, ক্ষতি নাই।[১২৫] একইসঙ্গে ১৯৪৩ সালের ২৫ জানুয়ারি 'বিপ্লবী'র সম্পাদকীয়র শেষে লেখা হল- ভারতবাসী! আর কতদিন দেশের বুকে এইসব পৈশাচিক অত্যাচার চলিতে দিবে? যুবশক্তি আর কতকাল বসিয়া নীরবে নারী নির্যাতন দেখিবে? ....মেদিনীপুরবাসী! তোমাদের মা বোনেদের ইজ্জত তোমরা না রক্ষা করিলে কে করিবে? একটিমাত্র আঘাতে যে শাসনযন্ত্রকে অচল করিয়া দিয়াছ, দ্বিতীয় আঘাতে তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও।[১২৬]

মহাত্মা গান্ধি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন সবকটি থেকে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ছিল এক অন্য ধরণের। ১৯২০-২২ সালের অহিংস অসহযোগ বা ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলন আসলে ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত এক আন্দোলন। কিন্তু ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধিজি শুরুতেই বলেছিলেন এই সংগ্রাম হবে ইংরেজ শাসকদের সম্পূর্ণভাবে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করার সংগ্রাম।[১২৭] এছাড়াও বলা হয়েছিল এবারে হবে 'চুড়ান্ত সংগ্রাম, প্রকাশ্য বিদ্রোহ, এবং যেকোনো মূল্যে বিদেশি দাসত্বের অবসান করার লড়াই'। ১৯৪২-এর মার্চ থেকে আগস্টের শুরু পর্যন্ত 'হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে গান্ধিজি বলছেন, এবারে বিদেশি শাসনের অবসানের জন্য জনগণ প্রয়োজন বোধ

করলে সশস্ত্র সংগ্রামও করতে পারবেন। একইসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের গোপন রিপোর্টেও এসব কথা বলা ছিল। বিভিন্ন কংগ্রেস নেতারা বলেছিলেন এই আন্দোলনে প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস করতে পারবেন। এমনকি তারা কংগ্রেস দলভুক্ত না হলেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে যোগদান করতে পারবেন। আর নেতারা গ্রেফতার হলে ছাত্র সমাজকে নেতৃত্ব নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই আন্দোলনের পদ্ধতির মধ্যে ধর্মঘট, সেতু ভেঙ্গে ফেলা, রেললাইন উপড়ে ফেলা, সমস্ত রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা, সবকিছুই এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১২৮] ১৯৪৩ সালে তমলুক থেকে প্রচারিত ‘বিপ্লবী’র ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল- ‘বিপ্লবের পথে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে ধ্বংস করতে হবে। তমলুকবাসী! মরতেই যদি হয়, ধুঁকে ধুঁকে পেটের জ্বালায় মরবেন কেন? তার চেয়ে গুলির মুখে বীরের মতো দাঁড়িয়ে এই শয়তানি শাসনকে আসুন সাগরের জলে বিসর্জন দিই। দুর্ভিক্ষে সবাই মরবে। কিন্তু গুলিতে তমলুকের সাড়ে সাত লক্ষ লোকের কটাকে মারবে?’[১২৯] এদিকে জাপানিদের সম্ভাব্য আক্রমণকে রুখতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সমুদ্রের তীরে কাঁথি মহকুমার দরিদ্র হাজার হাজার জেলের শত শত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করে দেয়। ফলে জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে না পেরে তারা সপরিবারে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছিল। ১৯৩০-৩২ সালে এই দরিদ্র জেলে কৃষকরাই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গান্ধিজির ডাকে আইন অমান্য করেছিল। শাসকের নিষ্ঠুর দমন নীতির সম্মুখীন হয়েছিল। আর ঠিক এক দশক আগের স্মৃতি ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথি মহকুমার জেলে কৃষক ও জনসাধারণকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্দীপিত করেছিল।[১৩০]

এইভাবে দেখা যায় যে অবিভক্ত কাঁথি মহকুমায় ছয়টি থানার মধ্যে খেজুরি ও পটাশপুর থানায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খেজুরীতে ২৮ সেপ্টেম্বর খেজুরী সাধারণতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ছয়মাস চলেছিল এই সরকার। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হয় পটাশপুর থানা জাতীয় সরকার, তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার এবং কাঁথি মহকুমার জাতীয় সরকার অর্থাৎ স্বরাজ পঞ্চায়েত। এইভাবে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল ধাড়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সুযোগ্য নেতৃত্বে মেদিনীপুরের তমলুকে প্রতিষ্ঠিত হল তমলুক জাতীয় সরকার। তমলুক জাতীয় সরকারের সতীশ চন্দ্র সামন্ত ২৬ মে ১৯৪৩ কলকাতায় গ্রেপ্তার হলে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন।[১৩১] পটাশপুরের জাতীয় সরকার গঠনের পর পুলিশ নির্মম পীড়ন ও অত্যাচার চালায়। সেখানে প্রায় একশোর বেশী বাড়িতে পুলিশ আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে অবাধ লুণ্ঠন, গৃহদাহ, অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যাচার ও নারীদের প্রতি পাশবিক হয়ে ওঠে। এইভাবে দেশের মানুষ যখন অত্যাচারিত, জর্জরিত তখন প্রকৃতির ভয়ানক খাঁড়া নেমে আসে। ১৬ অক্টোবর ১৯৪২ উপকূল তীরবর্তী কাঁথি আর তমলুকে আছড়ে পড়ল মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় আর প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এলাকাটি প্লাবিত হয়ে গেল। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় রামনগর থানা অঞ্চল। অসংখ্য স্মানুষ, অগণিত গৃহপালিত পশু তলিয়ে যায়। জীবনযন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে গেল। সরকারি হিসেব মতো তমলুক মহকুমায় ৩৮৩৭ জনের মৃত্যু হয় এবং ১০৭২ জন আহত হন। এক লক্ষ দশ হাজার তিনশো ছেচল্লিশটি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং ছিয়াত্তর হাজারেরও বেশী বাড়ি বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। এলাকার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অনাহারে মৃত্যুর পেছনে

ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মনে করেন। এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ 'পোভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস এন এস্যে অন এনলাইটমেন্ট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন'-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৩২] তমলুকের এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা সম্পর্কে ৫ জুলাই ১৯৪৩র বিপ্লবীতে 'দুর্ভিক্ষের ভীষণতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয় শতকরা নিরানব্বই ভাগ গৃহস্থের যা কিছু অন্ন সংস্থানের ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তারা শাক পাতা, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দিনপাত করছে। সেইসঙ্গে সংক্রামক রোগে মৃত্যু বেড়ে চলেছে। ফলে প্রত্যেকের টাকা-পয়সা, গয়না গাঁটি যা কিছু ছিল সবই নিঃশেষ হয়েছে।[১৩৩]

এতদসত্ত্বেও স্বাধীন জাতীয় সরকারের কাজ তারা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৪৩ সালে বিপ্লবী পত্রিকার ২৬তম সংখ্যায় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তাতে শিরোনাম ছাপা হয়- 'তমলুকে নবযুগ'। (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) 'স্বাধীন তাম্রলিপ্তে জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন'। নবগঠিত তমলুক জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন সতীশচন্দ্র সামন্ত। থানা জাতীয় সরকারগুলির অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে- মহিষাদলে নীলমণি হাজরা, সুতাহাটায় ডা. জনার্দন হাজরা, নন্দীগ্রামে কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস, এবং তমলুক থানায় গুণধর ভৌমিক। 'ভগিনী সেনাবাহিনী' (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) ও 'বিদ্যুৎ বাহিনীকে' (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) জাতীয় সেনাবাহিনী এবং 'বিপ্লবী'কে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র ঘোষণা করা হয়।[১৩৪] ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দুর্গতদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। তাইবলে এই সময়ে অত্যাচারের মাত্রা হ্রাস পায়নি। উপরন্তু কংগ্রেস কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হতে থাকে। তবে খেজুরী থানার দুর্গতদের পাশে এগিয়ে

এসে রিলিফের ভার নিয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড় মঠের অন্যতম সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মহারাজ। খেজুরীতে মিশনের পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে রিলিফ বিতরণের কাজ হয়েছিল।[১৩৫] তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রতিটি দপ্তর, বিভাগ সুন্দরভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল। জাতীয় বিচারালয়ে বিভিন্ন অভিযোগ জানানো যেত। তবে লঘু অপরাধের জন্য অপরাধীকে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হত। আর কাঁথির স্বরাজ পঞ্চায়েত নামের সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধরপাকড় ও পুলিশী নির্যাতন সত্ত্বেও তা ১৯৪৫এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এইভাবে জাতীয় সরকার মেদিনীপুরে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের কালজয়ী ইতিহাসকে অমর করে তোলার মূল দায়িত্ব পরবর্তীতে নিয়েছিলেন এই সুশীল ধাড়া। তিনিই গড়ে তুলেছিলেন তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস কমিটি, তিনিই গড়ে তুলেছেন স্মৃতিসৌধ। আবার তাঁরই লেখা আত্মজীবনী ‘প্রবাহ’এর তিনটি খণ্ড মেদিনীপুর তথা সারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ইতিহাসে এক আকর গ্রন্থ।[১৩৬]

১৯৪৪-এর আগস্ট মাসে গান্ধিজির কারামুক্তির পর তিনি অনুগামীদের কাছে বিদ্রোহ অবসানের আহ্বান জানালেন। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার তাদের আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। এরপরই জাতীয় সরকারের চতুর্থ সর্বাধিনায়ক বরদাকান্ত কুইতি ৮ আগস্ট জাতীয় সরকারের কার্যকলাপ বন্ধের আদেশ দেন। তাঁর পক্ষ থেকে মেদিনীপুরবাসীর কাছে প্রচার করা হয় যে ‘মহাত্মা গান্ধীই আমাদের একমাত্র নেতা, তাঁর নির্দেশের বাইরে চলার কোনো কথাই আসতে পারে না এবং তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করাই প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ও কর্মীর একমাত্র কর্তব্য। তাই তাম্রলিপ্তি জাতীয় সরকার আগামী ১৯৪৪-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে আর কার্যকরী থাকবে না। জাতীয় সরকার ভেঙ্গে

দেওয়া হয়। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রচার সপ্তাহ পালিত হয়। দেশবাসী ভাই ও ভগিনীদের কাছে মহকুমা কংগ্রেসের তরফে জনগণের কাছে বিনীত প্রার্থনা করে বলা হয় যে তাদের পরমপ্রিয় জাতীয় সরকারের এই আকস্মিক বিলোপে ব্যথা হবে জানি কিন্তু সকলের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা ঋষি মহাত্মার আদেশ স্মরণ করে সকলে ধৈর্য ধারণ করবেন এ বিশ্বাস রাখি। আপনাদের জাতীয় সরকার তার সাধ্যমতো আপনাদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। .... শীঘ্রই আমাদের সকলকে শত্রুর কারাগারে যেতে হবে, কিন্তু সেই বন্দী জীবনেও আমরা আপনাদের সেবকরূপে থাকব। ....'[১৩৭]

তমলুকের গরম দলের হিংসাত্মক কাজকর্মের খবর নিতে গান্ধিজি ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তমলুকে হাজির হন। তিনি পাঁচদিন মেদিনীপুরে অবস্থান করেন। গরম দলের অধিনায়ক তাঁর আত্মজীবনী 'প্রবাহ'তে বলেছেন খুব সতর্কতা সত্ত্বেও শতকরা তিন চারটি ক্ষেত্রে তাদের বিচারে ভুল হয়েছিল যা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য তিনি লজ্জিত এবং ঐ অংশটুকুর জন্য অনুতপ্ত।[১৩৮] তবে মেদিনীপুরের এই আন্দোলনে ব্যাপক হারে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে যা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তার পরের ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা।

আমরা দেখতে পেলাম ১৯২০-র দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকে সংগঠিত হওয়া সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা তথা সেখানকার আন্দোলনে নিযুক্ত কৈবর্তদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অধ্যায়ে বিংশ শতকে মেদিনীপুর তথা বাংলায় সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে কৈবর্তদের অবদানকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিশেষত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির

মানুষজনের নেতৃত্বদান ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের যে তাৎপর্য তা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাই মেদিনীপুর তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কৈবর্তদের সংগঠিত আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও উচ্চবর্গীয় রাজনীতির নানা জটিলতার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তাদের এই অগ্রগতি সেইভাবে বজায় থাকেনি। তবে এর জন্যে অবশ্যই দায়ী ছিল কৈবর্ত নেতাদের মধ্যেকার বিভেদ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ উচ্চনীচ অনুক্রমের কারণে সামগ্রিকভাবে কৈবর্ত জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলস্বরূপ জাতির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সকলের সমহারে উন্নতি ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া বাংলার রাজনীতিতে কেন্দ্রিকতা বনাম আঞ্চলিকতার টানাপোড়েনে নগরকেন্দ্রিক আবর্তেরই জয়লাভ ঘটেছে। এর ফলে একদিকে যেমন আঞ্চলিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবার তেমনই কৈবর্তদের সামগ্রিক উন্নয়নের গতিতেও ভাটা পড়েছে। স্বাধীনতার পরে কৈবর্ত জাতির ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে বিংশ শতকের শুরু থেকে মেদিনীপুরে ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত আন্দোলনেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র কৈবর্ত জাতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল যার প্রমাণ ব্রিটিশ সরকারের নথিতেও পাওয়া যায়।[১৩৯] কৈবর্তরা ছিল সমগ্র বাংলা প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি এবং সারা ভারতের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই জাতির মানুষের বাস সবচেয়ে বেশী। সংগ্রামী জীবন যে জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুশীলকুমার ধাড়া, সতীশচন্দ্র সামন্ত (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য)

কুমারচন্দ্র জানা প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। যা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ করছে।

<u>সূত্রনির্দেশ:</u>

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী,* 'বাঙ্গালার ইতিহাস', কলকাতা: তুলি কলম, পৃ. ৩৩০

২. *বঙ্কিম রচনাবলী,* তদেব, পৃ. ৩৩০

৩. সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ইন্ট্রোডাকশন, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. xxv

৪. *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

৫. নরোত্তম হালদার, *গঙ্গারিডি: আলোচনা ও পর্যালোচনা,* কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৯৮৮, পৃ.৬২

৬. পূর্ণেন্দু ঘোষ, 'চব্বিশ পরগণার জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি', *পশ্চিমবঙ্গ,* দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সংখ্যা, কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, প.বঙ্গ সরকার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ,পৃ. ৭৮

৭. নরোত্তম হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

৮. নরোত্তম হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৬

৯. অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, *সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে রক্তক্ষয়ী কৈবর্ত বিদ্রোহ,* ভূমিকা, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ৭

১০. অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭

১১. অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৯

১২. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* কলকাতা:জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স,পৃ.৪৯

১৩. আর.এস.শর্মা, আর্লি মিডিয়াভাল ইন্ডিয়ান সোসাইটি: অ্যা স্টাডি ইন ফিউডালাইজেশন, কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০১, পৃ. ২২১

১৪. বিনয় চন্দ্র সেন, সাম হিস্টোরক্যাল অ্যাসপেক্টস্ অফ দ্য ইনস্ক্রিপশনস অফ বেঙ্গল, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২, পৃ. ৪২৪-৪২৫

১৫. সঞ্জয় পাসোয়ান ও পরমানসী জয়দেব (সম্পা.), *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দলিতস্ ইন ইন্ডিয়া, স্ট্রাগল ফর সেলফ লিবারেশন,* খন্ড ২, দিল্লি: কল্পজ পাবলিকেশন, ২০০২, পৃ. ৬১

১৬. অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬, পৃ. ১৮৮

১৭. অতুল সুর, তদেব, পৃ. ১১৬

১৮. অতুল সুর, তদেব, পৃ. ১৮৬

১৯. অতুল সুর, তদেব, পৃ. ১৮৯

২০. অতুল সুর, তদেব, পৃ. ১৮৮

২১. নরোত্তম হালদার, প্রাগুক্ত, ১৯৮৮, পৃ.৬০

২২. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *স্মরণিকা,* তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, গোপীনন্দন গোস্বামী, 'মহিষাদল থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়', পূর্ব মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৩, পৃ. ৩১

২৩. সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০*, সুমিত সরকার, 'দ্য স্বদেশী ইরা ইন বেঙ্গল', ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ২৮

২৪. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, কলকাতা: ভূতপূর্ব রাজধানী গ্রন্থাগার, ১৯৭৩ পৃ. ৬৬

২৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ.২৪

২৬. চিত্তরঞ্জন দাস, *মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস*, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৬৭, পৃ. ১৮

২৭. বসন্ত কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০,পৃ. ১০৬

২৮. চিত্তরঞ্জন দাস, *মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯. চিত্তরঞ্জন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

৩০. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতার গণসংগ্রাম*, খেজুরি থানা, আজানবাড়ী, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৭৫, পৃ. ১২৭

৩১. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০,পৃ. ১১৩

৩২. হৃষিকেশ গায়েন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা*, কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ.৪১

৩৩. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতার গণসংগ্রাম, খেজুরি থানা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৩৪. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০,পৃ. ২১৬

৩৫. বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, *স্রোতের তৃণ,* কলকাতা: গোপীনাথ ভারতী, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

৩৬. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৩৭. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০,পৃ. ৩০৪

৩৮. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩৯. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৩২

৪০. রজতকান্ত রায়, 'সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স : বেঙ্গল ১৯০৫-২৭' সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ২৮৯-৯০

৪১. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৬৭

৪২. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৩৬৮

৪৩. প্রমথনাথ পাল, *দেশপ্রাণ শাসমল,* কলকাতা: দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৩৮, সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ১১৭

৪৪. প্রমথনাথ পাল, *দেশপ্রাণ শাসমল,* তদেব, পৃ. ১৩৬

৪৫. রজতকান্ত রায়, 'সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স: বেঙ্গল ১৯০৫-২৭' সব্যসাচী ভট্টাচার্য (সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ২৯১

৪৬. মহাত্মা গান্ধী, *ইয়ং ইন্ডিয়া,* ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

৪৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৩ মার্চ, ১৯৩০

৪৮. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮৪,পৃ. ৫

৪৯. রাজর্ষি মহাপাত্র (সম্পা.), *স্মরণিকা,* তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, তদেব, পৃ. ৯৫; বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব, পৃ. ৯

৫০. মন্মথ দাস, *মেদিনীপুর চরিতাভিধান,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৯২

৫১. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৫২. *হৃষিকেশ গায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৮*

৫৩. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, তদেব, পৃ. ৬০

৫৪. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *স্মরণিকা,* তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, তদেব, পৃ. ১২৯

৫৫. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১০ এপ্রিল ১৯৩০

৫৬. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *ভারত ছাড় আন্দোলন ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* রণজিৎ বয়াল, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে অজেয় পুরুষ অজয় কুমার', তদেব, পৃ. ২৪ '

৫৭. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১১৬

৫৮. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ১২৯

৫৯. বিমল কুমার শীট, ‘দেশপ্রাণ শাসমল ও কাঁথি মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন আন্দোলন’, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান ৫*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯০, পৃ. ৪৩২

৬০. বিমল কুমার শীট, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার ‘পথের আলো’ বুলেটিন’, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান ১১*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৩২৩

৬১. আই বি রিপোর্ট, ফাইল নং এফ ৫৬৬/৩৬, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, কলকাতা।

৬২. বিমল কুমার শীট, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর কর্মীসংঘের ভূমিকা’, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান ১২*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৩৯২

৬৩. পারমিতা ভদ্র, ‘গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে বাংলার নারীসমাজ’, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), *ইতিহাস অনুসন্ধান ২৬,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৩৯২

৬৪. যোগেশ চন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী,* কলকাতা: ১৯৫৪, পৃ. ৩৩

৬৫. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮০,পৃ. ১৬১

৬৬. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* দ্বিতীয় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২৩৮

৬৭. বসন্ত কুমার দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* দ্বিতীয় খণ্ড, *তদেব,* পৃ. ২৩৯

৬৮. তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৬৯. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *ভারত ছাড় আন্দোলন ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* প্রণব বাহুবলীন্দ্র, ‘মাতঙ্গিনী মিথ: সত্যান্বেষণ’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৭০. প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯

৭১. হোম (পলিটিক্যাল) ১৮/১৯৪০-১, এ ব্রিফ সামারি অফ দ্য পলিটিক্যাল ইভেন্টস ইন বেঙ্গল ডিউরিং দ্য ইয়ার ১৯৩৯, গভ. অফ বেঙ্গল, ১৯৪০, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, পৃ. ৯

৭২. বদরউদ্দিন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক,* ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪, পৃ. ৫৩-৫৪

৭৩. হোম (পলিটিক্যাল) ২১/১৯৩৭-৮, এ ব্রিফ সামারি অফ দ্য পলিটিক্যাল ইভেন্টস ইন বেঙ্গল ডিউরিং দ্য ইয়ার ১৯৩৭, কলকাতা, ১৯৩৮, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, পৃ. ৮-৯

৭৪. রজতকান্ত রায়, 'সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স : বেঙ্গল ১৯০৫-২৭' সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ২৭৮

৭৫. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *ভারত ছাড় আন্দোলন ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* ড. হরিপদ মাইতি, 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেদিনীপুর', তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, কুলবেড়িয়া: পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১৭, পৃ. ৫৩

৭৬. সুশীল ধাড়া, *প্রবাহ,* প্রথম খণ্ড, জনকল্যাণ ট্রাস্ট, মহিষাদল, মেদিনীপুর: ১৩৮৯, পৃ. ১১১

৭৭. রাসবিহারী পাল ও হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* তৃতীয় খণ্ড, কাঁথি: মেদিনীপুর ইতিহাস সংগ্রাম সমিতি, ১৯৯২, পৃ. ১০০

৭৮. রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, *ফিরে দেখা,* প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, নিমতৌড়ী, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৬, পৃ. ১০১

৭৯. বঙ্গভূষণ ভক্ত, *নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম,* গোপালপুর, মহিষাদল: ১৯৮৯, পৃ. ১৩৯

৮০. *বিপ্লবী*, প্রথম সংখ্যা, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৮১. *বিপ্লবী*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৮২. রাসবিহারী পাল ও হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, তৃতীয় খণ্ড, কাঁথি: মেদিনীপুর ইতিহাস সংগ্রাম সমিতি, ১৯৯২, পৃ. ১০২

৮৩. শংকরদেব মাইতি, *ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুর*, কলকাতা: লাকী পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ৪৮; রাসবিহারী পাল ও হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০২-১০৩

৮৪. রাসবিহারী পাল ও হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০৪

৮৫. স্বাধীন ভারত প্রচারপত্র; শংকরদেব মাইতি, *ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুর*, তদেব, পৃ. ৫০

৮৬. রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, *ফিরে দেখা*, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব, নিমতৌড়ী, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৬, পৃ. ১২২

৮৭. রাসবিহারী পাল ও হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯

৮৮. হরিপদ মাইতি ও মন্মথ নাথ দাস, *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস: ভগবানপুর থানা*, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৮৮, পৃ. ১৭৩

৮৯. বসন্ত কুমার দাস, *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা*, টিকাশী, মেদিনীপুর: খেজুরী ইতিহাস সংরক্ষণ সমিতি, ১৯৭৫, পৃ. ৪৭-৪৮

৯০. *বিপ্লবী*, চতুর্থ সংখ্যা, ২ অক্টোবর, ১৯৪২

৯১. বসন্ত কুমার দাস, *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা*, তদেব, পৃ. ৪৯

৯২. হোম(পল.) ফাইল নং ১৫০/১৯৪৩ , কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির প্রকাশিত প্রচারপত্র, সংখ্যা ৩৩, ১৮ অক্টোবর ১৯৪২; ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, কলকাতা।

৯৩. প্রসন্ন কুমার ত্রিপাঠী, শ্যামাচরণ বেরা ও রাধানাথ দাস অধিকারী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে পটাশপুর,* প্রতাপদীঘি, মেদিনীপুর:*পটাশপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস রচনা সমিতি,* ১৯৮৮,পৃ.৮৮

৯৪. প্রসন্ন কুমার ত্রিপাঠী, শ্যামাচরণ বেরা এবং রাধানাথ দাস অধিকারী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে পটাশপুর,* তদেব, পৃ. ৮৯

৯৫. লাডলিমোহন রায়চৌধুরি(সম্পা.), *দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেণ্ট- ১৯৪২,* ভল্যুম ১, কলকাতা: গভর্ণমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৩, পৃ. ৪৪-৪৫

৯৬. শংকরদেব মাইতি, *ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুর,* কলকাতা: লাকী পাবলিশার্স, ২০১৬, পৃ. ৭৮

৯৭. *বিপ্লবী,* সংখ্যা ৩, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

৯৮. *বিপ্লবী,* সংখ্যা ৪, ২ অক্টোবর, ১৯৪২

৯৯. *বিপ্লবী,* সংখ্যা ৫, ৬ অক্টোবর, ১৯৪২

১০০. রাধাকৃষ্ণ বাড়ী, *তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ২০০৪, পৃ. ১৬১-১৬২

১০১. বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষের বিবরণী ‘আগস্ট ১৯৪২ – মার্চ ১৯৪৩, পৃ. ১৮

১০২. গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.), *ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বিপ্লবীদের মুখোমুখি*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০২, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও শুভাশিস বিশ্বাস গৃহীত গোপীনন্দন গোস্বামীর *সাক্ষাৎকার*, ১৯৯৬ এর একাধিক দিনে।

১০৩. বাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষের বিবরণী 'আগস্ট ১৯৪২ – মার্চ ১৯৪৩, পৃ. ১৭

১০৪. বসন্ত কুমার দাস, *এ শর্ট হিস্ট্রি অফ দ্য আগস্ট মুভমেন্ট ইন দ্য কন্টাই সাবডিভিশন, ডিস্ট্রিক্ট মেদিনীপুর*, কন্টাই: ১৯৬৩, পৃ.৬৬

১০৫. গোপীনন্দন গোস্বামী, *বাংলার হলদিঘাট তমলুক*, তমলুক: রাজারাম প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃ. ৩৬-৩৮

১০৬. ডি.আই.জি (আই.বি), ইনস্পেক্টর জেনারেলের কাছে ১৯৪২-এ ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক রিপোর্ট এবং মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এন.এম.খান বাংলার অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিবকে ১৯৪২ ৩০ সেপ্টেম্বর পাঠানো রিপোর্ট।

১০৭. বিপ্লবী, শহীদ সংখ্যা, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২

১০৮. আগস্ট ১৯৪২ থেকে মার্চ ১৯৪৩ পর্যন্ত জেলার সরকারি অফিসারদের গোপন রিপোর্টসমূহ, পৃ. ২৬

১০৯. গভর্ণরের সচিবালয়ে প্রেরিত গোপন রিপোর্ট, ২ অক্টোবর ১৯৪২

১১০. বাংলা সরকারের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪২, গভর্ণরের সচিবালয়ে সংরক্ষিত।

১১১. বাংলার গভর্ণর জে.এ.এইচ হার্বার্টের গোপন মন্তব্য, ১ অক্টোবর, ১৯৪২

১১২. মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, পুলিশ সুপার টেলরের গোপন চিঠি, ৩০ অক্টোবর ১৯৪২; গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.) *ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বিপ্লবীদের মুখোমুখি,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ. ৯-১০

১১৩. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের গোপন চিঠি, ৩০ অক্টোবর ১৯৪২; গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.) *ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বিপ্লবীদের মুখোমুখি,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ.১০

১১৪. বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারি ব্লেয়ারের কাছে এন.এম.বসুর রিপোর্ট, ২ অক্টোবর ১৯৪২

১১৫. বাংলা সরকারের ইনস্পেক্টর জেনারেলের রিপোর্ট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩

১১৬. বাংলা সরকারের পাক্ষিক রাজনৈতিক রিপোর্ট, এপ্রিল ১৯৪৩

১১৭. গোপীনন্দন গোস্বামী, বাংলার হলদিঘাট, তমলুক, পৃ. ৫৩

১১৮. বসন্তকুমার দাস, *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম: খেজুরি থানা,* মেদিনীপুর, ১৯৭৫, পৃ. ৭৮; বাংলা সরকারের পাক্ষিক রিপোর্ট, ১ মার্চ, ১৯৪৪

১১৯. *বিপ্লবী,* ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩

১২০. সোমনাথ লাহিড়ী, 'গান্ধিজির অনশনের পর দেশভক্তদের কর্তব্য, 'জনযুদ্ধ' ২ মার্চ, ১৯৪৩

১২১. বঙ্গীয় সরকারের পাক্ষিক রাজনৈতিক রিপোর্ট, ২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

১২২. স্বাধীন ভারত, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৩; গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.) *ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বিপ্লবীদের মুখোমুখি,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ.২২

১২৩. ওয়াভেলকে লেখা কে.সি.র চিঠি, ১৪ আগস্ট ১৯৪৪, ভারতীয় মহাফেজখানা, এফ. এন. ৩, দিল্লি, ৩ মে ১৯৫১

১২৪. *বিপ্লবী,* ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৩

১২৫. *বিপ্লবী,* ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৩

১২৬. *বিপ্লবী,* ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৩

১২৭. 'হরিজন', ২৯ মার্চ, ১৯৪২; গৌতম চট্টোপাধ্যায়(সম্পা.) *ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বিপ্লবীদের মুখোমুখি,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২, পৃ.১

১২৮. পি.এন.চোপড়া(সম্পা.), *কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট: ব্রিটিশ সিক্রেট রিপোর্ট,* ফরিদাবাদ: থমসন প্রেস, ১৯৭৬, পৃ. ৯১-১১২

১২৯. *বিপ্লবী,* ৫ জুলাই ১৯৪৩

১৩০. সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অন্যান্যরা, *আগস্ট রেভোলিউশন অ্যান্ড টু ইয়ারস' ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট ইন মেদিনীপুর,* কলকাতা: ১৯৪৬, পৃ. ১০

১৩১. রাজর্ষি মহাপাত্র (সম্পা.), *অনন্য দেশসেবক অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়,* মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৬, পৃ. ৪১

১৩২. অমর্ত্য সেন, *অন পোভার্টি অ্যান্ড ফেমিনস এন এস্যে অন এনলাইটেনমেণ্ট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন,* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ১৯৮২, পৃ. ২০৭

১৩৩. *বিপ্লবী,* সংখ্যা ৫১, ৫ জুলাই, ১৯৪৩

১৩৪. *বিপ্লবী,* ছাব্বিশতম সংখ্যা, জাতীয় সরকার সংখ্যা, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৪৩

১৩৫. বসন্ত কুমার মাইতি, *যুগান্তরের জীর্ণ স্মৃতি,* পূর্ব মেদিনীপুর: খেজুরী ইতিহাস সংরক্ষণ পর্ষদ, ২০০৫, পৃ. ১৭০

১৩৬. রাজর্ষি মহাপাত্র(সম্পা.), *স্মরণিকা,* তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, হরিপদ মাইতি, ‘‘বিপ্লবী’র সম্পাদক অজয় কুমার’’, পূর্ব মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৩, পৃ. ১০১

১৩৭. *বিপ্লবী,* ৮৩ সংখ্যা, ২৭ আগস্ট ১৯৪৪

১৩৮. সুশীল ধাড়া, *প্রবাহ,* প্রথম খণ্ড, মহিষাদল: জনকল্যাণ ট্রাস্ট, ১৪০৯ সাল, পৃ. ১৪৪-১৪৫

১৩৯. হোম(পলিটিক্যাল) ফাইল নং ২৭৭/১৯৩৪, এস-৯-২১, পৃ. ২১, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভস, কলকাতা।

চতুর্থ অধ্যায়

কৈবর্তদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

ভারতীয় জাতিতত্ত্বের জাতি অর্থে বোঝায় মানবজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন এমন ভারতীয় মানব গোষ্ঠী সকলকে, যারা দেশগত, ভাষাগত, আচরণগত, কৃষ্টিগত এমনসব গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যারা নিজেদের স্বাতন্ত্রতা স্থায়ীভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। আবার কিছু কিছু মৌলিক জাতিও আছে যারা নিজেদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আজও টিকে থাকতে পেরেছে। এই ভারতবর্ষ নানা জাতের মানুষের বাসভূমি। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে দেখেছেন সমগ্র মানবজাতি কয়েকটি মৌলিক মানবজাতির সমবায়। প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে – 'মনুষ্যগণ স্বভাবত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। .....প্রাথমিক অবস্থায় সকল মানবই এক জাতীয় ছিল। ..... পৃথিবীর জাতীয় মানবের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলে, একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীনে উৎপন্ন ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল'।[১] আবার অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর গৌড় রাজমালা গ্রন্থে বলেছেন – 'বাঙালীর ইতিহাসের প্রধান প্রধান কথা – বাঙালী জনসাধারণের কথা। শুধু রাজা ও রাজপুরুষদের বৃত্তান্ত নয়, শুধু মুষ্টিমেয় বিত্তবানের কাহিনী নয়, অকীর্তিতাম্ আচন্ডালান প্রভৃতি সকলকে নিয়ে বাঙালীর যে সমাজ তার ইতিহাস আমাদের চাই, বিভিন্ন জনবিন্যাসের উত্থান-পতনের বিবরণ এবং তার প্রকৃত কার্যকারণ নির্ণয়ের উপাদান আমাদের চাই, নতুবা ইতিহাস আলস্য মোচনের প্রক্রিয়া ও অবসর বিনোদনের উপকরণ মাত্র হয়ে থাকবে।'[২]

ভারতের আদি সংস্কৃত সাহিত্যে জাতি(caste) এর পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঋকবেদের দশম মণ্ডলে পুরুষ সুক্তের বর্ণনায় পাওয়া যায় – প্রকৃতি পুরুষের বিরাট দেহ থেকে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতি পুরুষের মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, যারা অধ্যাপনা, জ্ঞানচর্চা ইত্যাদি কাজ করেন; বাহু থেকে ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি, যাদের কাজ সমাজের রক্ষাকারী হিসাবে এবং বৈশ্যের উৎপত্তি প্রকৃতি পুরুষের উরু থেকে, যাদের কাজ ব্যবসা বাণিজ্য, চাষ-বাস ইত্যাদি। আর সর্বশেষ শূদ্রদের উৎপত্তি বিরাট পুরুষের পদযুগল থেকে।[৩] তাদের কাজ সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের সেবা করা। ধর্মশাস্ত্রকার মনু ঋকবেদের এই ব্যাখ্যাকে কর্মানুসারে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। সেইরকম শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতেও গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সমাজের বর্ণের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। তবে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বিরাট পুরুষের পদযুগল হয়ে দেহের অর্থাৎ পুরো সমাজের ভার বহন করে চলেছে। যদিও পরবর্তীকালে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে জাতি বর্ণ ব্যবস্থা আর থাকল না। তা ক্রমে বংশ পরম্পরায় স্থায়ী হয়ে গেল। অর্থাৎ কামারের ছেলে জাতিতে কামার বা ছুতোরের ছেলে ছুতোরই থেকে যেতে বাধ্য হল। তবে বলা যায় সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত এই সমস্ত মানুষজনই হল সমাজের মূল চালিকাশক্তি।

ভারতে আর্য জাতির আগমনের সময় আনুমানিক ১৫০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ সময়ে। আর্যরা এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই পশ্চিম ভারতে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োতে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এদেশে আসা আর্যদের তুলনায় এখানকার সভ্যতা অনেক উন্নতমানের ছিল। তবে কৃষি ও নগরভিত্তিক সভ্যতা যে শুধুমাত্র পশ্চিমভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়েছিল। তারা ভারতের ভূমিপুত্রদের দস্যু-দাস বা অসুর আখ্যায় আখ্যায়িত করে।

ঋকবেদের সুক্ত রচয়িতারা পনি বা বণিকদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিল। তাদেরকে বহু সময় আর্যদের শত্রু, দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের পুরুষ সুক্তের দ্বাদশ ঋকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র – এই চার বর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে 'বিরাট পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু হতে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য, দুই উরু হতে বৈশ্য এবং দুই চরণ হতে শূদ্রের জন্ম।' কিন্তু তখনও এইসব বর্ণের কর্ম নির্দিষ্ট হয়নি। এ সম্পর্কে বলা যায় বৈদিক যুগে এদের অভিশপ্ত বিভাগ ও কর্মপদ্ধতির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে পণ্ডিত উইন্টারনিজ বলেন- '..... there is no proof yet for that division into castes which gives a peculiar shape to the whole social life of the Indian of later times and which to the present day has remained the course of the Indians.'[৪]

তবে ঋকবেদের অপর একটি সূক্ত থেকে জানা যায় যে সে সময় সামাজিকভাবে মাত্র দুটি ভাগ ছিল – আর্য বর্ণ ও দাস বা দস্যু বর্ণ। ঋকবেদে পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরণ বা জন্ম দিয়ে সামাজিক অবস্থান নির্ণয় – এগুলি ছিল না। একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত হতে পারত। ঋকবেদে জনগোষ্ঠী বা কৌম 'বিশ' বা 'জন' নামে পরিচিত ছিল। বাংলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি থেকে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষিজমি ও তাঁর বিভিন্ন বিবরণ জানা যায়। ঋকবেদে উল্লিখিত 'দশরাজার যুদ্ধ', 'পুরন্দর' প্রভৃতি শব্দগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিবাদ বিসংবাদের মধ্যে সহাবস্থানের মাধ্যমে সভ্যতা এগিয়ে চলতে থাকে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন কিছুটা হলেও ঘটতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ভারতীয় জাতি এক মিশ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে। তাই বলা যায় কোন মৌলিক জাতির পক্ষেই

স্বতন্ত্র্যতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ভারতবাসী মিশ্র রক্তের মানুষ এবং ভারতীয় জাতি একটি মিশ্রিত জাতি। তবে একথাও ঠিক যে সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের অধিবাসীদের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই দেখা যায় একটি প্রচলিত কথা – 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ পৃথিবীর সকলেই প্রত্যেকের আত্মীয়।

বহু আগে থেকেই বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে বিষয়ে সকলের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। জঙ্গলময় স্থলপথে যোগাযোগের উপায় ছিল দুটি পা, আর জলার দেশ বাংলাদেশে ডোঙা ডিঙি-ভেলার সাহায্যে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্য করা হত। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ সিলভাঁ লেভির(Sylvain Levi) মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে – "পুরাণ, ধর্ম, দার্শনিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে ভারত প্রাগৈতিহাসিক অতীতের কাছে কতটা ঋণী, তার অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন। ইন্দো-ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই শুধু ভারতকে দেখা হয়েছে, বিচার করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে ভারত ছিল বিরাট উপকূল বাণিজ্যের তথা সামুদ্রিক বাণিজ্যের দেশ; ঐতিহাসিককালে দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনে নতুন করে সমুদ্রপথের সন্ধানের দরকার হয়নি। আরও পরবর্তীকালের অভিযাত্রী বা সাধারণ যাত্রীরা এবং ধর্ম প্রচারকেরা স্মরণাতীতকাল থেকে চালু এই সামুদ্রিক পথেই আসা যাওয়া করেছেন – শুধু নৌযান বা নৌবিদ্যা সংক্রান্ত উন্নত কলাকৌশলের দক্ষতা দেখিয়ে এই প্রাচীন পথ প্রদর্শকদেরই আর্য তথা আর্যভারত বর্বর বলে ঘৃণা করেছে।"[৫]

বাংলায় সুলতানী শাসনের সময়ে ভূমির অধিকার কেবল স্থানীয় মানুষের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ রইল না। শাসক সম্প্রদায়ের অনুগ্রহভাজন লোকজনেরা জমির মালিক ও সামন্ত প্রভুরা এই সমস্ত মানুষদের নানা রকমের চাহিদা মেটানোর জন্য চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে হত। কর্মচারীরা

ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য নির্ধারিত রাজস্বের বাইরেও বিভিন্নভাবে কৃষক ও অন্যান্যদের শোষণ করত। পর্যটক মানরিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, খাজনার টাকা দিতে না পারলে হিন্দুদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিলামে বিক্রি করা হত। কর্মচারীরা চাষীদের নারী ধর্ষণ করত এবং পেয়াদারা নানারকম অত্যাচার করত। দেশের শতকরা নব্বই জনের প্রতি এই অত্যাচারের কোনও প্রতিকার ছিল না।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছদে দেশের শ্রীবৃদ্ধি কেমনভাবে হচ্ছে তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন এই শ্রীবৃদ্ধি মুষ্টিমেয় কিছু ধনী মানুষের, কৃষকেরা এই শ্রীবৃদ্ধির ভাগীদার নয়। জমিদার, মহাজন, বণিক, ভূস্বামীরা সকলেই এই শ্রীবৃদ্ধির অংশীদার। জমিতে বেশীরভাগ কৃষকেরই অধিকার স্থায়ী নয়। প্রজাবৃদ্ধি হলে সে জমি বেশী খাজনায় অপর কৃষক নিতে চায় যা ক্রমাগত জমিদারের লালসা বৃদ্ধি করে। যেমন- রামা কৈবর্তের জমিটুকু ভালো, তাই সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমি নিতে চায়। সে দেড় টাকা হারে খাজনা দিতে রাজী। সেকারণে রামাকে উচ্ছেদ করে হাসিমকে জমি দেয়। এইভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও তিনগুণ-চারগুণ বা কোথাও কোথাও দশগুণ পর্যন্ত খাজনা বেড়েছে।[৭] প্রজারা প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। যেমন রামা কৈবর্তও তাঁর অধিকার বিসর্জন দিয়েছিল, কেননা সে জানতো জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা কঠিন। এছাড়া পরবর্তী সময়ে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' প্রবন্ধে কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষের চালচিত্র ও অত্যাচারের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয়দের কীর্তির প্রাচীন ইতিহাস খুব একটা লিপিবদ্ধ নেই। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতির অনেক বীরত্বের কাহিনী আমরা শুনতে পাই কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ বা ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের কাছে অপ্রতুল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় – 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই....বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে?...তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।'[৮] তাই আমাদের সকলকেই বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে। এই জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় সরকারি সিলমোহর পড়ে ১৯৩২ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপাচার্য থাকাকালে।[৯] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন – 'ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই একজন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃ-পিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।'[১০] সেরকমই বাংলার একটি আদিম কৌম জাতি হল কৈবর্ত জাতি। এই কৈবর্তদের দীর্ঘ একটা বীরত্বের ইতিহাস আছে কিন্তু সে সম্পর্কে বিশেষ আকর গ্রন্থ বা বিস্তারিত তথ্যাবলি নেই। সাহিত্যিক অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে রক্তক্ষয়ী কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামক উপন্যাসে কৈবর্ত বিদ্রোহের বিস্তারিত কাহিনী রচনা করেছেন। তিনি তাঁর মুখবন্ধে বলেছেন – 'প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা কেউই কৈবর্ত বিদ্রোহকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। .....বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল এক শ্রেণী সংগ্রাম – পদদলিত এক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।[১১] তিনি লিখলেন, 'রামপাল যুদ্ধান্তে রাজধানী ডমর ধ্বংস করেছিলেন। শ্রেণীবিদ্বেষ আর

কত নৃশংস হবে।' হাজার হাজার কৈবর্ত পরিবার বরেন্দ্রভূমি ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল রাঢ়বঙ্গের হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরে।'[১২]

বাংলা ছিল কৌম সমাজের দেশ। এই সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেন। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – এই ভাগ বাংলার আদিবাসী কৌম সমাজে ছিল না। আর গোত্র-পদবীও ছিল না। সেখানে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদনকাজে অংশ নিতে যে যার খুশি বৃত্তি অবলম্বন করত। স্বভাবতই প্রতিটি কাজ ছিল সমান মর্যাদার। পরবর্তীকালে বাংলায় আর্যদের আগমনে বাংলার আদিম কৌম গোষ্ঠীরা তাদের সাথে পরাজিত হল এবং সামাজিক নিয়ম, রীতিনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আর্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করল। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সমাজ ব্যবস্থায়। আর্যরা চতুবর্ণকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ঘটিয়ে জাতপাত ব্যবস্থাকে সংস্কারে পরিণত করল বিশেষ শ্রেণী স্বার্থে। বৈদিক আর্য সমাজের রীতিনীতি ধীরে ধীরে বাংলার আদিম সমাজ ব্যবস্থাকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল। এককথায় তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। নদীয়ার সংস্কৃত পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন পৃথিবীর আর কোথাও এমন জাতিগত বিভাগ নেই একমাত্র বাংলাই তার একমাত্র উদাহরণ। **১৮৯৬** সালে প্রকাশিত 'দ্য হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড সেক্টস' গ্রন্থে তিনি বলেছেন- 'The institution of caste is a unique feature of Hindu society and as nothing exactly like it is to be found in any other part of the world'.[১৩]

বাংলার সমাজে বহুকাল থেকেই অস্পৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই অস্পৃশ্যতা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী কিছু মানুষকে নীচ, অস্পৃশ্য করে রাখার বিধানগুলো জবরদস্তভাবে কায়েম রেখেছে। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে সামাজিক প্রভুত্বের অধিকারী ব্রাহ্মণদের রীতিনীতিতে গঠিত জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে সামাজিক মেলামেশা আর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে আসছে। ব্রাহ্মণদের অনুসৃত আদর্শে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জাতগুলো তাদের চেয়ে নিম্ন সারির জাতগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব নির্ধারণ করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের মাপকাঠিতে চিহ্নিত হীন জাত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের পেশা, খাদ্য, পোশাক, ভাষা, আচার ব্যবহার যেহেতু বর্ণ হিন্দুদের চেয়ে পৃথক, তাই তারা আজও অস্পৃশ্য অশুচি।[১৪] বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্মল কুমার বোস তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' গ্রন্থে বলেছেন- বর্ণ ব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবন যাপন করে থাকে। সমাজকে তারা দেখে ও সমাজও তাদের দেখে। এক্ষেত্রে অধিকার ও দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[১৫] সমাজবিজ্ঞানী দেবী চ্যাটার্জী তাঁর 'ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমীকরণ' প্রবন্ধে দেখান বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাত্রাপথ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে; আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে গেছে। ঋগ্বেদের সময়কালে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সূচনা হলেও সম্ভবত তার নিয়মনীতির কঠোরতা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পায়। মনে করা হয়, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিদের মধ্যেকার সীমারেখাগুলি ছিল অনেকটাই নমনীয়, বংশগত পেশা-র ধারণা শিথিল।[১৬]

পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাত বর্ণ-ধর্মের মধ্যে জাতি-গোত্র-পদবী নিয়ে মানুষের গর্ব করা অথবা এর উল্টোদিকে অন্যকে হীনচোখে দেখার একটা সহজ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক মানসিকতায় পদবী এখন স্ট্যাটাস বা চিহ্ন (symbol)-এর মতো। বর্তমানে এটি যেন মানুষের সার্বিক পরিচয় বহন করে থাকে। আসলে এই প্রশ্নেই মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে। এমনকি একবিংশ শতকেও সংবাদপত্রের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে নিত্য নতুন বয়ানে জাতি-বর্ণ, গোত্র-গণ প্রভৃতির উল্লেখ করে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের প্রয়াস লক্ষ্য করে চলেছি। বাংলার উপজাতিসমূহ বাংলার আদিম অধিবাসীদের বংশধর। হিন্দু সমাজভুক্ত অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে তপশীলভুক্ত করা হয় ১৯৩৫ সাল থেকে। কালের প্রবাহে জাতিগুলির নামের রূপান্তর ঘটে। যেমন – অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অনুন্নত, ম্লেচ্ছ, হরিজন, প্রান্তিক, ডিপ্রেস্‌ড অথবা সম্প্রতি দলিত নামে।

পরবর্তী সময়ে মধ্যযুগে অর্থাৎ দ্বাদশ শতকে লিখিত অর্বাচীন বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেখা যায় বাংলার ব্রাহ্মণ ছাড়া সেখানে বাকী সকল বর্ণই সংকর। বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণরা বাকী সমাজকে মোট তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি উপবর্ণের স্থান ও বৃত্তি স্থির করে দেন। তিনটি পর্যায়ে মোট ৩৬টি উপবর্ণ বা জাতির কথা দেখতে পাওয়া যায়। যদিও পরে আরো পাঁচটি জাত যুক্ত হয়ে মোট ৪১ টি জাতির কথা পাওয়া যাচ্ছে।[১৭] এই একচল্লিশটি জাতের কথা নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব’ বইতেও উল্লেখ করেছেন।[১৮] (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) এগুলি ছাড়াও আরো কিছু আদিবাসী কোমের নাম পাওয়া যায়। যেমন- পুলিন্দ, পুককস্‌, খস, শবর, সুহ্ম ইত্যাদি।[১৯] এই বৃহদ্ধর্মপুরাণে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যদের নিয়ে তিনটি শ্রেণী গড়ে তোলা হল – ১) উত্তম সংকর, ২)

মধ্যম সংকর এবং ৩) অধম সংকর বা অন্ত্যজ। এখানে উত্তম সংকর শ্রেণীতে ২০টি, মধ্যম সংকর শ্রেণীতে ১২টি এবং অধম সংকর শ্রেণী বা অন্ত্যজ পর্যায়ে ৯টি জাতির উল্লেখ রয়েছে এবং এখানে কৈবর্তদের মধ্যম সংকর পর্যায়ে রাখা হয়েছে। আবার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সমস্ত সংকর উপবর্ণগুলিকে সৎশূদ্র, অসৎশূদ্র (উচ্চ ও নীচ) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে সৎশূদ্র পর্যায়ে জাতির সংখ্যা ১৯টি, অসৎশূদ্র পর্যায়ে ১৭টি জাতির কথা বলা আছে। (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) এখানে কৈবর্তদের অসৎশূদ্র পর্যায়ে রাখা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অসৎশূদ্রেরও নীচে অর্থাৎ অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য পর্যায়ে বেশকিছু নামের তালিকা দেওয়া আছে। সেগুলি হল- ব্যাধ, ভড়, কোল(আদিবাসী কোম), কোঞ্চ, হড্ডি(হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত(বাগদী?), ব্যালগ্রাহী (মলেগ্রাহী?), চণ্ডাল ইত্যাদি। আবার ভবদেব ভট্ট তাঁর 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' গ্রন্থে অন্ত্যজবর্ণের একটি তালিকা দিয়েছেন, যেখানে রজক, নট, বরুড়, কৈবর্ত, কাপালিক, ভিল্ল, চণ্ডাল, শৌন্ডিক ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এখানে ভবদেব ভট্টের মতে কৈবর্তরা অন্ত্যজ পর্যায়ের।[২০] বৃহদ্ধর্মপুরাণে ধীবর ও মৎস্য ব্যবসায়ী অন্য একটি জাতের অর্থাৎ জালিকদের স্থান নির্দেশ করছেন মধ্যম সংকর পর্যায়ে। আবার ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ধীবর ও কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করছেন অসৎ শূদ্র পর্যায়ে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে চাষী কৈবর্ত বা মাহিষ্য নামের কোনো উল্লেখ সেসময়কার কোনো স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়নি।[২১] এছাড়াও মালব, কুলিক, কর্ণাট, লাট প্রভৃতি বিদেশী ও ভিন্ন প্রদেশী বহু অন্ত্যজ শ্রেণীর লোক পালরাষ্ট্রের সৈন্যদলে বেতনভূক সৈন্য হিসেবে যোগদান করেছিল। এই সময় ব্রাহ্মণরা নিজেদের সুবিধার্থে সমাজের মধ্যে আবার সৃষ্টি করল নবশাখ জাতি অর্থাৎ সমাজের যে নয়টি জাতির কাছ থেকে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করতে পারবে। এদের অনেকেই ছিল সমাজের মূল উৎপাদনশীল গোষ্ঠী।[২২]

তবে বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বেশকিছু বিচারালোচনা হয়েছে। এছাড়া দুইখানি বল্লালচরিত এবং বাংলার কুলজী গ্রন্থমালায় বর্ণবিন্যাসের বেশকিছু ছবি পাওয়া যায়। বল্লালচরিতের দ্বিতীয় খন্ডে কুলজী বিবরণ, বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তিকথা আছে। আর প্রথম খণ্ডে সুবর্ণবণিকদের সমাজে পতিত করা এবং কৈবর্ত প্রভৃতি বর্ণের লোকেদের সমাজে উন্নীত করার কথা বর্ণিত আছে।[২৩]

এবারে আমরা কৈবর্ত জাতির বিভিন্ন পদবী বা গোত্র নিয়ে আলোচনা করব। বাঙালি হিন্দুর জীবনে পদবীর বংশানুক্রমিক ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। তাছাড়া একই পদবী বিভিন্ন বর্ণের মানুষজন ব্যবহার করতে পারত ১৮৭৫ সালের একটি আইনের দ্বারা। এমন পরিবারও দেখা গেছে তিনটি পদবী, তিনটি জাতির পরিচয় বহন করে থাকে। যেমন, সেন – কায়স্থ, সেনগুপ্ত – বৈদ্য, সেনশর্মা – ব্রাহ্মণ । আবার আমরা দেখি 'দাস' ও 'দাশ' ব্যবহারের ক্ষেত্রে, অনেক সময় 'শ' এর স্থলে 'স'-এর ব্যবহারে অনেকে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু আভিধানিক অর্থে 'দাস' মানে ভৃত্য এবং 'দাশ' মানে ধীবর। তবে কি ভৃত্য না ধীবর থেকে উৎপত্তি। না তা কিন্তু মোটেই নয়। অর্থাৎ পদবী কোন নির্দিষ্ট জাত বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়। পদবির কোন জাত নেই। পদবী সার্বজনীন। যে কেউ যেকোন বর্ণের পদবী গ্রহণ করতে পারেন। কোন পদবীই অন্ত্যজ নয়। মানুষের গুণই পদবীকে গৌরবান্বিত করে। বিবর্তনের ধারায়, যুগের প্রভাবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতি-বর্ণ, গোত্র-পদবীর সৃষ্টি। এককথায় স্বার্থান্বেষী মানুষের দ্বারাই এইসমস্ত ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে কোন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তবে বর্তমানে আবার সুশীল সমাজ সচেষ্ট হলে সমাজের এই অন্ধকারাছন্ন, কলুষিত, ঘৃণ্য

ভেদাভেদের দিকটি পরিত্যাগ করে পদবীহীন, জাতপাতহীন একটি সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে সক্ষম হবে।

এখন বঙ্গদেশে কৈবর্ত জাতির মধ্যে যে সমস্ত পদবীর ব্যবহার চোখে পড়ে সেগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব। বাংলায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদাভেদ বাঙ্গালির দুর্দশাকেই বাড়িয়ে তুলেছে। আসলে এর মূলে রয়েছে স্বার্থান্বেষী মহলের কূটকৌশল। প্রাচীনকালে তো বাংলা কৌম সমাজের দেশ ছিল। সেখানে বিভিন্ন বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর মধ্যে কোন উঁচু নীচু ভেদাভেদ ছিল না। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন পদবীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বাংলায় কৈবর্ত জাতির মধ্যেও নানান পদবীর ব্যবহার দেখা যায়। সেগুলি হল – অধিকারি, আড়ি, আদক, আগোয়ান, উকিল, ওঝা, করণ, করাতি, কড়ুই, কয়াল, কবিরাজ, কাঞ্জী, কালী, কাঁটাল, কান্ডার, কাপড়, কামিলা, কামলা, কারক, কলসা, কাসুন্দি, কাঁড়ার, কুণ্ডু, কুইতি, কুইল্যা, কোলে, কোটাল, খাঁ, খাঁন, খাঁড়া, খাটুয়া, খামারু, খামরাই, খুঁটিয়া, খেটো, গোল, গরাই/গড়াই, গাড়ু, গাইন, গায়েন, গাঁতাইত, গিরি, গুঁই, গুপ্ত, গুড়ে, গুড়্যা, গুড়িয়া, গুণীন, গুছাইত, গোঁসাই, ঘড়া, ঘরামী, ঘড়ুই/ঘোড়ই, ঘাটা, ঘটি, ঘোষ, ঘোষ, ঘড়াই, চরণ, চাপ, চৌধুরী, চোংদার, জানা, জালি, জোয়ারদার, টীকাদার, ডাকুয়া, ঢাকী, ঢাল, তরফদার, তারণ, তালুকদার, দলুই, দন্ডপাট/দন্ডপাঠ, দাশ, দাস, দালাল, দাশ-মজুমদার, দিন্দা/দিন্ডা, দে, দেশমুখ, দুয়ারী/দোয়ারী, ধাড়া, নস্কর, নাগ, নাথ, নাইয়া, নাটুয়া, নায়ক, নায়েক, নিয়োগী, পোল্ল্যে/পল্লে, পড়্যা, পণ্ডিত, পড়িয়া, পড়ুয়া, পট্টনায়ক/পট্টনায়েক, পাঞ্জা/পাঁজা, পাত্র, পাল, পাইক, পাকড়ে/পাগড়ে, পাখিরা, পাড়ুই, পুরকাইত, পুরকায়স্থ, পোড়ে, পোদ্দার, পোড়েল, প্রধান, প্রামাণিক, বকসী/বক্সী, বর, বর্মণ, বাউল, বাড়ৈ/বাড়ই, বাকচি/বাগচি, বাকড়া, বাগুলি, বাঙ্গাল,

বাছার/বাছাড়, বারিক, বারুই/বাড়ুই, বৈদ্য, বৈরাগী, বদ্দি, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, ভক্তা, ভঞ্জ, ভাট, ভাদুড়ী, ভূঁইয়া/ভুএঞা, ভৌমিক, মল্ল, মণ্ডল, মল্লিক, মাহাত, মহন্ত/মহান্ত, মহিষ, ময়রা, মহাপাত্র, মজুমদার, মাজি/মাজী, মাঝি, মান, মানা, মান্না, মাল, মালী, মাইতি, মাকড়/মাকুড়, মালিক, মাসান্ড, মিদ্দা, মিদ্দা, মিদ্যে, মুন্সী/মুন্সি, মূলা, মূড়া, মহুরী, মৃধা, মেটিয়া, মৈত্র, মৌলিক, রক্ষিত, রাজ, রানা, রায়, রাউত/রাউৎ, রাউল, রাহুত, রায়চৌধুরী, লস্কর, শিউলী, শাসমল, শিকদার/সিকদার, শী/সী, শীট/সীট, শেঠ, সরকার, সাউ, সানা/শানা, সাহা, সাহু, সাঁতরা, সাঁপুই, সামন্ত, সামুই, সাহানা, সেন, সেনা, সেনাপতি, সিং/শিং, সিংহ, হাতি/হাতী, হাইত/হাইৎ, হাটুই, হালদার, হাজরা ইত্যাদি।[২৪]

কৈবর্ত জাতির পদবীর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের গোত্র ও টোটেম কেমন ধরণের ছিল সেগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। বর্তমান দিনের ব্রাক্ষণ্য ধর্মে বা সভ্য সমাজে ব্যবহৃত গাছ ও তার পাতা হিসাবে তুলসী, বেল, আম, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর ইত্যাদি আর পশুপাখির মধ্যে মহিষ, সিংহ, ইঁদুর, ময়ূর, পেঁচা, হাঁস, সাপ, বা পাথর পূজা আদিম উপজাতিদের পূজা পদ্ধতিরই নিদর্শন।[২৫] বাংলার এইসমস্ত আদিম অধিবাসীদের জাতি প্রতীক বা টোটেম হিসাবে উপজাতিরা বিভিন্ন ধরণের গাছ, পাথর ও পশুপাখির পূজা করত। যেমন, শাণ্ডিল্য গোত্রের সাধারণত পদবী হল গিরি, পাল, পাত্র, ভুইএঞা, দাস, গায়েন ইত্যাদি। এদের টোটেম হল ষাঁড় এবং সাপ্তা, এরা এগুলির ব্যবহার করে না। তেমনি কাশ্যপ গোত্রের পদবী হল মাল, মাটি, মাটুয়া, ঢক, মণ্ডল, গিরি, গুছাইত, গুড়িয়া, মোড়াই, চাউলিয়া, প্রামাণিক, পড়িয়া, পাকড়াশী, মৈশান, দাসমহাপাত্র, দলপতি, রায়, হাতি, বঙ্গ, ডিঙ্গাল, সেন, সেনাপতি, সামন্ত, ইত্যাদি। এদের টোটেম হল এরা কচ্ছপ, এরা কচ্ছপ খায় না। শান্ডিল্য গোত্রের মধ্যে সানা, মণ্ডল, হাটুয়া, চৌধুরী, প্রধান, মাইতি, ধাড়া, সাঁতরা, শাসমল, লাল,

জানা, খাঁড়া, মিদ্যা, নাটুয়া, আদক, দিন্দা, সেনা, ইত্যাদি পদবী। এদের টোটেম শোল মাছ, সেই অনুযায়ী এরা শোল মাছ খায় না। আর মৌদগল্য গোত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদবী তা হল দাস, দে, বাউল, মণ্ডল, গাড়ু, মাইতি, মেইকাপ, রায়চৌধুরী, দাসমহাপাত্র, লুদাইত, সিংহ, ব্যবর্ত, ইত্যাদি। এদের টোটেম হল মৌচাক, সেই অনুযায়ী এরা মধু খায় না, মৌচাক ভাঙ্গে না। পরাশর গোত্রের মধ্যে দে, মণ্ডল, মাইতি পদবী দেখা যায়। এদের টোটেম হল পলাশ গাছ, তাই এরা পলাশ গাছ কাটে না, পলাশ ফুল ও পাতা ছেঁড়ে না। ব্যাসঋষি গোত্রের মধ্যে বাঙ্গাল, মাঝি, সামন্ত, বারিক, মণ্ডল, মাইতি, ধাড়া ইত্যাদি পদবী দেখা যায়। এদের টোটেম হল বিড়াল, তাই এরা বিড়াল মারে না। ভরদ্বাজ গোত্রের মধ্যে মাইতি, মান্না, দাস, সিংহ, সাহু, শী, গজেন্দ্র সিংহ ইত্যাদি পদবী দেখা যায়। এদের টোটেম হল ভেলকড়া মাছ, তাই এরা ভেলকড়া মাছ খায় না। নাগেশ্বর গোত্রের মধ্যে মাকুড়, পট্টনায়ক ইত্যাদি পদবী দেখতে পাওয়া যায়। এদের টোটেম হল নাগেশ্বর, সেই অনুযায়ী এরা নাগেশ্বর ফুল ছিঁড়ে না।[২৬]

অনেকে মনে করেন বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে বর্ণ বা গোত্রের অধীন মানুষজন সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সেই বর্ণ বা গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের দৃঢ় ধারনা বর্ণান্তর বা গোত্রান্তর এক অলঙ্ঘনীয় ব্যাপার। বিশেষ করে পদবী পরিবর্তন বা বদল করা গেলেও গোত্র পাল্টানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। অতি সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে দেখা যায় কোন ব্যক্তি তাঁর পদবী পরিবর্তন করতে পারেন কিন্তু জাতি বা বর্ণ পরিবর্তন করতে পারবেন না। আসলে কালক্রমে এই গোত্রই হয়ে দাঁড়ায় কূল বা বংশের প্রতীক। আরো পরে বৈদিক যুগে বা বৈদিকোত্তর যুগে গোত্রের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় এক রক্তজাত সন্তান-সন্ততি। আর এই বিশ্বাসই পরিণত হল সংস্কারে। আসলে গোত্র নিয়ে বৈদিক

যুগে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। গোত্র ছিল ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক, এক রক্তপ্রবাহের প্রতীক নয়। তবু বর্তমানে এক গোত্রজাত হলেই একে অপরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের কথা ভেবে থাকে। গোত্র কল্পনা কিন্তু উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পত্তিলাভের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। আবার এই গোত্র কল্পনা জাতিপ্রথা (caste system)-এর পূর্ববর্তী অবস্থা। বাংলায় কৌম সমাজ ব্যবস্থায় গোত্রের প্রথম প্রচলন হয় এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্ণ ও জাতির সৃষ্টি হয়। গোত্রের সৃষ্টি হয় নেতার অধীনস্থ গোষ্ঠীর মানুষজনকে একতাবদ্ধ রাখার এক সুষ্ঠু প্রয়াস। প্রাচীনকালে যেমন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে লড়াই বর্তমান ছিল। ঠিক তেমনই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যেও অবিরাম চলেছে মান-মর্যাদা, ছোটো-বড়ো, উচ্চ-নীচ এই অসম প্রতিযোগিতা। বিশেষ বিশেষ গোত্রের গৌরববোধে অন্য গোত্রের বিশিষ্ট মানুষদেরও নীচ না ছোট বলতে দ্বিধাহীন। অর্থাৎ গোত্র যেন সমাজে মান-মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে উঠেছে।

তবে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় একই পদবী বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুরাকালে একই পদবীর মানুষ বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকত সমাজের সকলের স্বার্থেই। এমনকি একই পিতার পাঁচ পুত্রের মধ্যে পাঁচজনই হয়তো পাঁচরকম পেশায় যুক্ত থাকতো। কেউ কৃষিকাজে, কেউ ব্যবসায়, কেউ কর্মকারের, কেউ স্বর্ণকারের আবার কেউ বা ব্রাহ্মণের কাজ করতো। আসলে কৌম সমাজ থেকে বিভিন্ন বৃত্তিতে কাজ করার ফলে তাদের সন্তান সন্ততিরাও বংশ পরম্পরায় একই বৃত্তিতে যুক্ত থেকে সামাজিক বিবর্তনে তারা কর্ম অনুসারে অথবা বৃত্তিগতভাবে এক একটি জাতিতে পরিণত হয়। এইসমস্ত নানা কারণে একই পদবী বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা যায়। তবে প্রাচীনকালে বৃত্তিগতভাবে বিভিন্ন জাতি গঠিত হলেও তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক, ভোজন বা যাতায়াতে কোন বাধা ছিল না। মুসলিম শাসনামলে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও বৃহদ্ধর্মপুরাণের মাধ্যমে জানা যায় বিভিন্ন

বৃত্তির জাতিগুলিকে উচ্চ-নীচ, উত্তম-মধ্যম-অধম/সংকর হিসাবে সাজানো হয়েছিল। অর্থাৎ শাস্ত্রকার পণ্ডিতদের নির্দেশে কারো ভাগ্যে সৎ শূদ্র বা কারো ভাগ্যে জুটলো অসৎ শূদ্র তকমা।[২৭] এককথায় বাঙালি জাতিকে শতধাবিভক্ত করার মূল ভূমিকায় থাকলেন এই শাস্ত্রকারগণ ও সমাজপতিগণ। আর এই উঁচু নীচু জাতের অর্থই হল ঘৃণা এবং বিদ্বেষ ছড়ানোর বাতাবরণ তৈরির সোপান রচনা করা। বঙ্গীয় সমাজে এইভাবে একে অপরের ঘৃণা ও বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল। বর্তমানে সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সময়ে কমবেশি এই বিদ্বেষের ঘটনা ঘটে চলেছে। এমন না যে একবিংশ শতকে বিজ্ঞানের প্রসার বা কল্যাণে বা শিক্ষার অগ্রগতির কারণে তা নির্মূল হয়েছে। বর্তমানে বাংলার শিক্ষিত সমাজেও এই ভেদাভেদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইসমস্ত ব্যবস্থা যেদিন মন থেকে সরে যাবে বা সমাজে দেখা যাবে না সেদিন হয়তো এই উচ্চ-নীচ বৈষম্য অনেকটাই কমে যাবে বলে আশা করা যায়।

বাংলার জনসমাজের ভিত্তি গঠনে এই আদিমজনেদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। আর এদের অধিকাংশই সমাজে আজ অবহেলিত, অনুন্নত ও অনগ্রসর। যেখানে এই সমস্ত জনগোষ্ঠীরাই সকলের জীবন রক্ষায়, প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদনের ভূমিকায় রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাংলার কৈবর্ত জাতির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে এই আদিম পশুপালক গোষ্ঠী থেকে বা মৎস্যজীবি গোষ্ঠীর হালিক বা চাষী গোষ্ঠী থেকে। বাংলা নদীমাতৃক দেশ। সারা বাংলা জুড়ে অসংখ্য নদনদী রয়েছে। বেশীরভাগ সভ্যতাই গড়ে উঠেছে নদীতীরে। আর এই মৎস্যজীবি কৈবর্তদের কল্যাণেই বাঙালীর ভাতের থালায় মাছের বিভিন্ন প্রকার ব্যঞ্জন আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। সকলে একথা শুনতে অভ্যস্ত যে মাছে-ভাতে বাঙালি। আবার হালিক কৈবর্তগণই ইক্ষুচাষ

ও গুড়ের উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা করেছে। তবে বর্তমানে বাংলার প্রতিটি জাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিভিন্ন উপভাগ বা থাক (Sub-caste) রয়েছে। একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন থাকের মানুষদের মধ্যে অবজ্ঞা বা অবহেলা বিদ্যমান। আসলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলি এই বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে বৃত্তিগতভাবে উদ্ভূত হীনমন্যতা বা উচ্চমন্যতা এই ভেদভাবকে চরমে পৌঁছে দিয়েছে।

সারা ভারতবর্ষ জুড়েই কৈবর্তরা ছড়িয়ে আছে। তবে তাদের মধ্যে হালিক বা চাষী কৈবর্তের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পূর্ব মেদিনীপুর সংলগ্ন ওড়িশার কৈবর্তরা নৌকর্মজীবী ও মৎস্যজীবী। বিহারের কৈবর্তরা বেশিরভাগই কৃষিজীবি।[২৮] এখানে বর্তমান বাংলাদেশের উল্লেখ করলাম না যদিও বাংলাদেশের অনেকগুলি জেলায় কৈবর্তদের যথেষ্ট সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ভারতের মধ্যে আসামের নওগাঁ, শিবসাগর, কামরূপ প্রভৃতি জেলায় বহু সংখ্যক কৈবর্তের বসবাস রয়েছে। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও বিলাসপুরের কৈবর্তরা কৃষিজীবি ও মৎস্যজীবী। আর যেহেতু নদীই বাংলার ইতিহাসের স্রষ্টা তাই এই নদীই বাঙালির চরিত্রকে গঠন করেছে। এই নদীকে কেন্দ্র করেই বহু মানুষ জীবীকা নির্বাহ করে থাকে। এককথায় নদীমাতৃক বাংলায় নদীই বাঙালির ভাগ্যবিধাতা। বাংলাকে শস্য শ্যামলা করেছে এই নদী। এমনকি প্রাচীনকাল থেকে এই নদীপথেই বাংলার বাণিজ্য সুখ্যাতি লাভ করেছিল। বিশেষত বাংলার কৈবর্ত জাতি নদী তীরবর্তী এলাকায় বসতি গড়ে তুলত। কেননা মাছ ধরা হল তাদের অন্যতম জীবিকা। সেকারণেই এই জাতির মানুষেরা নৌবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। ফলে বাঙালি শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত হয়েছিল এবং সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে বাণিজ্যে সফল হতে পেরেছিল।[২৯]

বাংলার কৈবর্তদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যের গুণগত পার্থক্য থাকলেও আকৃতিগত বিশেষ পার্থক্য নেই। **১৯৩৫** সালের আগে যারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ বলে গণ্য হত, তারাই **১৯৩৫** সালের ভারত শাসন আইনের বলে তফশীলভুক্ত জাতি বলে গণ্য হল। বাংলার সেইসমস্ত কয়েকটি জাতি, উপজাতি ও তফশীলভুক্ত জাতিসমূহের একটা নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ দেওয়া হল।[৩০]

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি	শিরাকার জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা	নাসিকাকার জ্ঞাপক সূচক সংখ্যা	দেহ দৈর্ঘ্য মি. মি.
১	**কৈবর্ত**	**৭৭.৫**	**৭৬.৬**	**১৬২৯**
২	পোদ	৭৭.৮	৭৬.৪	১৬২৫
৩	রাজবংশী	৭৫.৪	৭৬.৪	১৬০৭
৪	সদগোপ	৭৮.৬	৭৪.২	১৬৩৩
৫	ব্রাহ্মণ	৭৮.৮	৭০.৮	১৬৭৬
৬	কায়স্থ	৭৮.৪	৭০.৮	১৬৭৬

এখানে দেখা যাচ্ছে প্রায় সকলেই নাতি দীর্ঘ শিরস্ক বা মাঝারি আকারের মাথার লোক। কৈবর্তদের মোটামুটি সকলেরই ভালো, সুঠাম গঠন। এঁরা স্বভাবগত দিক দিয়ে বেশীরভাগ মানুষ সরল প্রকৃতির হয়ে থাকেন, অপরাধপ্রবণতা বিরল। বাঙালি জাতির মধ্যে এঁরা কর্মঠ, পরিশ্রমী, সাহসী এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকেন। তবে সহনশীলতা, স্বজাতিপ্রীতি ও ঐক্যবোধ কৈবর্তদের বিশেষ গুণ। এঁরা খুব চতুর নয় এবং লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকেন। কৈবর্তরা একাকী কাজ করার বদলে দলবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং যূথবদ্ধভাবে বসবাস করতে ভালোবাসেন। এদের বেশীরভাগ লোক ধর্মভীরু আর অদৃষ্টবাদী। কেননা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বচ্ছল না হলে অদৃষ্টবাদী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর একটা কথা এঁরা ভীষণ তেজী এবং জেদী স্বভাবের হয়ে থাকেন। তবে কৈবর্তদের

বেশীরভাগই অশিক্ষিত, নিরক্ষর। লেখাপড়া জানা দশ ভাগের মধ্যে দুইভাগ উচ্চশিক্ষিত। যদিও বর্তমানে এই হার অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সবশেষে একথা বলা যায় যে কৈবর্তরা মোটামুটি সত্যবাদী এবং অতথি পরায়ণ হয়ে থাকেন। বেশীরভাগেরই মাতৃভাষা বাংলা। তবে বিভিন্ন জেলা বা আঞ্চলিক টান বা প্রভাব কিছুটা লক্ষ্য করা যায়।[৩১]

কৈবর্তরা নদী তীরবর্তী এলাকায় বাস করার কারণে তাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে মাছ আর ভাত প্রথম সারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দরিদ্র কৈবর্তরা সিদল বা শুটকী মাছ খেতে খুব পছন্দ করেন। এঁরা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ বাহুলতা করে না। বেশীরভাগ পুরুষেরা তামাক সেবন করেন। মহিলারাও তামাক সেবন করে থাকেন। এখনও মেদিনীপুর সহ গ্রামেগঞ্জের মহিলাদের অনেককে তামাক সেবন করতে দেখা যায়। তবে দেশভাগ ও পরবর্তী সময়ে কৈবর্তরা জাতিগত মাছধরা বা হালচাষ ছেড়ে দিয়ে অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। এর সঙ্গে জাল বোনা বা দড়ি পাকানোর কাজও অনেকে করে থাকেন। বিভিন্ন ধরণের জাল তৈরি করা ও মাছ ধরার পদ্ধতি কৈবর্তদের রক্তে রপ্ত করা ছিল। মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার উপকূলবর্তী এলাকায় কৈবর্তরা সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং তাদের উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠে। আর যারা চাষাবাদ করত তাঁরা যে সকলেই নিজস্ব জমিতে চাষ করত তা নয়। অনেকে সমাজের জোতদার বা চুক্তির ভিত্তিতে অন্যের জমিতে চাষ করতেন। তবে অনেকের বাড়ীতে গবাদি পশুর চাষ দেখতে পাওয়া যায়। এই কৈবর্তদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তবান জমিদার হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের আলোচ্য মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের বাস সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তাই জেলার বেশীরভাগ গ্রামেই কৈবর্তদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো। এই জেলার

কৈবর্তজনেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

কৈবর্তদের জন্মকালীন রীতি নীতি বিংশ শতকে একটু অন্যরকমের ছিল। গ্রামে গঞ্জে প্রসবের সময় 'দাইমা' অর্থাৎ ধাত্রীদের বিশেষ কদর ছিল। তাঁরা অভিজ্ঞতায় বিশেষ পটু হয়ে উঠেছিলেন। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা নানাধরণের টোটকা ব্যবহার করতেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে আঁতুড় ঘরে থাকার রীতি রয়েছে। এই অশিক্ষিত দাইয়েরা বাঁশের ছিলা দিয়ে শিশুদের নাভির রজ্জু কাটার ব্যাপারে তাঁরা এতটাই দক্ষ ছিল যে আধুনিক কালের ডাক্তার বাবুরাও অবাক হয়ে যান।[৩২] যদিও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে ও প্রসার ঘটায় গ্রামে গঞ্জেও এই দাইমাদের প্রয়োজন অনেকটাই কমে গেছে। এই জাতির অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে একটা নিয়ম চালু আছে। আগে এই কৈবর্তদের মধ্যে শিশু জন্মালে প্রসূতিকে একমাস আঁতুড় ঘরে রাখা হত। আর মৃত্যু এবং পারলৌকিক ক্রিয়াতেও এক মাস অশৌচ পালনের রীতি ছিল। মৃতদেহকে দাহ করা আগুনে পোড়ানোর রীতি রয়েছে। বর্তমানে কৈবর্তদের মধ্যে মৃত্যুর অশৌচ সময় কমিয়ে পনেরো দিন করা হয়েছে। তারপরে শ্রাদ্ধাদির কাজ করা হয়। এই শ্রাদ্ধের কাজে জ্ঞাতি কুটুম্বকে আপ্যায়িত করে নিমন্ত্রণের মাধ্যমে ভোজন করানোর রীতিও রয়েছে। আর বিবাহের ক্ষেত্রে পিতামাতা বা পরিবারের দ্বারাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করার রেওয়াজ আছে। যদিও বর্তমান কালে এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে। কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পণপ্রথা বেশকিছু জায়গায় এখনও চালু আছে। এই বিবাহে কন্যার পিতা পাত্রকে কন্যাদান করে থাকেন এবং বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণের মাধ্যমে ভোজনের রীতি আছে। তবে কৈবর্তদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের মধ্যে

বিবাহ চলে না। এদের বিবাহে মঙ্গলাচরণ, অধিবাস, গায়ে হলুদ, জলাশয় থেকে জল আনা, শুভদৃষ্টি, বাসর, কন্যাবিদায়, পাশাখেলা, কালরাত্রি, বৌভাত, প্রীতিভোজ, ফুলশয্যা, দ্বিরাগমন ইত্যাদি নিয়ম চালু রয়েছে। কৈবর্তদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও তা মোটেই ব্যাপক হারে নয়।

বাংলা প্রদেশে যেমন কৈবর্তরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি। তেমনই বাংলার মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে বাংলা ছাড়াও বিহার, ওড়িশা ও আসামে কৈবর্তের সংখ্যা সারা ভারতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই কৈবর্তদের বিভিন্ন ভাগ অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ‘বঙ্গদেশে অনেক প্রকারের কৈবর্ত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের পিতা ক্ষত্রীয় ও মাতা বৈশ্য তাহারাই আদি বা ভালো কৈবর্ত, যাহাদের অন্যান্য পিতামাতা তাহারাই অন্ত্যজ, জেলে কৈবর্ত। জেলে কৈবর্ত বলিতে ঢ্যাঁড়াকুল্যা কৈবর্ত, মুন্ডি কৈবর্ত, রাঢ়ী কৈবর্ত, তীবর কৈবর্ত এবং কেবল জেলে বলিলে মালো, ঝালো, কেওট/কেবট বা ক্যাবট, বিন্দ, রাজবংশী, মুড়িয়ারী ইত্যাদিকে বোঝায়।’[৩৩] পেশাগত কারণে কৈবর্তরা সাধারণত জলবহুল এলাকা বা নদ-নদীর তীরে বসবাস করত। তবে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পুরাণে যে সমস্ত নদীর উল্লেখ রয়েছে এখন তার অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। সেকারণে কৈবর্তরা নিজেদের পেশা ও ব্যবসায় অসুবিধার জন্য অনেকে অন্যান্য জীবিকা অবলম্বন করেছে। শোনা যায় বল্লাল সেনের সময়ে রাজকৃপায় (চক্রান্তে) কৈবর্তগণ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দুটি শাখা হল- হালিয়া ও জালিয়া নামে। আসলে তারা মোটেই আলাদা দুটি জাতি নয়, একই জাতির দুটি শাখা মাত্র। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কৈবর্তদের তিন-চারটি জাতিগোষ্ঠীতে দেখতে পাওয়া যায়। চাষি কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত, মালা কৈবর্ত। স্বজাতি বিদ্বেষ এখানেও প্রবলভাবে

লক্ষ্য করা যায়। চাষি কৈবর্তরা জেলে কৈবর্তদের সঙ্গে বসে না, খায় না, এক পুরোহিতে পূজা করতে দেয় না। আর বিবাহের তো কথাই নেই।

মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তদের সংখ্যাধিক্য যেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনই তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক প্রাধান্যও যথেষ্ট ছিল। কৈবর্তেরা অবশ্য বহু প্রাচীন কাল থেকেই তাদের অস্তিত্বের চিহ্ন রেখে আসছেন। কৈবর্তরা মেদিনীপুরে দুইভাগে বিভক্ত ছিল- উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী। পরবর্তীতে আবার চারটি ধাপে বিভক্ত হয়। সেগুলি হল- লাল চাটাই, একসিধে, দোসিধে এবং মাকুন্দ। প্রথমোক্তগণ সামাজিকভাবে সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকতেন। তারা তাদের জমায়েত ও সভায় লাল মাদুর(Red mat) ব্যবহার করতেন। আর একসিধে কৈবর্তগণ বিবাহাদির দিন কনের বাড়িতে বরের বাবা অন্নগ্রহণ করতেন না, প্রতিবেশীর বাড়িতে খাবার খেতেন। দোসিধে কৈবর্তগণ বিবাহের দিন কনের বাড়িতে পাত্রের বাবা খাবার খেত না। পাশের কোন কৈবর্ত বাড়িতে মূল্য দিয়ে খাবার খেত। আর মাকুন্দগণ বিয়ের সময় পাত্রের বাবা কনের বাড়িতে নিজের খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।[৩৪]

বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথার সূচনা ঘটলেও গুপ্তযুগে হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের ফলে জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। আর বল্লাল সেনের সময়ে এই ভেদভাব চরম আকার ধারণ করে। বলা যায় এই সময় সমাজের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও ভেদাভেদ বৃদ্ধি পায়। সেসময় বিভিন্ন জাতিগুলির রাজ দাক্ষিণ্যে মর্যাদা নির্ধারিত হত। রাজ ক্ষমতার প্রভাবেই দ্বারাই শুদ্র জাতিগুলির মধ্যে জলচল বা জল-অচল আখ্যা দেওয়া হত। সমাজে জাতিভেদের পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা ও প্রান্তিক সমাজের মানুষের প্রতি অমর্যাদা বাড়তে থাকে। মুসলমান শাসনে বাংলায় যে জাতিভেদ প্রথার অবস্থান দাঁড়ায় তার একটি পাকাপাকি রূপ গড়ে ওঠে। তবে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার খ্রীষ্টান

মিশনারীদের প্রভাবে ধর্মান্তরকরণ অন্যদিকে মোড় নেয় যেটা মুসলমান আমলে নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষদের মধ্যে ইসলামীকরণ হত। অর্থাৎ এই ধর্মান্তরকরণ চলতেই থাকল। তবে মুসলমান শাসনামলে এই ধর্মান্তরকরণ চরমরূপ নিলে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এব্যাপারে রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। সমাজের এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁর বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে সমাজে কিছুটা হলেও স্থিতি ফিরে আসে। আসলে তাঁর ভক্তিবাদ জাতপাত ভেদাভেদের বিরোধী ছিল। এই মতে একজন চণ্ডালও ভক্ত হতে পারে ভক্তির জোরে। রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম' গ্রন্থে দেখান ভক্তি কেমনভাবে আধ্যাত্মিক ভিত্তি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অধিকার দান করতে পারে। যদিও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব রীতিনীতি আগের চেয়ে অনেকটা রক্ষণশীল হয়েছিল।[৩৫] তিনি আরো দেখিয়েছেন ভাগবতপুরাণ-এ উল্লিখিত কৃষ্ণভক্তগণ ছিলেন অচ্ছুৎ, দরিদ্র, অনাদৃত এবং প্রান্তিক। এখানে বৈষ্ণবধর্ম এইসব মানুষদেরই সামাজিক উর্দ্ধায়নের বা Sanskritization–এর দ্যোতনা বহন করে। চৈতন্য বাহ্মণদের কঠোর সংস্কার বিধি বর্জন করে নবদ্বীপের তেলি, মালি, গোয়ালা, বণিকদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিশেছিলেন ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। যদিও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ, রামানুজ প্রমুখরা জাতবিচার না মেনে ভক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ভক্তিতে জাতবিচার নেই –এই ছিল তাঁর প্রধান কথা।[৩৬] পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাত্ত্বিক আলোচনায় ভক্তিবাদের বিশেষ অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর 'সোশ্যাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজ

কাঠামোর ক্রমপরিবর্তনের সাথে সাথে পেশাগত পরিবর্তন ও তাঁর গতিশীলতার প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর মতে উচ্চবর্ণের মর্যাদা তাদের ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[৩৭]

বাংলার সীমানার ব্যাপক বিস্তারলাভ ঘটে সেন রাজবংশের আমলে। বল্লাল ঢিপির কথা প্রায় সকলেরই জানা। নদীয়ার নবদ্বীপ সেন আমলে বাংলার রাজধানী ছিল। আবার হেমন্ত সেন নদীয়ার সিংহাসন লাভ করে মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়িতে একটি নগর স্থাপন করেন। হেমন্ত সেনের রাজত্বকালে দক্ষিণ রাঢ়ে রাজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এমনকি তার সঙ্গে কলিঙ্গ রাজার মিত্রতা স্থাপিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বিজয় সেনের আমলে সারা বাংলা, বিহার, ওড়িশা তাদের রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর বল্লাল সেন ক্ষমতায় আসেন ও বাংলায় ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পান্ডুরাজার ঢিবির কথাও অনেকের জানা আছে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অজয় নদের দক্ষিণে এই ঢিবির ব্যাপক খনন কার্যের ফলে তিন হাজার বা তারও বেশী খ্রীষ্টপূর্ব কালের বাঙালি সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। কৃষিজীবি এই সভ্যতার মানুষের খাদ্যাভ্যাসে, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য মাটির ও ধাতুর তৈরি নানা প্রকার বস্তু, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র শস্ত্র, বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি, দেশের ভিতরে ও বাইরে নৌবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থাগম, পোড়ামাটির তৈরি নরনারীর মূর্তিসহ নানা শিল্পবস্তু প্রভৃতির নিদর্শনসমূহ আর্যপূর্ব বাঙালি সভ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয়বাহী।[৩৮]

মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের নিম্নশ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে পারা যায়। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী মনসার মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ সওদাগরের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু চাঁদ তা না করতে অনড় থাকলে মনসা জাতিতে কৈবর্ত দুই ভাই জালো এবং মালোর কাছ থেকে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। এই দুই ভাই খালে বিলে মাছ ধরে, নৌকা পারাপার

করে জীবিকা অর্জন করা। অর্থাৎ তারা সমাজের একেবারে অন্ত্যজবর্ণের দরিদ্র মানুষ বলে একেবারে নিকৃষ্ট ধরণের কাজও করত। তবে অতি সাধারণ হলেও সততা ছিল যথেষ্ট। তাই শেষ পর্যন্ত এদের পূজা পেয়ে দেবীর সন্তুষ্টি হলে তাদের অনেক ধন দৌলত পাওয়ার পরোক্ষ ব্যবস্থা করেন এবং তাদের দারিদ্র অনেকটা দূর হয়। মহাভারতের অন্তর্গত হল শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা। ভারতীয় হিন্দু সমাজের নিকট এই পবিত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগে বলেছেন –

"চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যম্।।"

এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারবর্ণের সৃষ্টি। কোন বর্ণই হীন নয়। অর্থাৎ গুণ ও কর্মের দক্ষতা লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারবর্ণের বিভাগ হয়েছিল। কর্মের ভিত্তিতে, দক্ষতার ভিত্তিতে একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারতো আবার ব্রাহ্মণও হীনকাজের জন্য শূদ্রবর্ণে নেমে যেতে পারতো। পরবর্তীকালে সমাজের উচ্চবর্ণীয়েরা এই রীতিকে খুব একটা মান্য করত না। ধীরে ধীরে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় এই জাতিবর্ণ প্রথা কর্মগত না হয়ে জন্মগত হয়ে উঠেছে এবং তার বীভৎস রূপ দিনে দিনে জোরদার হয়ে উঠেছে। যদিও ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় সংবিধান রচনাকালে এগুলির পুনরাবৃত্তি না হওয়ার জন্যে রক্ষাকবচ হিসাবে বিভিন্ন আইনি ধারায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিকে উপেক্ষা করেই সারা দেশব্যাপী ঘটে চলেছে সাম্প্রতিকতম হায়দ্রাবাদের রোহিত ভেমুলা থেকে মেদিনীপুরের চুনী কোটালের মতো নানান নারকীয়, ঘৃণ্য ঘটনাসমূহ।

আদি শাস্ত্র প্রণেতা মনুর সময়ে বঙ্গ এছিল একটি অনার্য প্রদেশ। বঙ্গ প্রথমে পশু, পক্ষী, উরগের ও পরে বন্যজাতির আবাসভূমি ছিল। মগধ রাজ্যের উন্নতির সময় বঙ্গে আর্যদের আগমন ঘটে। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত আর্যধ্বজা উড়িতেছিল।[৩৯] চীনদূত মাহুয়ান তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে কুড়িটি রাজ্যের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে বাংলার বিবরণ আছে। তবে তিনি বাংলাকে 'পাঙ্কোলা' নামে অভিহিত করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালি জাতি সম্বন্ধে বলেছেন – 'আমার বিশ্বাস, বাঙালি একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। ....বাংলার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, বাংলা ইজিপ্ট হইতে প্রাচীন অথবা নতুন। বাংলা নিনেভা ও ব্যাবিলন হইতে প্রাচীন অথবা নতুন। ...যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাংলা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাংলার সভ্যতায় ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙালিকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।' আবার তিনি বাঙালীর গৌরবের অনেক কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'তমলুক বাংলার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমনকি বুদ্ধের সময়েও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজসকল নানা দেশে যাইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি তা সংস্কৃত হইতে বোঝা যায় না। ... বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটি প্রধান বন্দর। বাংলায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বোঝা যায়।'[৪০] নৌবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে কৈবর্ত জাতির মানুষেরা নৌবাণিজ্যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। ফলে উপার্জনের উপায় হিসাবে নৌবিদ্যাকে কাজে লাগায়।

বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম অধিকার স্থাপিত হয় যখন ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১১৯৭ থেকে ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে লক্ষণ সেনের অধিকারভুক্ত নদীয়া ও লক্ষণাবতী(গৌড়) জয় করেন। ফলে বাংলার অন্যতম স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের অবসান সূচিত হয়। বখতিয়ার সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে অর্থলিপ্সায় যেমন হিন্দু বৌদ্ধ মন্দির-মঠ-বিহার ধ্বংস করেন তেমনি বেশ কিছু মসজিদ, মাদ্রাসা-খানকাও স্থাপন করেন। দেশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মোল্লা-পীর-ফকির আলমাদের সঙ্গে হাজার হাজার মুসলমান বাংলাদেশের শহরে নগরে, গ্রাম-গঞ্জে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ও নির্বিচারে লুঠতরাজ ও বলপ্রয়োগে ইসলামীকরণ শুরু করেছিল – যদিও এরকম তত্ত্বে সকলেরই আস্থা খুবই কম। তবে মুসলিম শাসনে বাংলায় বিভিন্ন সময়ে সমাজের একেবারে নীচু শ্রেণীর বহুমানুষ বিভিন্ন কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছিল বা বাধ্য হয়েছিল সেকথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।[৪১] আবার অনেকে বলেন ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক শোষণের কারণে ধর্মান্তরিত হয়েছিল বহু মানুষ। পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যাপতির ‘কীর্তিলতা’য় হিন্দু তুর্কি জাতিবিদ্বেষের একটি জলন্ত উদাহরণ পেয়ে থাকি।

কতহুঁ তুরুক বরকর।/ বাট জাইতেঁ বেগার ধর।।

ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।/ মথাঁ চড়াব এ গাইক চড়ুয়া।।

ফোট চাট জনউ তোড়।/ উপর চড়াব এ চাহ ঘোড় ।।

ধোয়া উড়িধানে মদিয়া সাঁধ।/ দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।।

গোরি গোমঠ পূরলি মহী।/ প এ রহু দেবাক ধান নহী।।

হিন্দু বলি দূরহি নিকার।/ ছোটেও তুরুকা ভভকী মার।।[৪২]

ড. সুকুমার সেন অংশটির অনুবাদে বলেছেন – "কত তুরুক রাস্তায় বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে ধরে এনে তাঁর মাথায় চড়িয়ে দেয় গরুর রাঙ। ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে, দেউল ভেঙ্গে মসজিদ বানায়। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, পা দেবার একটুও স্থান নেই। হিন্দুকে বলে দূর নিকালো। তুরুক ছোট হলেও বড়কে মারতে চায়।" যদিও পরবর্তী সময়ে এই ধর্মান্তরকরণের ঘটনা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আবার স্বেচ্ছায় বা রাজানুগ্রহ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এই সময়কার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সমাজের নীচের স্তরের অসংখ্য শূদ্র ও শূদ্রেতর মানুষজন ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অকথ্য নিষ্ঠুর ও অমানবিক উৎপীড়নে ধীরে ধীরে ইসলামের ছত্রছায়ায় আসতে থাকে এবং ক্রমশ এই সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে শ্রীচৈতন্যের নববৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি খুব একটা চোখে পড়ে না। এককথায় সুলতানী আমলের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল পর্যন্ত বাংলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় বেশীরভাগ সময় তুর্কি-তাতার-পাঠান, খিলজি-হাবসী-মামলুক সুলতানদের চন্ডনীতি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, মোগল সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ এবং সেইসঙ্গে পরোক্ষভাবে ইসলামীকরণ এবং ধর্মান্তরকরণ ছিল সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরের ঐতিহাসিক ঘটনা। বলা যায় বাংলার সমাজে, বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে ইসলামী শাসন ও শোষণ সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[৪৩]

তবে সেন আমলে রাজা বল্লাল সেনের (১০৮৩-১১৭৯) সময়কালেই জাতপাত বিচার, ভেদাভেদ, সংকীর্ণ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। সেই সময় রাজ দাক্ষিণ্যে কৈবর্তদের কিছুটা অংশ উন্নীত হয় ও সমাজে জলচল জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়। তেমনই আবার প্রবল চক্রান্তের দ্বারা কৈবর্তদের শ্রেণীভেদ প্রবল আকার ধারণ করে। জেলে বা জালিয়া কৈবর্তদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

অর্থাৎ জালিয়া বা জেলে কৈবর্তদের সামাজিক অবনমন ঘটে, একইসঙ্গে হালিয়া বা চাষী কৈবর্তদের সামাজিক উত্তরণ ঘটে। তবে হিন্দুধর্মে জাতিভেদ নিয়ে সুকুমার সেন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে জাতিভেদের একটা নিয়ম ছিল বৃত্তি অনুসারে আর অন্যটি হল আচার অনুসারে।[৪৪] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর 'ভারতের ইতিহাস প্রণালী'(১৯৭৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভারতের ঐতিহাসিক গোষ্ঠী তাদের দায়িত্ব পালনে বিফল। নিজ জাতির স্বার্থরক্ষায় অন্য জাতি সম্পর্কে বিকৃত তথ্য প্রবেশ করেছেন। সেখানে হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ জাতিগুলির প্রতি কঠোরতা, দুর্ব্যবহার ও নিগ্রহের কথা ধামাচাপা দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। যদিও এই ধারা আজও প্রবহমান।[৪৫]

বঙ্গদেশে আর্যদের আগমনের সময়কালে এদেশে শুধুমাত্র দুটি ভাগই লক্ষ্য করা যেত – আর্য আর দাস বা দস্যু। আর সেজন্যই আর্যদের কাছে এদেশের সমস্তই অনার্য। আর্যদের চতুবর্ণ বিভাগে এদেশের কিছু গোষ্ঠী তাদের সাথে মিশে গেল, তাদের স্থান হল শূদ্র সমাজে। আর এই থাকের বাইরে যারা রয়ে গেল তাদের বলা হল অন্ত্যজ শ্রেণী। এই অন্ত্যজ গোষ্ঠীগুলি সবাই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি। যেমন কায়স্থ বলতে একটি জাতিকে বোঝায়, কৈবর্ত, বাগদি বলিতেও সেরকম এক একটি জাতি বোঝায়। বেণীমাধব ভট্টাচার্য তাঁর 'জাতি কৌমুদী ও বর্ণসংকর' গ্রন্থে দেখান যে সমস্ত জাতিই চতুবর্ণের সংকর, তস্য সংকর ও তস্য সংকর থেকে উৎপন্ন। সংকর বর্ণ ছিল এবং থাকবে। তবে সংকর বর্ণ আদি বর্ণ অপেক্ষা অধিক হতে পারে না। "বঙ্গদেশে চাতুর্বর্ণ লোক যত আছে, এক কৈবর্তের সংখ্যা তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক, কেমন করিয়া বলিব যে কৈবর্ত এই চাতুর্বর্ণের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকর বর্ণের সংকরে উৎপন্ন হইয়াছে।"[৪৬] তবে ঔপনিবেশিক আমলে বিশেষত

১৮৭২ সাল থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত সমস্ত জনগণনার রিপোর্ট থেকেই এই চাষি কৈবর্তের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 'Report of the Age of Consent Committee-1928-29'-থেকে জানা যায় চাষি কৈবর্তরা ছিল বাংলার বৃহৎ জনগোষ্ঠী। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে "In Bengal the Chasi Kaibartta class is the largest caste among the Hindus, its population being over 2 million. The members belong to the Depressed Classes."[৪৭] এই কৈবর্ত জাতির অতীত কীর্তি বাংলায় ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করে। কথা সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন- 'যে কৈবর্তরা কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রধান শক্তি ছিলেন, তাঁরা হালিক বা চাষী এবং জালিক বা মৎসজীবী। এঁরা যদি পরাজিত না হতেন, তাহলে নগর রচনা, জীবনবৃত্তান্ত, শিল্প, সংস্কৃতি সবকিছুর একটি দেশজ রূপ ক্রমেই ব্যাপ্তভাবে বিকাশ হত, আর তা হত বাংলার মাটি থেকে জাত।[৪৮] মেদিনীপুরে জমিদারি প্রথায় কৃষির ব্যবসায়িক প্রসারের ক্ষেত্র উন্মোচিত হয় ১৯০৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে। এখানে মূলত বেশীরভাগ লাভবান হয়েছিল মাহিষ্যরা এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষজন এবং মুসলিম সমাজ। এরপর মাহিষ্যরা তাদের পেশাগত জীবিকার উত্তরণ ঘটাতে চাইছিল। তারা তাদের মৎস্য জীবিকা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র চাষবাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিজেদের উচ্চস্থান দাবী করতে থাকে।[৪৯]

কৈবর্তদের সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই সভ্যতার ধারক ও বাহক আদিম অরণ্যবাসীদের সংস্কৃতি দীর্ঘকাল আর্যব্রাহ্মণ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে থেকে অনেকটা পরিবর্তন ঘটলেও তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তবে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের আদিম জনজাতিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বর্তমানে অনেকটাই অবলুপ্তির পথে। এদেশের আদিম নিবাসীরা – সাঁওতাল, বাগদি, বাউরি, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি বহু উপজাতি ও কৌম একসময় পাথুরে হাতিয়ার ও তীর-ধনুক নিয়ে বন জঙ্গলে বন্যজন্তু শিকার করে ও বন্য ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করত। ক্রমে সেখানে বন জঙ্গল পরিস্কার করে বসতি গড়ে তোলে। সেসময় তারা বন্যজন্তু ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। আর সেজন্যই এই ভয়-ভীতি ও বিশ্বাস থেকে বিভিন্ন রকম দেবদেবী ও পূজাচারের প্রচলন করেছিল। ক্রমে সভ্যতার উন্নতির ফলে কৃষিকাজের মাধ্যমে উৎপাদন শুরু করে। পশুপালন, চাষবাস, মৎস্য শিকার ইত্যাদির ফলে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এইভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। এই অধ্যায়ে প্রাচীন জনগোষ্ঠী কৈবর্তদের সাংস্কৃতিক জীবন তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কৈবর্তরা অতি প্রাচীন অনার্য জনগোষ্ঠী। রামায়ণ, মহাভারত, মনুস্মৃতিতে কৈবর্তদের উল্লেখ আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় এমনকি অশোকের শিলালিপিতে কৈবর্তদের উল্লেখ আছে। রাঢ় অঞ্চলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত এবং ডিহর ও জোড়সা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুতে জাল ও প্রাচীন জালকাঠি ও হারপুন মিলেছে। তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে বাংলায় মৎস্যজীবী তথা কৈবর্তদের অস্তিত্ব সুপ্রাচীন। ড. মাণিকলাল সিংহ এই মৎস্যজীবী জাতির অস্তিত্বকে তাম্রপ্রস্তর যুগের আগেকার লোক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫০] আট এবং দশ নং চর্যাপদেও

নৌকা বাওয়া এবং জাল ফেলার প্রসঙ্গ রয়েছে।[৫১] তবে তারা যে অতি প্রাচীন জনজাতি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রিসলে তাঁর 'The Tribes and Castes of Bengal' গ্রন্থে বলেন – কৈবর্ত জাতিরা 'undoubtedly represented of the prehistoric dwellers in the Gangatic delta'.[৫২] আবার ভারত সরকারের Report of the Age of Consent Committee থেকেও আমরা সে তথ্য জানতে পারি। 'There is little doubt that the Kaibarttas were one of the aboriginal tribes of the country. They are spoken of in the Mahabharata, and also in the ancient religious books of the Hindus'.[৫৩]

কৈবর্তরা আদিম জনগোষ্ঠী তা আমরা আগেই জেনেছি। সেই আদিম কাল থেকে মানুষ যখন তার নিজের শক্তি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করতে অসহায় বোধ করেছিল, যখন বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে তারা নিজেদের জীবন বাঁচাতে পারছিল না সেই সংকটময় মুহূর্তে তাদের চিন্তা ভাবনায় যাদের নিরাময়কারী ও রক্ষাকর্তা রূপে কল্পনা করেছিল সেই সমস্ত রক্ষাকারী শক্তি বা দেবদেবীর কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সেসময় তারা জানত না প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, খরা, মহামারী-মড়ক কিম্বা দাবানলের মতো বিধ্বংসী ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণ। যেগুলি তাদের কাছে দেখা দিয়েছিল ভয় ও বিস্ময়ের। সেকারণে তারা আদিম যুগ থেকেই নানারকম প্রকৃতি পূজা, জীবজন্তু পূজা ও বিভিন্ন দেবদেবী পূজার প্রচলন করেছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে – 'বাঙালির ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হচ্ছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কৌমের, এককথায় বাংলার অধিবাসীদেরই পূজা, আচার অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।'[৫৪]

আদিম জনপদ ও কৌমের মানুষজন সভ্যতার আদিকাল থেকেই সূর্য, অগ্নি, সোম, রুদ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি শক্তির আরাধনা করে চলেছে। একইসঙ্গে তারা শিব, কালী, চন্ডী, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, ভৈরব, ভীম, ধর্মরাজ, ওলাইচন্ডী, আটেশ্বর, বনদুর্গা, বিশালাক্ষী, মাকালঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করে আসছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন দেবদেবীর নামে উপবাস ও ব্রতপালন চালিয়ে যাচ্ছে। যদিও এসমস্ত দেবদেবীর বেশিরভাগের উল্লেখ আমরা বেদ-পুরাণে পাই না। আসলে পুরাণকার ও বৈদিক মতে এঁরা হলেন জলঅচলের দেবতা, অন্ত্যজদের দেবতা। এগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। তারা নিজেরাই নিজেদের পদ্ধতিতে পূজা সাঙ্গ করেন।[৫৫]

এখানে প্রথমেই কৈবর্ত তথা মৎস্যজীবীদের প্রধান দেবতা মাকাল ঠাকুরের কথা বলতে পারি। এই পূজায় মাছ চাষের জায়গায় দুটি মাটির ঢেলার প্রতীকে দেবতার আরাধনা করা হয়। এর আকৃতি একটি উপুড় করা গ্লাসের মতো। আদিম মানুষ যখন দেবদেবীর চিন্তায় মানুষের রূপ কল্পনা করতে পারে নি তখন মাটির ঢেলা, পাথরের টুকরোকে মসৃণ করে তা বানিয়ে নিত। মাকাল ঠাকুরকে দেখলে সেই যুগের কথাই মনে পড়ে। মৎস্যজীবী কৈবর্তরা কোনো জলাশয়ে মাছ ধরার আগে তার পাড়ে বা তীরে মাকাল ঠাকুরের পূজা করে। এই পূজায় কোনো ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। দলের সর্দার বা বয়স্ক ব্যক্তি নিজের কল্পনা ও শ্রদ্ধা ভক্তি অনুযায়ী পূজাকাজ সেরে ফেলে। এই ঠাকুরের পূজার সময় স্তূপাকৃতি একটা মাটির বেদী করে তার তিনটি থাক করে একেবারে ওপরের থাকে ঠাকুরকে রাখা হয়। সেখানে চারটি তীরকাঠি বেদির চারপাশে পুঁতে সেগুলি লাল সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। আর এই প্রতীকের ওপর একটা লাল রঙের চাঁদোয়া তৈরী করা হয়। প্রতীকের ওপর লাল সিন্দুর মাখিয়ে সামনে একটা ঘট রেখে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পূজায় ফুল ও বেলপাতার

ব্যবহার হয়। এই পূজায় নৈবেদ্য হিসাবে অত সামান্য আতপ চাল, পাকা কলা ও বাতাসা দেওয়া হয়। আর সঙ্গে নতুন একটি কলকে এবং কিঞ্চিৎ গাঁজা। এই মাকাল ঠাকুর মূলত পুরুষ দেবতা ছিলেন। অনেকে বলেন এই দেবতা আসলে রুদ্রদেব বা শিব। প্রায় দুশো বছরের অধিক প্রাচীন 'তারকেশ্বর শিবতত্ত্বে' মাকালের উল্লেখ রয়েছে।

ক্ষেত্রপাল মহাকাল প্রভৃতি দেবতা।
যাহার যেরূপ ভক্তি সেরূপ গঠিতা।।
কোথায় ওলাইচন্ডী মাখাল জলায়।
বৃক্ষতলে মহাপ্রভু স্থান দৃশ্যপ্রায়।।[৫৬]

আবার একইসময়ে বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গলে মাকাল বা মাখালের উল্লেখ দেখা যায়–

দাধার চণ্ডিকা বন্দোঁ যোড় করি পাণি।
বালিয়ায় বন্দিলাম জয়-সিংহ বাহিনী।।
ঘুরালো মাখাল বন্দোঁ পুরাণের ঘাঁটু।
তালপুড়ে ষষ্ঠী বন্দোঁ হাসনানের বটু।।
কালিঘাটে বন্দিলাম দেবী ভদ্রকালী।
ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিল অঙ্গ বলি।।[৫৭]

বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশেষত মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মৎস্যজীবী কৈবর্তদের সঙ্গে স্থানীয় চাষিদেরকে অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে মাকাল ঠাকুরের প্রতীককে পূজা করতে দেখা যায়।

বাংলায় কৈবর্ত জাতির অপর এক আরাধ্য দেবী, কুলদেবতা হলেন মনসা। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতে সর্প পূজার নিদর্শন স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে তৈরি পোড়ামাটির সর্পফণার প্রাপ্তিও এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাঙালির মানস কল্পনা থেকে উদ্ভূত সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা নবম-দশম শতক থেকে গ্রাম বাংলায় প্রায় সর্বত্র পূজিত হয়ে চলেছেন। মধ্যযুগেও দেবী মনসার মাহাত্ম্য কাহিনী অবলম্বনে মনসামঙ্গল কাব্য বিশেষ পরিচিত।[৫৮] মনসাকে দেবাদিদেব শিবের মানসকন্যা হিসেবেও মনে করা হয়। মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলন সম্পর্কে জালো-মালো, চাঁদ সওদাগর-বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী ইত্যাদি নানা কথা প্রচলিত আছে। বাংলার কৈবর্ত সমাজের প্রতিটি সম্পন্ন ঘরে গোটা শ্রাবণ মাস ধরে পদ্মপুরাণ পাঠ হয় ও সংক্রান্তিতে ঘটা করে পূজা হয়। এককথায় এই সমাজে মনসা পূজার জাঁকজমক খুব বেশি। তবে এই দেবী কারো বাড়িতে ঘটের দ্বারা আবার কারো বাড়িতে মূর্তি দ্বারা খুব ধূমধাম করে পূজিত হন।

কৈবর্তদের দ্বারা পূজিত অপর এক দেবী হলেন মা শীতলা। বাংলায় হাম, বসন্ত রোগের পরিত্রাণকারী দেবী হিসাবে শীতলা পূজার প্রচলন রয়েছে। এই দেবীর মূর্তি অদ্ভুত ধরণের শ্যামবর্ণা আর সঙ্গে বাহন হল গর্দভ। দেবীর এক হাতে কলসী, অন্যহাতে ঝাঁটা ও মাথায় থাকে কুলা। কথিত আছে এই দেবী হাতের ঝাঁটা দিয়ে এই সমস্ত রোগ তাড়ান ও কুলার বাতাসে রোগ থেকে সুস্থ করে তোলেন। এই দেবী যে আর্যেতর কোন জাতির কল্পনায় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগে

লোকালয় থেকে দূরে গ্রামের বাইরে বা নদীর ঘাটে এই শীতলার পূজা হত। আসলে হাম-বসন্তের মতো রোগ (অনেকে বলেন মায়ের দয়া) যাতে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই এই পূজা দূরে করা হত। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে লোকালয়ের মধ্যেও শীতলা দেবীর সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর অবস্থান চোখে পড়ে। এই দেবীর বার্ষিক পূজা খুব সাড়ম্বরে উদযাপিত হয় চৈত্র-বৈশাখ মাসে। তবে অনেক জায়গায় দেবীর নিত্যপূজাও হচ্ছে গৃহস্থ বাড়িতে। আর এই পূজায় অনার্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাই বেশিরভাগ এর পৌরোহিত্য করেন।[৫৯] তবে বর্তমানে অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারাও এই পূজো করানো হয়। বাংলার বহু জায়গায় এখনও আদিকাল থেকে এই দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে যেমন ভয়-ভীতি ছিল তা আজও অনেক জায়গায় বর্তমান। তবে বসন্ত, হাম, মিলমিলাদি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে পূজিত হলেও বর্তমানে পরিবারের কল্যাণ কামনা, সন্তান কামনা ও অন্যান্য রোগ নিরাময়ের জন্যও এই দেবীর নিকট প্রার্থনা করতে দেখা যায়। তবে মেদিনীপুরের লোকজীবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেবী শীতলার প্রভাব সর্বাধিক।[৬০] এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম-সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় কমবেশি এই শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশে আর্যপূর্ব যুগে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের মধ্যে মাতৃপূজা ও তান্ত্রিক সাধনা প্রবলভাবে দেখা যেত। বাসলী বা বিশালাক্ষী দেবী সম্ভবত তাদেরই দেবী। কালক্রমে আর্য-অনার্য ধর্ম-কৃষ্টিতে মিলেমিশে হিন্দু সমাজের দেবী হয়ে উঠেছেন। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বাসুলী, বাসলি বা বাঁশুলি নামেও এই দেবী সমধিক প্রসিদ্ধ। জানা যায় বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে বড়ু চণ্ডীদাসের ভিটা ও বাসুলী দেবী বিশেষ জাগ্রত। এই বাসলী বা বিশালাক্ষী যে অনার্যদের দেবতা সেকথা কবি বৃন্দাবন

দাসও উল্লেখ করেছেন। চর্যাপদে 'বাছলী' নামে এক দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কয়েকটি মঙ্গলকাব্যে বিশালাক্ষীকে রঙ্কিনী দেবীও বলা হয়েছে। যেমন বাসুলীমঙ্গল কাব্যের বহুস্থানে এর উল্লেখ দেখা যায়। 'গলে নর শিরমালা, শিরে শোশে শশিকলা, প্রেতাসনে রঙ্কিনী বাশুলী।'[৬১] এই দেবীর দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা বা বহুভুজা মূর্তিও দেখা যায়। তবে এই দেবী গৃহদেবতা হিসাবে পূজিতা হন না। এই পূজায় মাগুন, সমষ্টিগত অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। আর এই প্রথাগুলি অবশ্যই আদি মধ্যযুগীয়। অনেকের মতে এগুলি সবই অনার্য জাতির প্রথা। এই দেবীর পূজায় ব্রাহ্মণেতর জাতিরাই পৌরোহিত্য করেন। জানা যায় এই দেবী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বাংলার বিভিন্ন স্থানে কৈবর্তদের মধ্যে এই দেবী পূজার সম্মিলিত আয়োজন করতে দেখা যায়।

বাংলার পাড়াগ্রামে সর্বত্র কৈবর্তদের অপর একটি প্রসিদ্ধ লৌকিক দেবতা হলেন পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুর। এই দেবতা কোনো ব্যক্তিগত বা গৃহদেবতা হিসাবে পূজা পান না। বাসস্থান বা লোকালয় থেকে দূরে কোনো জলাশয়ের তীরে বড়ো গাছের তলায় এই ঠাকুরের থান দেখা যায়। এই ঠাকুরের রঙ কালো, মাথায় জটা, চুল ঝুঁটি করে বাঁধা থাকে। কোনো কোনো স্থানে এই ঠাকুরের মাথায় শিং দেখা যায়। আর কানে-গলায় ও হাতে নানারকম গহনা দেখা যায়। এককথায় আদিম যুগের দেবকল্পনা এই মূর্তিতে বিদ্যমান। সন্তানের মঙ্গল কামনায় ও রোগমুক্তির জন্য এই দেবতার পূজা করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পঞ্চম দিনে আঁতুড় ঘরে পালন করা হয় যে আচার তাকে পাঁচুটে বলা হয়। আসলে শিশু জন্মাবার কয়েকদিনের মধ্যেই রিকেটস, জণ্ডিস, ধনুষ্টংকার রোগে আক্রান্ত হয়ে শিশু যাতে মারা না যায় সেজন্যই পাঁচু ঠাকুরের পূজা আজও বাংলার অন্যান্য অনেক

জাতির মতো কৈবর্ত জাতির মধ্যেও দেখা যায়। পরবর্তীকালে এই দেবতা বৈদিক সমাজে স্বীকৃতি পেলে ইনি শিব নামে পরিচিত হন। আর এই শিব যে আদিতে অনার্যদেরই উপাস্য ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকে পঞ্চানন্দ ও ধর্মরাজ ঠাকুরকে অভিন্ন বলে মনে করেন। এই ঠাকুরের মঙ্গলকাব্য পঞ্চানন মঙ্গল বা পঞ্চানন বন্দনা নামে পরিচিত।[৬২]

বাংলার কৈবর্ত সমাজে বনদুর্গা বা বনষষ্ঠীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি দেখা যায়। বন জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই এর নাম বনদুর্গা। কোথাও কোথাও এই দেবী বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী নামেও পরিচিত। আদিম যুগে মানুষ গুহা বা গাছের কোটরে বসবাস করত বা আশ্রয় নিত। জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আদিম নিবাসীদের সবচেয়ে বড়ো ভয় ছিল বন্য জীবজন্তু বা বিষধর সাপের দংশন। এদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এই দেবতার প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। সেই থেকে ব্যাঘ্রকূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সমাজে পূজা পেয়ে আসছেন। এই দেবীর কোনো স্থায়ী থান বা মন্দির দেখা যায় না। বনদুর্গার মূর্তিতে কোথাও দশটি হাত বা কোথাও চারটি হাতযুক্ত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে বা তার লাগোয়া মেদিনীপুর জেলায় এই দেবীর অনেক মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। কোথাও দেবীর কোলে একটি শিশু থাকে আবার কোথাও দেবীকে বাঘের ওপর উপবিষ্ট থাকতে দেখা যায়। এই দেবীর বেশভূষায় অরণ্য বৈশিষ্ট্য এখনও অটুট আছে। অনুন্নত সমাজের অনার্য লোকেরাই এই দেবীর পৌরোহিত্য করেন। এই পূজোয় কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। এই পূজোয় কেউ কেউ পাঁঠা বলি দিতেন। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ জায়গায় জীবহত্যা বন্ধ হয়ে গেছে। এই দেবীর পূজায় গ্রাম্য মোড়ল বা গোষ্ঠী প্রধানের তত্ত্বাবধানে সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। কোনো কোনো জায়গায় এই পুজা উপলক্ষ্যে মেলা আয়োজিত হয়ে থাকে। বাংলার

বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে বেশ কিছু যাত্রা বা গায়কদল বনদুর্গার মাহাত্ম্যসূচক পালা অভিনয় ও গান করে থাকে।[৬৩] বাংলায় মুসলিম শাসনের সময় হিন্দুধর্মের নিম্নস্তরের বহু মানুষের ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু তাদের পুরাতন ধর্ম বিশ্বাস রাতারাতি পরিবর্তিত হয়নি। সেসময় তাদের দ্বারা পূজিত এই দেবী বনবিবি নামেও পরিচিতি লাভ করে।

কৈবর্তদের ধর্মীয় জীবনে ওলাইচন্ডী নামে এক দেবীকে পূজিত হতে দেখা যায়। অতীতে এখনকার মতো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হয়নি। তাই কলেরা রোগ হলে মহামারীর আকার নিত। গ্রাম থেকে গ্রাম প্রাণহানি ঘটে উজাড় হয়ে যেত। ফলে ব্যাপক মানুষের জীবনহানির হাত থেকে নিজেদের রক্ষা পেতে এই দেবীর আরাধনা করত। কলেরা বা ওলাউঠা রোগের উপসর্গ হল বমি ও পায়খানা একসাথে হয়। ওলাউঠার চলতি অর্থ হল ওলা মানে নামা ও উঠা মানে বমি হওয়া। অর্থাৎ যে রোগে বমি ও পায়খানা একসাথে দুটোই হয় তাকে ওলাউঠা রোগ বলা হয়। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে এই দেবীর মূর্তি একেবারে লক্ষ্মী বা সরস্বতীর মতো। বাংলায় মুসলিম শাসনকালে এই দেবীর প্রাধান্য থাকায় বহু অহিন্দু বা মুসলিমরাও এই দেবীকে মান্যতা দেয়। আর এই দেবী তখন ওলাবিবি নামে অধিক পরিচিতি লাভ করে। এই দেবীর থান অন্যান্য অনার্য দেব-দেবীর মতোই গাছের তলায়, ঝোপে-ঝাড়ে বা কোনো জলাশয়ের তীরে। এই পূজায় ছাগ বলি দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। এই দেবীর পূজা শনি ও মঙ্গলবারে হয়ে থাকে। এই পূজাতেও মাগুন প্রথা চালু আছে – যা আদিম যুগের খাদ্য সংগ্রহের নিদর্শন। এই দেবীর পূজার উৎপত্তিস্থল হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। এছাড়াও মেদিনীপুর, হাওড়া, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও এই দেবীর পূজার প্রচলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে এক মহাজাগ্রত দেবতা হলেন ভৈরব। অরণ্যবহুল অঞ্চলে অন্যান্য বনদেবতার সঙ্গে এই ভৈরবও পূজিত হন। বাংলার প্রায় সব জেলাতেই পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া ভৈরবের প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। এর মূর্তি পায় দেখাই যায় না। এই দেবতার থান সর্বদা লোকালয় থেকে দূরে কোনো গাছের তলে বা জঙ্গলের মধ্যে দেখা যায়। তবে বর্তমানে উন্নত হিন্দু সমাজেও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এই দেবতার প্রতাপ বা হুঙ্কার যে প্রবল তা মধ্যযুগীয় অনেক কাব্যে পাওয়া যায়। যথা –

ভূমির ভিতর থাকি করে ভীম রব,

যার নাম ভূমিকম্প সেইত ভৈরব।

শ্রী ভৈরব সাড়া দেন গুড় গুড় রব,

পরগণার ভূমি জল কেঁপে উঠে সব।[৬৪]

এখানে বলা হয়েছে এই দেবতার অবস্থান পাতালে। তাই অনেকে এই দেবতাকে কালভৈরব বা পাতাল ভৈরবও বলে থাকেন। বাংলার পল্লী অঞ্চলে এই দেবতাকে অনেকে শিবের আকৃতি ভেবে পূজা করেন। এর পূজা বিশেষত অনুন্নত সমাজের মানুষেরাই করে থাকেন। সব মিলিয়ে ভৈরবকে একেবারে আদিম দেবতা ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। প্রাক্‌-আর্য যুগে শিব উপাসনা প্রচলিত ছিল। সেই শিব ছিলেন উগ্র স্বভাবের। পরে আর্যরা তাদের নিজেদের দেবতা ভাবলে আর্য-অনার্য সমন্বয়ের ফলে সৌম্যদর্শন হয় ও শিব মহাযোগী হন। এই ভৈরবের পূজা দুই মেদিনীপুর, দুই

চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভুম, হাওড়া, হুগলি-সহ বাংলার অন্যান্য জেলাতেও সাড়ম্বরে হয়ে চলেছে।

কৈবর্ত সমাজে একসময় বহুল প্রচলিত পূজা পার্বণের মধ্যে ডরাই পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিমকাল থেকে মানুষের মনে ভয়-ডর থেকে এই পূজার উৎপত্তি। সেসময় মানুষ প্রাকৃতিক শক্তি ও বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে বাঁচার উপায় ও ভয় থেকে এইসব পূজার মাধ্যমে আত্মসন্তুষ্টি খোঁজার চেষ্টা করেছে। কৈবর্ত সমাজে শিশুকালে মানত করা থাকলে বিবাহের পূর্বে এই পূজার আয়োজন সাঙ্গ করতে হয়। বিবাহিত জীবন ভয়শূন্য হওয়ার জন্য এই আয়োজন করা হয়।[৬৫] এই পূজায় ডরাই-এর মূর্তি কিছুটা মনসার মূর্তির মতো। মূর্তির পাশে নাগ থাকে। নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ বাংলাদেশে মানুষ সবসময় সাপের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। এই ভয় থেকেই আরাধনা করে তাকে তুষ্ট করার ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পূজায় গুর্মার পাঁচালি হয়, নতুবা এই পূজা যেন অসম্পূর্ণ থাকে। এই পূজাতেও কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। যদিও সময়ের সাথে সাথে এই পূজা তার পুরাতন মাহাত্ম্য ও জৌলুষ হারিয়ে অবলুপ্তির পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাংলায় বিশেষত মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলায় আটেশ্বর বা আটমুনসীর পূজা দেখা যায়। ইনি অরণ্য রক্ষক ও পশুদের রক্ষাকারী দেবতা নামে পরিচিত। অরণ্য অঞ্চলে আবাদকারী চাষীরা, মৌলেরা বনে ঢুকবার আগে দক্ষিণ রায়, বনদুর্গার মতো বনদেবতা আটেশ্বরকেও পূজা করে। এর বিভিন্ন মূর্তি ও পাথর প্রতীকে পূজা হয়। এই দেবতার মূর্তির মাথায় পাগড়ি, বড়ো বড়ো চুল, হলদে রঙের কাপড় মল্লের মতো পরা, কানে মাকড়ি, হাতে বালা ও গলায় হার পরিহিত থাকে। আর ডান হাতে থাকে ছোটো গদা বা মুগুর। এই আটেশ্বরের বাহন হল মহিষ। সবমিলিয়ে দেখলে এই দেবতা

যে আদিম ভাবাপন্ন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই আট নাকি কোনো কোনো পুকুরেও দেখা যায়। যে পুকুরে আটের অধিষ্ঠান সেখানে কৈবর্ত জেলেরা মাছ ধরার আগে দেবতার উদ্দেশ্যে পিঠা নৈবেদ্য দিয়ে পূজা করে। কৈবর্ত-সহ আদিম নিবাসীদের ধারণা আটেশ্বর তাদের গৃহপালিত গবাদি পশুদের বন্যজন্তু জানোয়ারদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এমনকি তাদের পোষা গোরু ছাগলের রোগ হলেও এই আটেশ্বরকে পূজা দেন। কৈবর্ত জেলেদের পল্লীতে আটেশ্বরের সঙ্গে মাকাল ঠাকুরও পূজিত হন। কালুরায়মঙ্গল নামক প্রাচীন কাব্যে এই আট দেবতার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণ রায় ও কালু রায়ের পরামর্শদাতা হিসেবে আটেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায় – 'উপদেশ বল আট যাব কোথাকারে। কোন ছলে লব পূজা কে পূজিবে মোরে'। আবার আটেশ্বরকে পশু রক্ষক হিসেবেও বর্ণনা করতে দেখা যায় – 'ভবানী ভেড়া এই এনেছি ভারতে। আট নামে মুন্সি আছে সর্বদা রক্ষিতে'। এই আট দেবতাই পরবর্তীতে কিছুটা আর্যীকরণ ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে আটেশ্বর নামে পরিচিত হয়েছেন। বর্তমানে সকল স্থানেই বন জঙ্গল কেটে চাষাবাদ শুরু হয়েছে। তবুও সুন্দরবন এলাকায় ও দুই মেদিনীপুর জেলায় এই দেবতা পূজার অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে টিকে আছে।

আদিম যুগে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যচারী মানুষের ভয়ের একটি বড় কারণ ছিল বাঘ। এই বাঘের শক্তির তুলনায় মানুষের শক্তি যথেষ্ট কম তারা বুঝতে পেরে নানারকম জাদু প্রক্রিয়ায় বাঘ থেকে রক্ষা পাওয়ার দৈব উপায় কল্পনা করতে থাকে। আবার নদীমাতৃক বাংলায় জলমগ্ন জায়গায় কুমীরের উপদ্রবও যথেষ্ট। একটা খুব প্রচলিত প্রবাদ শোনা যায় – 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'। আর এই বাঘ ও কুমীরের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কালু রায়ের বা দক্ষিণ রায়ের পূজার প্রচলন। তবে এই দেবতা কোথাও কালু রায়, দক্ষিণ রায়, বাঁকুড়া রায় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই দেবতার

মূর্তি বীরের মতো, মাথায় পাগড়ি, কানে কুন্তল, কপালে তিলক, চোখ দুটি বড়ো বড়ো আর গোঁফজোড়া লম্বা। এই দেবতার পোশাক পৌরাণিক যুদ্ধ দেবতার মতো। তাঁর দুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, পিঠে তীর ধনুক ও কোমরে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র ঝোলানো। এর বাহন বাঘ ও কুমীর। এই দেবতা গাছতলায় পূজিত হয়ে থাকেন। কোনো কোনো স্থানে এই দেবতার পূজো পাথরখণ্ড প্রতীকে হয়ে থাকে। তবে পরবর্তীতে এই জাতীয় ভয়-ভীতি বিশেষ না থাকায় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বা গ্রামদেবতা হিসেবে পূজো নিবেদনের রীতি চলে আসছে। এমনকি গোরু, মহিষ নিখোঁজ হলে এই দেবতার নিকট মানত করা হয় ও তা পূরণে পূজো দেওয়ার রীতি বাংলার কোনো কোনো জায়গায় রয়েছে। বিশেষত উপকূলবর্তী চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কোনো কোনো স্থানে পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগে এই দেবতার মাহাত্ম্য নিয়ে পাঁচালি রচিত হয়েছিল যা 'কালুরায়ের গীত' নামে পরিচিত।

বাংলার কৈবর্ত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে গাজন বা চড়ক উৎসব অতি প্রাচীন যা আজও সগৌরবে চলে আসছে। ধর্মঠাকুর বা শিবের গাজন ও চড়কের মেলা বাংলার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই পূজায় অংশগ্রহণকারী ভক্তরা খুব বেশী মাদক দ্রব্য সেবন করে থাকেন। এরাই জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর নৃত্য করার রীতি চালু আছে। আবার বিভিন্ন অঙ্গে বাণ (লোহার তীর) বিদ্ধ করে উদ্যাম নৃত্য করতে থাকেন যা আসলে আদিম যুগের ধর্মাচরণ বলেই মনে হয়। এই ঠাকুরের পূজো গ্রামবাংলার সর্বত্র বারোয়ারী আদর্শে হয়ে থাকে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত পূজোতে নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরাই পৌরোহিত্য করে থাকেন। তবে অতি সম্প্রতি মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি সহ সব জায়গাতেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অংশগ্রহণ চোখে পড়ছে। এই গাজন বা চড়ক পূজোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল গাজনে সঙ বের করার রীতি। জেলে কৈবর্ত সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর

মানুষেরা নতুন পোশাক পরে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী সহযোগে গান ও ছড়া কাটার মাধ্যমে চিত্ত বিনোদন করত। বাংলার বিভিন্ন পূজা পার্বণের সময়েও এই সঙ বের হত। ইংরেজ আমলে সঙের মিছিলে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরেজরাও যোগদান করত। এই সঙের মিছিলের ছবি (প্রোশেসন অফ দি চড়ক পূজা) এঁকেছিলেন বিদেশী চিত্রকর চার্লস ডয়লি।[৬৬] তবে বাংলার বিভিন্ন স্থানের চেয়ে কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। এই সঙে কৈবর্তরা ছাড়াও বিভিন্ন জাতির লোকজনেরা যোগদান করত। হুতোম প্যাঁচা কলকাতার চড়ক পার্বণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- 'কলিকাতা সহরের চারদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠ সড়সড় কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে, - সর্বাঙ্গে গয়না, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ী মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরের ছোপান গামছা কাঁধে বিল্বপত্র বাঁধা সূতা গলায় যত ছূতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই – আমাদের বাবুর বাড়ী গাজন'।[৬৭] তবে স্বাধীনতার পরে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে সঙের অন্যতম প্রবর্তক নাট্যকার জ্যোতিশচন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে সঙের ছড়া, গান ও অভিনয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আসরে সভামঞ্চে, এমনকি আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। তাঁর পর **১৯৮০** সাল থেকে কলিকাতা কৈবর্ত সমিতি বৃহত্তর মঞ্চে ও সম্মেলনে জেলেপাড়ার সঙকে উপস্থাপিত করেন। **১৯৮৫** সালে কলকাতার ৩০০ বছর উপলক্ষে কলিকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় জেলেপাড়ার সঙ রাস্তায় বের হয়।[৬৮] এই সঙ উপলক্ষে অজিত কুমার বসু একটি ছড়া লিখেছেন –

জেলেপাড়ার সঙ

আমরা জেলেপাড়ার সঙ

ঠোঁটকাটা পরিচয় আর হরেক রকম ঢঙ।।

আশি বছর কেটে গেছে তবুও তোয়াছি বেঁচে

সত্যি কথা কইতে কভু করি না ভড়ং।।

হুল ফোটানো কথা বলে রাজরোষে যাই যে জ্বলে

তবু জ্বলে পুড়ে পাই যে মোরা খাঁটি সোনার রঙ।।

যেখানের যা দেখি ছিরি ভালো মন্দের তফাৎ ধরি

বুজরুকদের মুখোশ খুলে হাটের মাঝে ভাঙ্গি হাঁড়ি।

তাই কলমখানা শানিয়ে রাখি ধরতে দিই না জং।।

জাতি ধর্মের বজ্জাতিতে আঘাত হানি কঠিন হাতে

বন্ধ আগল খুলে করি জীবনের চয়ন।।

জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা যত প্রচারিতে আমরা রত

অন্ধকার ঘোচাতে আমরা সঁপেছি এ প্রাণ মন

নতুন প্রাণে দোলা দিতে মোদের নেই কোন অহং।।[৬৯]

এইভাবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই চড়ক বা গাজন উৎসব হয়ে থাকে বছরের দুবার। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন আর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কৈবর্ত-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের যোগদানের ফলে এক সম্প্রীতির বন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো উপরিউক্ত পূজো পার্বণ ছাড়াও পৌষ সংক্রান্তির মেলা, বুড়াই বুড়ির পূজা, অষ্টম প্রহর, চব্বিশ প্রহর, কীর্তন, গঙ্গাপূজা, তুসু পূজা, ভাদু পূজা, বিভিন্ন ষষ্ঠী পূজা, ঘাটু পূজা, বৃক্ষ পূজা, বিভিন্ন ব্রত উপলক্ষে উপবাস ইত্যাদি নানা পাল পার্বণের ঘটনা তাদের ধর্মীয় জীবনকে ঘিরে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মানুষেরাও আর্যেতর ও অনার্য মানুষের দেবদেবী সংস্কৃতিকে কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য হল- ‘পালযুগেই বৌদ্ধরা অসংখ্য ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; আর্যেতর ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির দেবদেবীর পংক্তিভুক্তি করিতেছিলেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণেরাও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর, আর্যেতর দেবদেবীদের কিছু কিছু মানিয়া লইতেছিলেন’।[৭০]

বাংলার সমাজে নিম্নবর্গের মানুষেরা চিরকালই উচ্চবর্গের মানুষের কাছে ব্রাত্য হয়েই থাকেন। প্রথমত, উচ্চবর্গের মানুষের বসবাসের আলাদা পাড়া বা এলাকা থাকত। কাজের সূত্রে নিম্নবর্গের মানুষদের সেই পাড়ায় ডাকা হয়েছে বা এলে কোনোভাবেই যেন উচ্চবর্গের মানুষের ছোঁয়া লেগে না যায়, সেব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হত। আর নিম্নবর্গের মানুষের জন্যে তো বিভিন্ন এলাকাতেই

মন্দির বা দেবস্থানে ওঠা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। গ্রামের মোড়লেরা হত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। তাই সমস্ত নিয়মই প্রায় তাদের স্বার্থেই করা হত। একই পঙক্তিতে ভোজন করাও চলত না। দ্বিতীয়ত, সমাজের উচ্চবর্গীয় নারীদের খুবই সম্মানের চোখে দেখা হত। তাদের নামের পরে 'দেবী' ব্যবহার করতে দেখা যায়, অন্যদিকে নিম্নজাতের নারীদের ক্ষেত্রে তার উল্টোটা হত। তাদের ক্ষেত্রে নামের পরে 'দাসী/দাশী' ব্যবহার করতে বাধ্য হত। তা সে সমাজের উচ্চবিত্ত হয়ে গেলেও। অর্থাৎ সমাজের নীচু জাতের ক্ষেত্রে আলাদা। যেমন ব্রিটিশ শাসনকালে রানি রাসমণির প্রভাব ও প্রতিপত্তি আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। তাঁর নামের পরে 'দাশী' ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙ্কের খাতায় (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) এবং একই ধরণের লেখা তাঁর দেবোত্তর দলিলে। (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য)। তৃতীয়ত, সমাজের নীচু জাতের তকমা লেগে থাকলে তাঁর পক্ষে সমাজের উঁচু জাতের মেয়ে বিবাহ করা এক গর্হিত কাজ সমাজের চোখে। তা আমরা বর্তমান দিনেও পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে জাতি-গোত্রের উল্লেখ চোখে পড়ে। চতুর্থত, এসবই ধরে নিলাম সমাজের মাথাদের তৈরি করা নিয়মের বেড়াজালে আটকে আছে। আমরা যদি সরকারি দলিল দস্তাবেজ খেয়াল করি দেখতে পাবো বিংশ শতকের সমস্ত দলিলেই সে বৈষম্য চোখে পড়ছে। সেখানে ব্রাহ্মণ জাতির জন্য ব্রাহ্মণ লেখা হয়েছে, কিন্তু নিম্নবর্গের জাতিগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখা আছে। কখনো তাদের জাতি- কৈবর্ত, পেশা চাষাদি (সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) উল্লেখ রয়েছে। আবার কখনো সরকারি দলিলে জাতি- হিন্দু চাষী কৈবর্ত, পেশা চাষাদি উল্লেখিত রয়েছে।(সংযোজনী পৃ. দ্রষ্টব্য) এখানে মনে একটা প্রশ্ন জাগে সমাজের নিম্নজাতির মানুষের জাতির পরিচয়ে ভিন্নতা কেন? এইসমস্ত বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য আজও সমাজের কোনায় কোনায় কমবেশি টিকে রয়েছে। আবার আমরা যদি কৈবর্ত রাণী

রাসমনি স্থাপিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ও তার পুরোহিত বা পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের (গদাধর চট্টোপাধ্যায়) কথা আলোচনা করি সেখানে দেখতে পাবো শ্রী রামকৃষ্ণদেব আক্ষেপ করছেন তাঁকে কৈবর্তের অন্নে প্রতিপালিত হতে হয়েছে বলে। এজন্য এখানে উল্লেখ করতে চাই স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে কি লিখেছেন – "ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবাটিতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাইতাম। তাঁহার রন্ধনাদির সমস্ত যোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময় প্রসাদও পাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে শান্তি পাইতেন না – আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল। মধ্যাহ্নে ঐরূপ রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদিগের ন্যায় জগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি, ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া জগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি'। ঠাকুর কখনো কখনো নিজ মুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন, 'কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুন কষ্ট উপস্থিত হইত। গরিব কাঙালেরাও অনেকে তখন রাসমনির ঠাকুর বাড়িতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে'।" [৭১] এই কথাগুলির মাধ্যমে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে তৎকালীন সময়ে বাংলায় ধনাঢ্য কৈবর্ত জমিদার রাণী রাসমনির প্রভাব প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সমাজের বাঁধন কেমন ধরণের ছিল। যদিও একইরকম অস্পৃশ্যতার শিকার হতে হয়েছিল বিশ্ববন্দিত স্বামী বিবেকানন্দকেও। [সংযোজনী সংবাদপত্রের অংশ, দ্রষ্টব্য] অর্থাৎ এখানে সমাজের উঁচু থাকের

ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা নিম্নবর্ণীয় সমাজের মানুষের প্রতি মানসিকতারই আভাস এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলার নিম্নশ্রেণীর প্রান্তিক সমাজের মানুষেরা চিরকালই ইতিহাসে উপেক্ষিত। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বুর্জোয়া মানসিকতার ধারক ও বাহক ইতিহাসবিদগণ তাদের শ্রেণীস্বার্থেই দলিতদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ফেলে রেখেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা এই সমস্ত নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরা হয়নি। বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে কিছু ঐতিহাসিক তাদের জীবনকথা ইতিহাস চর্চায় স্থান দিয়েছেন। জাতিগত দিক থেকে এইসমস্ত মানুষদের সামাজিকভাবে বঞ্চিত করে রেখেছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে এরাই বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ সালে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ভারতে শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য’ প্রবন্ধে বলেছেন ‘ নীচু জাতিতে জন্মানোটা নিঃসন্দেহে বঞ্চনার একটি কারণ। কিন্তু নীচু জাতির লোকেরা যদি দরিদ্র হয় তবে তো জাতিগত বঞ্চনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দলিত বা নিম্নবর্ণের লোকেরা অথবা তপশীলিভুক্ত আদিবাসীরা যে বঞ্চনা ও বৈষম্যে ভোগেন, তা অনেক বেশীরকম হয়ে দাঁড়ায় যখন তা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।[৭২] অর্থাৎ দারিদ্রই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অভিশাপ। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বঞ্চনাই দলিত মানুষদের আরো নীচের দিকে টেনে নামিয়ে আনছে। তাই একজন নিম্নবর্ণের মানুষকে একইসঙ্গে দারিদ্র্যের এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। লড়াই করে সমাজে বেঁচে থাকতে হয়। অমর্ত্য সেন তাই এখানে নিম্নবর্ণের মানুষের বঞ্চনা ও বৈষম্যের জন্য দারিদ্র্যকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কাজেই দারিদ্র্য কমাতে পারলেই বঞ্চনা ও বৈষম্যের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। বেশকিছু কাল যাবৎ

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের কথা গ্রন্থিত হয়ে আসছে কয়েকজন ঐতিহাসিকের কলমে। তারা হলেন- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুকুমারী ভট্টাচার্য, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, মহুয়া সরকার, রূপকুমার বর্মণ প্রমুখ। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে জনমানসের উন্নতি ঘটলে সমাজে এই জাতি বৈষম্য দূর হবে। তবে তার জন্য আগে অবশ্যই প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সূত্রনির্দেশ:

১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ১৯ ভূমিকা, ১৯৯০

২। সত্যজিৎ চৌধুরী (সম্পা.), বঙ্গদর্শন, নীহাররঞ্জন রায়: শততম জয়ন্তী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’, কলকাতা: বঙ্কিম গবেষণা কেন্দ্র, ৬-৭ যুগ্ম সংখ্যা, ২০০৫, পৃ. ৫২

৩। পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৪। মরিস উইন্টারনিজ, অ্যা হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ভল্যুম – ১, প্রথম সংস্করণ, দিল্লি: মতিলাল বেনারসীদাস পাবলিশার্স, ১৯৮১,পৃ. ১১

৫। সিলভাঁ লেভি অ্যান্ড আদার্স, *প্রি-এরিয়ান অ্যান্ড প্রি-দ্রাবিড়িয়ান ইন ইন্ডিয়া; ইন্ট্রোদাকশন – অয়াস্ট্রো এশিয়াটিক অ্যান্ড ইন্দো এরিয়ান,* ১৯২৯; ফ্রেঞ্চ থেকে অনুবাদঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, কলকাতা: এশিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস, ২০০১, পৃ. Xii

৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড(মধ্যযুগ), কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ২২৯

৭। *বঙ্কিম রচনাবলী,* 'বঙ্গদেশের কৃষক', কলকাতা: তুলি কলম, পৃ. ২৮৮-৯১

৮। *বঙ্কিম রচনাবলী,* 'বাঙ্গালার ইতিহাস', তদেব, পৃ. ৩৩০

৯। সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ইন্ট্রোডাকশন, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. xxv

১০। *বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

১১। অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, *সেদিন বরেন্দ্রভূমিতে রক্তক্ষয়ী কৈবর্ত বিদ্রোহ,* ভূমিকা, কলকাতা, আনন্দ প্রকাশন, ২০১৯, পৃ. ৭

১২। অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭

১৩। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কাস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন বেঙ্গল: লেট এইটিন্থ অ্যান্ড আরলি টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরি', সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ৩১৮; যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড সেক্টস, ১৯৮৬, রিপ্রিণ্ট, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম, ১৯৬৮, পৃ. ১-৭

১৪। মেরুণা মুর্মু, 'পশ্চিমবঙ্গে জাতিবর্ণ বৈষম্যের রকমফের', সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত) *ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতিবর্ণ সমীকরণ*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৪৪

১৫। ক্ষিতিমোহন সেন, *জাতিভেদ*, ১৯৪৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়, পৃ. ১৫৩

১৬। দেবী চ্যাটার্জী, 'ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমীকরণ', সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলিত) *ভারতীয় ইতিহাস ও রাজনীতিতে জাতিবর্ণ সমীকরণ*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৩-১৪

১৭। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২ সন, পৃ. ৮৮-৮৯

১৮।নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ সন, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

১৯। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ সন, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

২০। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২১। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*, তদেব, পৃ. ৯৭

২২। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮

২৩। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

২৪। খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, *পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস*, কলকাতা: সঞ্জয় প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ১০৮-৩১

২৫। মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি,* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২, বিষ্ণুপুর: প্রদীপ কুমার সিংহ, পৃ.১৫

২৬। মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি,* তদেব, পৃ. ১৫-১৭

২৭। ধীরেন দেব, *বাঙালির গোত্র-পদবী ও কৌলিন্য প্রথা,* বেনাচিতি: প্রান্তর, ২০০৯, পৃ. ১০৪

২৮। রমাকান্ত দাস, *কৈবর্ত সম্প্রদায়: উদ্ভব ও পরিচিতি,* শিলচর: কোয়ালিটি গ্রাফিক্স, ২০১৫, পৃ. ৩১

২৯। অতুল সুর, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬, পৃ. ২২

৩০। সমরেন্দ্র দাসচৌধুরী, *কৈবর্ত সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: কৌস্তভমণি পাবলিকেশন, ১৯৯৭, পৃ. ১৩

৩১। সমরেন্দ্র দাসচৌধুরী, *কৈবর্ত সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত,* তদেব, পৃ. ১৯-২১

৩২। সমরেন্দ্র দাসচৌধুরী, *কৈবর্ত সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত,* তদেব, পৃ. ১৪৯

৩৩। মালদহের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, *আদি কৈবর্ত ইতিহাস,* মালদহ: আদি কৈবর্ত সমাজ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭

৩৪। হার্বার্ট হোপ রিসলে, *ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অফ বেঙ্গল,* ভল্যুম-১, কলকাতা: বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট প্রেস, ১৮৯২, পৃ. ৩৭৯

৩৫। রমাকান্ত চক্রবর্তী, *বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৭৮

৩৬। রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'চৈতন্যের ধর্মান্দোলন: মূল্যায়ন', উত্তরা চক্রবর্তী ও সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী (সম্পা.) *ইতিহাসে উপকূলে,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১১, পৃ. ৭৮

৩৭। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *সোশ্যাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১, পৃ. ১৪৫

৩৮। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন* যুগ, ঢাকাঃ ১৯৪৫, পৃ. ২৩৭

৩৯। অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃ. ২১৬

৪০। অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, তদেব, পৃ. ২১৭-১৮

৪১। পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী,* কলকাতা: গবেষণাগ্রন্থ ভাবনা, ১৯৯৭, পৃ. ১১৫

৪২। আর.সি.মজুমদার, এইচ.সি.রায় চৌধুরী অ্যান্ড কালীকিঙ্কর দত্ত, *অ্যান অ্যাডভান্সড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* প্রথম সংস্করণ ১৯৪৬, তৃতীয় সং. ১৯৬৭, কলকাতা: ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোং. ইন্ডিয়া লি., ১৯৬৭, পৃ. ২৭৯-২৮০

৪৩। পরিতোষ মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে অনগ্রসর শ্রেণী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪৪। সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা,* কলকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৫৮, পৃ. ২০৬

৪৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার,*বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স লি., ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯

৪৬। প্রণব সরকার(সম্পা.), *স্বদেশচর্চা: লোক,* গোষ্ঠী সমাজ সম্প্রদায় সংখ্যা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'জাতিভেদ', কলকাতা: স্বদেশচর্চা, ২০১৩, পৃ. ২৮

৪৭। *রিপোর্ট অফ দ্য এইজ অফ কনসেন্ট কমিটি ১৯২৮-২৯,* ভল্যুম-৪, কলকাতা: সেন্ট্রাল পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ, ভারত সরকার, পৃ. ৬৫-৬৬

৪৮। মহাশ্বেতা দেবী, *কৈবর্তখণ্ড,* কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, উপন্যাসের ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৪৯। সব্যসাচী ভট্টাচার্য(সম্পা.), *এ কম্প্রিহেনশিভ হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল ১৭০০-১৯৫০,* সুমিত সরকার, ‘দ্য স্বদেশী ইরা ইন বেঙ্গল’, ভল্যুম -৩, কলকাতা: দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্রাইমাস বুকস, ২০২০, পৃ. ১১; ০সুগত বোস, *এগ্রেরিয়ান বেঙ্গল: ইকোনমি, সোশ্যাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড পলিটিক্স,* কেম্ব্রিজ, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ৪৬, ৬৪

৫০। মাণিকলাল সিংহ, *রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি,* প্রথম খণ্ড, বিষ্ণুপুর: প্রদীপ কুমার সিংহ, ১৯৮২, পৃ. ২১৪

৫১। মিহির মোহন কামিল্যা, *রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি,* বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮০

৫২। এইচ. এইচ. রিসলে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৫৩। ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টার, *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল,* ভল্যুম ১, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, কলকাতা: ১৯৯৮, পৃ. ৫৩

৫৪। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম, ১৯৫৯, পৃ. ৬০৬-৬০৮

৫৫। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০১৮, কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ২৪

৫৬। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৫৭। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫৮। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৭৬, পৃ.১৯৫-৩১৬

৫৯। প্রদ্যুৎ কুমার মাইতি, *মেদিনীপুর: ধর্ম, উৎসব ও মেলা,* তমলুক: পুর্বাদ্রি প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৩৩

৬০। প্রদ্যুৎ কুমার মাইতি, *মেদিনীপুর: ধর্ম, উৎসব ও মেলা,* তদেব, পৃ. ৩৪

৬১। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৬২।পঞ্চানন মণ্ডল(সম্পা.), *পুঁথি পরিচয়,* তৃতীয় খণ্ড, শান্তিনিকেতিন: বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ. ১০৩-১০৭; প্রদ্যুৎ কুমার মাইতি, *মেদিনীপুর: ধর্ম, উৎসব ও মেলা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৬৩। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৬৪। গোপালকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৬৫। সমরেন্দ্র দাস চৌধুরি, *কৈবর্ত সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: কৌস্তভমণি পাবলিকেশন, পৃ. ১৮৬-১৮৮

৬৬। শংকর প্রসাদ দে, *জেলেপাড়ার সঙ,* কলকাতা: হিন্দুস্থান উড ক্রাফটস, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১

৬৭। শংকর প্রসাদ দে, *জেলেপাড়ার সঙ,* তদেব, পৃ. ১

৬৮। শংকর প্রসাদ দে, *জেলেপাড়ার সঙ,* তদেব, পৃ. ৪

৬৯। শংকর প্রসাদ দে, *জেলেপাড়ার সঙ,* তদেব, পৃ. ৪৫

৭০। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩

৭১। স্বামী সারদানন্দ, রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ, চৌদ্দতম সংস্করণ, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৫২; রূপ কুমার বর্মন, *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস, ২০১৯, পৃ. ১৬১

৭২। চিত্ত মণ্ডল ও প্রথমা মণ্ডল (সম্পা.) *বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: বিজয়কৃষ্ণ দাস, ২০০৩, ভূমিকা, পৃ. ৩

উপসংহার

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৈবর্ত জাতির অবস্থান (১৯৪৭-২০০০)

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৈবর্ত জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থান কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে যে জাতি নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, স্বাধীনতার পরে এই জাতির মধ্যে আর সংঘবদ্ধতা দেখা গেল না। তার কারণ বিশ্লেষণ করা এখানে জরুরি। তবে তার আগে দেখে নেওয়া দরকার স্বাধীনতা পরবর্তীতে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সরকারি পদক্ষেপ কিভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে সরকারি পদক্ষেপ ও বিভিন্ন কমিশন

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে ভারতীয় সংবিধানে ৩৪০ ধারায় সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেনীর জন্যে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। তাই ২৯ জানুয়ারি ১৯৫৩ সালে প্রথম অনগ্রসর শ্রেনীর কল্যাণের জন্য কমিশন গঠিত হয় রাষ্ট্রপতির আদেশে। সমাজের অবহেলিত ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদদের জন্যে এই কমিশন হয়। এই কমিশনের দায়িত্বে ছিলেন কাকা কালেলকর। তিনি রিপোর্ট জমা দেন ৩১ মার্চ ১৯৫৫ সালে। তিনি দেশে মোট ২৩৯৯ টি জাতিকে পিছিয়ে পড়া এবং ৮৩৭টি জাতিকে খুব বেশী পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে চিহ্নিত করেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও অনেক জাতি পিছিয়ে পড়া হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সরকার এই রিপোর্ট কার্যকর করেনি। পরবর্তী

সময়ে দ্বিতীয়বার কমিশন হয়। শ্রী নীলম সঞ্জীব রেড্ডি রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সেসময় মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তখন সংবিধানের ৩৪০ধারায় আবার একটি কমিশন গঠনের কথা বলা হয়। পার্লামেন্টে আলোচিত হয় ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৮ সালে। যার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন বিন্দেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডল। যা আমরা মণ্ডল কমিশন নামেই বেশী জানি। তিনি কাজ শুরু করেন ২১ মার্চ ১৯৭৯ সালে। তিনি রিপোর্ট জমা দেন ১২ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন। মণ্ডল কমিশন মোট ৩৭৪৩টি জাতিকে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে। এখানেও চাষী কৈবর্ত এবং মাহিষ্য এর অন্তর্ভূক্ত থাকে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে। কিন্তু কার্যকর হতে অনেক সময় লাগে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের আদেশে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা গঠনের কথা বলা হলে সে আদেশ কার্যকরী হয় ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে। গঠিত হয় ন্যাশনাল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (NCBC) নামে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। সেই সংস্থার শাখা প্রতিটি রাজ্যে স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চেষ্টায় অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সারা দেশে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নের যে রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছিল তাকেই কাজে রূপান্তরিত করতে গিয়ে চালু করা হয় সংরক্ষন প্রথা। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতির জন্য বিভিন্ন কমিশন গঠিত হলেও সাতের দশকে বি.পি. মণ্ডলের নেতৃত্বে যে কমিশন হয়েছিল। সেখানে সারা ভারতের মোট ১৭৭ টি জাতিকে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেইমতো বিভিন্ন রাজ্যে অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে একটি বিভাগ খোলা হয় সংরক্ষন প্রথা

চালু করার জন্যে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ১ আগস্ট ১৯৮০ সালের মণ্ডল কমিশন এর সুপারিশ মেনে নেন ১৯৯০ সালে ভারতীয় সংবিধানের ১৫(৪), ১৬(৪), ২৯(২) ধারা অনুযায়ী। কিন্তু কথা হল ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছর মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ মেনে নেওয়া হয়নি কেন তার বিশদ কারণ জানা যায়নি। তবে সরকারের এই অনীহার কারণে বহু দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করল ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রী ভি.পি.সিং এর আমলে। ১৯৯৩ সাল থেকে চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসদের জন্যে কমিশন গঠন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর তা আইনে রূপান্তর ও কার্যকরী হতে আরো অনেকটা সময় লেগে যায়। পশ্চিমবাংলার বিধানসভাতেও এনিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে ডেপুটি স্পীকার অনিল মুখার্জী বলেন : 'Now discussion under Rule 185 regarding steps taken by State Government for acceptance of recommendation of Mondal Commission about reservation of jobs for other backward classes as per decision of the Supreme Court.'[১] তারপর বিরোধী নেতা মানস ভুঁইয়া মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ও সকলের কাছে এব্যাপারে মুভ করেন এবং উত্থাপন করেন।[২] তিনি বলেন রাজ্যে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্যে ২০ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম দিকে বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গে কোন ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস নেই। অবশেষে অশোক কুমার সেনের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলাতেও ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার বিভাগ খোলা হয় ১৯৯৭ সালে। সে খবর কলকাতা গেজেটে প্রকাশিত হয়।[৩] তেমনই কেন্দ্রীয় সরকারের অনগ্রসর তালিকাতেও চাষী কৈবর্ত

জাতিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় তালিকায় এই জাতির ক্রম ৫৪ নম্বরে। আর তা আমরা দেখতে পাই ভারত সরকার প্রকাশিত গেজেটে।[৪]

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতিকল্পে সরকারি প্রচেষ্টা ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগে সহায়তার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সংগঠন ও জাতি সংগঠনগুলি অনগ্রসর শ্রেণীর বিভিন্ন দাবিদাওয়া পূরণে ও উন্নতিকল্পে তাদের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সরকারকে সজাগ ও সঠিক পথে চলতে বাধ্য করে চলেছে। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি নিরন্তর তাদের 'মাহিষ্য সমাজ' পত্রিকার মাধ্যমে জাতির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই তাঁরা নারী জাতির শিক্ষা ও উন্নয়নে বিশেষ তৎপর থেকেছে। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির শাখা বাংলার প্রায় প্রতিটি জেলাতেই কাজ করে চলেছে। মেদিনীপুর জেলাতেও এই সমিতির শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। তবে সকলেই নিজেদের সীমিত চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। একইভাবে এ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত্ত কমিউনিটি নামের অপর একটি জাতি সংগঠন রয়েছে।[সংযোজনী লিফলেট, পৃ.   দ্রষ্টব্য] যাদের রেজিস্টার্ড অফিস ১৩ নং রাণী রাসমনি রোড, জানবাজার, কলকাতা। অর্থাৎ রাণী রাসমনির বাড়ীর ঠিকানাতেই। এই সংগঠনেরও বিভিন্ন জেলায় শাখা রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজেদের মতো করে দাবী দাওয়া নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সেরকম নদীয়া জেলার একটি প্রচার পুস্তিকায় জাতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী সহ নিজেদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। [সংযোজনী লিফলেট, পৃ.   দ্রষ্টব্য] আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ডায়মন্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজ নামের সরকার নথিভুক্ত একটি জাতি সংগঠন রয়েছে। তারা শুধু জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বাংলার বিভিন্ন জেলায় শাখা স্থাপনের উদ্দেশ্যে সভা সমিতি করে চলেছে। বিভিন্ন সময়ে রাজ্য

সম্মেলনের আয়োজন করেছে। রাজ্য সম্মেলনে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন করা হয়। সেই প্রচারপুস্তিকা এখানে যুক্ত করলাম। [সংযোজনী লিফলেট, পৃ. দ্রষ্টব্য] সেরকমই বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ নামের জাতি সংগঠনটিও যথেষ্ট তৎপর ছিল। তাঁরা ১৯৯৭ সালে বাংলার চাষী কৈবর্তদের অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে ঘোষণার দাবীতে সরকারি অফিসে বিভিন্ন চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতে দেখা যায়। [সংযোজনী চিঠি, পৃ. দ্রষ্টব্য]]। স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশভাগের কারণে পশ্চিমবাংলায় উদ্বাস্তুজনিত সমস্যা একটা বড়ো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ব বাংলা থেকে বহু মানুষ বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দু শরণার্থীদের দল এখানে ভীড় করেছিল। সেই উদ্বাস্তুদের ইতিহাস এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই উদ্বাস্তুদের মধ্যে নমঃশূদ্র, কৈবর্ত সহ বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল যারা এই অসহায়তার শিকার হয়েছিলেন। আর এদের পুণর্বাসন দেওয়া খুব একটা সহজ কাজ ছিল না।

আমরা যদি স্বাধীনতা পরবর্তী কালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো মেদিনীপুরের অনেক কৈবর্ত নেতা বিধানসভা বা লোকসভার সদস্য হয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৫২ সালের লোকসভার প্রথম নির্বাচনে মেদিনীপুরের কংগ্রেসের টিকিটে তমলুক থেকে সতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং কাঁথি থেকে বসন্ত কুমার দাস জয়ী হন। বিখ্যাত এই দুই কৈবর্ত সন্তান স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালেও তমলুক আসন থেকে সতীশ চন্দ্র সামন্ত বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে দ্বিতীয়, তৃতীয়বারের জন্য এবং ১৯৬২ সালে কাঁথি থেকে বসন্ত কুমার দাস দ্বিতীয়বারের জন্য জয়লাভ করেন। আর ১৯৬৭ সালের চতুর্থ লোকসভার নির্বাচনে মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে শচীন্দ্র নাথ মাইতি

এবং তমলুক থেকে বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে পুনরায় সতীশ চন্দ্র সামন্ত জয়লাভ করেন। ১৯৭১ সালের পঞ্চম লোকসভার নির্বাচনে তমলুক থেকে সতীশ চন্দ্র সামন্ত এবং ১৯৭৭-এ লোকসভার ষষ্ঠতম নির্বাচনে জনতা দলের টিকিটে পাঁশকুড়া থেকে আভা মাইতি এবং তমলুক থেকে সুশীল কুমার ধাড়া জয়লাভ করেন। ১৯৮০ সালের সপ্তম লোকসভা নির্বাচনে কাঁথি থেকে অধ্যাপক সুধীর কুমার গিরি এবং ১৯৮৯-এ নবম, ১৯৯১-এ দশম এবং ১৯৯৬ সালের একাদশতম লোকসভার নির্বাচনেও কাঁথি থেকে ভারতের কমিউনিস্ট দলের(মার্ক্সবাদী) টিকিটে অধ্যাপক সুধীর কুমার গিরি বার বার নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে কাঁথি কেন্দ্র থেকে অধ্যাপক সুধীর কুমার গিরি এবং তমলুক থেকে লক্ষণ শেঠ নির্বাচিত হন। এপর্যন্ত অনেকেই এই জাতির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আলাদা করে সমগ্র কৈবর্ত জাতির জন্য কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বলেই মনে হয়। কেননা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের দলীয় নির্দেশে চলতে হয়েছে। তবে ১৯৯০ এর দশক থেকে বাংলার ঐতিহাসিকেরা তপশিলি ও জাতি রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। এসময়ে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু, রূপকুমার বর্মণ, মনোশান্ত বিশ্বাস প্রমুখ অবিভক্ত বাংলায় তপশিলি জাতিগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেছেন।[৫] তাই একবিংশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনীতিতে জাতি রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতে চলেছে।

আবার অন্যদিকে বঙ্গীয় বিধান সভার ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট থেকে বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। পরের বছর ১৯৪৮ থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন বিধান চন্দ্র রায়। তিনি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকেন। যদিও ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে সংবিধান রচিত হলে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে পশ্চিমবাংলার প্রথম সাধারণ

নির্বাচন হয় ১৯৫২ সালে। বিধান চন্দ্র রায় ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। পরে ১৯৬২ সালে মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ১৯৬৭ সালে বাংলা কংগ্রেস থেকে অজয় কুমার মুখার্জী, এবং নভেম্বর ১৯৬৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ পর্যন্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ পর্যন্ত এক বছররের বেশি সময় বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারী থাকে। পুনরায় ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এর পঞ্চম বিধানসভা নির্বাচনে অজয় কুমার মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। তার মাঝে ১৯ মার্চ ১৯৭০ থেকে ২ এপ্রিল ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চলেছিল। কিছুদিনের জন্যে ষষ্ঠ বিধানসভা নির্বাচনে অজয় কুমার মুখার্জী মুখ্যমন্ত্রী হন। আবার কিছুদিনের মধ্যে ২৮ জুন ১৯৭১ থেকে ১৯ মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত বাংলায় পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসন চলেছিল। ১৯৭২ এর সপ্তম বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থ শংকর রায়। তার মেয়াদ শেষ হতে না হতেই পুনরায় ৩০ এপ্রিল ১৯৭৭ থেকে ২১ জুন ১৯৭৭ পর্যন্ত বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন চলেছিল। তারপর থেকে বাংলায় কিছুটা হলেও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা আসে। এরপর ১৯৭৭ সালের অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন থেকে একটানা ২০০০ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন। ২০০১ সালের ত্রয়োদশ বিধানসভা নির্বাচনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল ছিলেন। এই সময়কালে মেদিনীপুর জেলা থেকে অনেকেই কৈবর্ত পরিবারের হলেও তাঁরা আলাদা করে এই জাতির উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী হতে পারেন নি। আসলে প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির কাছে তার নিজের জাতির উন্নয়ন অপেক্ষা দলীয় নির্দেশ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়।

এখন আমরা কৈবর্ত জাতি থেকে উদ্ভূত মাহিষ্য নামে পরিচিতদের সঙ্গে কৈবর্তদের চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ চাষী কৈবর্তদের মধ্যেকার বিবাদ বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনায় চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য আদৌ ভিন্ন না কি একই জাতির বিভিন্ন নাম সেটাই দেখার চেষ্টা করব ।

চাষী কৈবর্ত ও মাহিষ্য বিতর্ক

জাতি ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় থাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জাতিব্যবস্থার মধ্যে উর্দ্ধাভিমুখী গতিময়তার সম্ভাবনা। তবে এই ধরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিল পেশার পরিবর্তন ও জাতির জটিল থাকবিন্যাসে বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক সামঞ্জস্যের নবিকরণ এবং সেইসাথে শুচিতার উচ্চতর মাত্রায় চিহ্নিত উচ্চতর আচারভিত্তিক পদমর্যাদার দাবির স্বপক্ষে গোটা সমাজের বিশেষত ব্রাহ্মণদের সম্মতি অর্জনের প্রশ্ন।[৬] আর হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে এই বিরামহীন পরিবর্তনের একটা প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সেটা প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় হিন্দু জাতির মধ্যে নূতন নূতন জাতি ও শ্রেণিসমূহের উদ্ভব ঘটছে। অন্যদিকে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংসের সাথে সাথে জাতিভেদ প্রথা শুদ্ধতা অশুদ্ধতার মতো উপরিকাঠামোগত ধারণায় পর্যবসিত হয়ে পড়ল। বিভিন্ন জাতির অভ্যন্তরে সামাজিক সম্পর্কের আদর্শগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। এই অবস্থায় নীচু জাতিগুলির প্রতি আচারগত অসাম্য একটি সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা দিল। আর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চতর জাতিগুলি নিজেদের আচারভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিল। উনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথমদিকে বাংলাদেশে হালিক কৈবর্তেরা মাহিষ্য নামে নিজেদের

পরিচয় দিতে থাকেন। নিজেদের সমাজের উচ্চ জাতির সমতুল্য বা বর্ণহিন্দুদের সমতুল্য ভাবতে শুরু করেন। ১৮৯৭ সালে মেদিনীপুরের কৈবর্ত জাতির কিছু জমিদার ঐক্যবদ্ধ হয়ে নরহরি জানার উদ্যোগে নন্দীগ্রামের তাজপুরে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সমাজে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা। অথবা বর্ণহিন্দুদের সমতুল মর্যাদা আদায়ের জন্যে নিজেদের উন্নীত করার আন্দোলন গড়ে তোলা। সেজন্য তারা একটি জাতি নির্ধারণী সভায় মিলিত হন। এই জাতি নির্ধারণী সভা থেকে ঠিক করা হয় যে এখন থেকে চাষী কৈবর্তরা মাহিষ্য নামে পরিচিত হবেন। সেইমতো কর্মসূচী গ্রহণ ও প্রচারকাজ চালাতে হবে। আর সেই প্রচারকাজ চালানোর জন্যে 'মাহিষ্য সমাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার কথা বলা হয়। যদিও পরের দিকে তা মাসিক পত্রিকা হয়ে যায়। এই পত্রিকার প্রচারের মাধ্যমে চাষী কৈবর্ত সমাজ সচেতন হয়ে মাহিষ্য নামে পরিচিতি লাভ করবে। সেই আলোচনা মতো ১৯০১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি। এই চাষী কৈবর্ত সমাজের উন্নত অংশ নিজেদের 'মাহিষ্য' উপাধি গ্রহণ করতে ঘোরতর আন্দোলন সংঘটিত করে এবং সেইসঙ্গে তারা নানা স্থানে সভা-সমিতি, বক্তৃতা, তর্ক-বিতর্ক, পণ্ডিতদের কাছে বিচার্য বিষয় করেছেন। একইসঙ্গে বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রকাশ করে পণ্ডিত সমাজে ও জনসাধারণের কাছে বিতরণ ও বিক্রয় করে জনসাধারণের মনে জায়গা করার চেষ্টা করেছেন। এইভাবে সারা বাংলা জুড়ে চলেছে প্রচারকাজ। বাংলার বিভিন্ন জেলায় নেতৃবৃন্দ ঘুরে ঘুরে সভা সমিতি, প্রচারপত্র বিলি, পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করে সমাজের মানুষকে জাত্যাভিমানের কথা আলোচনা করেন। তারা বাংলার সেন্সাস কমিশনারের কাছেও আবেদন জানান। কিন্তু কাজ বিশেষ না হওয়ায় নেতৃবর্গ অভিজাত সমাজ ও পণ্ডিতবর্গের মতামত আহ্বান করেন। এমনকি

সংস্কৃত শাস্ত্র পর্যালোচনা করেন। মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় বিভিন্ন ধরণের লেখা প্রকাশিত হয় বাংলার চাষী কৈবর্ত সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্যে। এদিকে জেলিয়া কৈবর্তরাও মাহিষ্য হওয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি এর প্রবল বিরোধিতা করেন। এই সমিতি সমাজের নারী জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার আবেদন জানিয়ে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রবন্ধ লেখেন **১৯০১** সালে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় থেকেই। সেক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হল এই হালিক কৈবর্তেরা হলচালনা করে বা চাষাবাদ করে। অর্থাৎ মহীকে (ভূমি; পৃথিবী) লাঙ্গল দ্বারা বিদারণ করে যারা তাদের মাহিষ্য নামে ডাকা যায়। এক্ষেত্রে মাহিষ্য অর্থে কৃষিজীবি কৈবর্ত জাতিকেই বোঝায়। সময় সম্পাদক বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম.এ, লিখেছেন – 'হালিক কৈবর্ত্তদিগের বিশেষ উপাধি মাহিষ্য।' পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তার *সম্বন্ধ নির্ণয়* গ্রন্থে বলেছেন 'চাষীকৈবর্ত্তকূল বৈশ্য (মাহিষ্য)'। আবার নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভুবনমোহন ন্যায়রত্ন ও ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখেছেন 'মাহিষ্যরা বৈশ্য।' *বর্ধমান প্রচারিকা* সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন – 'রাণী রাসমণি, দেওয়ান রূপরাম, তমলুকের রাজবংশ, ময়নার রাজবংশ, তুর্ফার রাজবংশ, প্রভৃতি হালিক কৈবর্ত জাতি হইতে উৎপন্ন।'[৭] বিশ্বকোষ প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন– 'চাষী কৈবর্ত্তজাতীয় রাজাগণ বহুকালব্যাপিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন।' *বেঙ্গলী* সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন – 'এখনকার সমাজে কৈবর্ত্তদের প্রতিপত্তি দিনে দিনে বর্ধিত হইতেছে।'[৮] কলকাতার *ইংলিশম্যান* নামে ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে পণ্ডিত ভুবনানন্দ ব্রহ্মচারী লিখেছেন – 'কৈবর্তদিগের আন্দোলন ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিতেছি।....ইহারা *মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি* নামে সাপ্তাহিক সমাচারপত্র এবং সেবিকা নামে মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতেছে। বঙ্গদেশের নানা স্থানে সভা ও

সমিতি বসিয়াছে, বক্তৃতা হইতেছে, ... পুস্তকাদির প্রচার হইতেছে ..... বঙ্গদেশের প্রত্যেক জাতি যদি আপনাপন সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখে এবং জাতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ আন্দোলন করে তাহা হইলে হিন্দুসমাজের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত করা সহজ হইয়া উঠে। সমগ্র জাতিরও ইহাতে কল্যাণ হয়।'[৯] এইভাবে বহু পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সরকারি কর্তৃপক্ষের মন জয় করেন। শেষ পর্যন্ত বাংলার সেন্সাস কমিশনার সমিতিকে চিঠি দিয়ে জানায় যে তারা এই নামে পরিচিত হতে পারবে। কিন্তু ১৯১১ সালের সেন্সাসে তা নথিভুক্ত হল না। অবশেষে ১৯৩১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে বাংলার এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির পরিচয়ে চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) উল্লেখ করা হল।[১০] ১৮৭২ সালের হান্টারের *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল* গ্রন্থে কোথাও মাহিষ্য জাতির উল্লেখ নেই। কিন্তু কৃষিজীবী হিসাবে কৈবর্ত এবং মৎসজীবী হিসাবে জেলিয়া কৈবর্তের উল্লেখ রয়েছে।[১১] আবার বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার মেদিনীপুর রিপোর্টে ও'মেলি লিখেছেন- 'Nearly all are cultivating Kaibarttas or Mahishya and only a small minority are fishing Kaibarttas or Jelias, who occupy a very low position in the social scale'.[১২] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত আম্বেদকর রচনাবলীতে চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (বাংলায়) দেওয়া আছে ২৩,৮১,২২৬ জন।[১৩] এখানে সরকারি তরফে পুনরায় স্বীকার করা হয়েছে যে মাহিষ্য কোন আলাদা জাতি নয়, তা আসলে কৈবর্তদেরই একটি অংশ। তা সে যে নামেই পরিচিত হোক না কেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা গঠিত কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CRI) এর চিঠিতেও স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে কৈবর্তদের তিনটি গ্রুপ রয়েছে, যার একটি হল কৈবর্ত অথবা মাহিষ্য।[সংযোজনী চিঠি, পৃ. দ্রষ্টব্য] বিংশ শতকের শেষের দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্যে যে কমিশন হয় সেখানে সপ্তম রিপোর্টের ২৪ নং এ বলা হয়েছে যে – 'The opinion that the Chasi-Kaibartta class constitutes a backward class in the state, though the class Mahishya born and grown out of Chasi-Kaibartta class may have considerably advanced ….'. [১৪] একইসঙ্গে এই রিপোর্টের অন্যত্র বলা হয় যেখানে সারা ভারত মাহিষ্য মহাসভার পক্ষে বলা হয়েছে মাহিষ্যরা আসলে বাংলার কৈবর্তরাই। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে – 'The Commission noted that in support of the claim for inclusion of the Mahishya class in the list of Backward Classes of the State, oral and documentary evidence have been furnished. Shri Indu Bhusan Roy, the Chairperson of All India Mahishya Mahasabha and Shri Phani Roy, Vice-President of All India Mahishya Mahasabha gave evidence on oath. They made the submissions that the 'Mahishyas' were originally known as 'Kaibarttas' in Bengal.' [১৫] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর কল্যাণ বিভাগ ১৯৯৫ সালে ২ নভেম্বরের এক চিঠিতে মাহিষ্য কল্যাণ সমিতির সম্পাদককে লেখেন – 'for hearing inclusion of the class – 'Hele/Helia/Chasi-Kaibartta(Mahishya)'. [সংযোজনী চিঠি, পৃ. দ্রষ্টব্য] অর্থাৎ কমিশন ভালো করেই জানতেন যে মাহিষ্য আলাদা কোন জাতি নয়। যদিও কেন্দ্রের মণ্ডল কমিশনে ৪২ নম্বরে চাষি কৈবর্ত এবং ১৩১ নম্বরে মাহিষ্য নাম থাকা সত্ত্বেও। অতি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে জানা যায় যে কোন ব্যক্তি তাঁর পদবি বা ধর্ম পরিবর্তন করলেও তাঁর জাতি পরিবর্তন করা যায় না। এমনকি মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি রায়ের মাধ্যমেও তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। [সংযোজনী

সংবাদপত্রের অংশ, পৃ. দ্রষ্টব্য] এইভাবে বিভিন্ন তথ্যের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে মাহিষ্যরা নতুন নামে পরিচিতি পেলেও তাঁরা আসলে কৈবর্তদের থেকে ভিন্ন নয়। উভয়েই একই জাতির অন্তর্ভূক্ত। আর কৈবর্তরা যে যোদ্ধা জাতি সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্য দেশ থেকে দরায়ুস এবং তার সেনাপতি স্কাইলাক্স ভারত আক্রমণ করেন। তাঁরা কৈবর্ত জাতিকে ক্ষত্রিয়ের কাজ করতে দেখেছিলেন।[১৬]

যদিও কৈবর্ত জাতির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ যৌথ আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র কৈবর্ত জাতির বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ে বা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নি। বাংলায় কৈবর্তদের জেলেরা আগেই তপশিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে আর কৈবর্তদের অপর একটি অংশ যারা কৃষিকাজে নিযুক্ত অর্থাৎ চাষী কৈবর্তরা ১৯৯৭ সালে অনগ্রসর শ্রেণীর মর্যাদা পেয়েছে হেলে/হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত এই নামে। কিন্তু কৈবর্তদের যে অংশ প্রলোভনে পড়ে মাহিষ্য নামে পরিচিতি লাভ করেছে তারা সংরক্ষণের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। যদিও মাহিষ্য আর চাষী কৈবর্ত মূলত কৈবর্ত জাতিরই অংশ। শোনা যায় গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠিত মাহিষ্য নামধারী মানুষের বিরোধীতাতেই মাহিষ্যদের অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্তি আটকে যায় বিচারপতি এ. এন. সেন কমিশনের শুনানিতে। সেখানে রীতিমতো হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল।[সংযোজনী সংবাদপত্রের অংশ, পৃ. দ্রষ্টব্য]। যদিও ১৯৯৫ সালে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির পক্ষ থেকে মাহিষ্যদের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। তা ৩০ মার্চ ১৯৯৫ খবরে প্রকাশিত হয় এবং তার পরে আবার ৭ এপ্রিল বর্তমান পত্রিকায় সেই সংবাদ বেরোয়। [সংযোজনী সংবাদপত্রের অংশ, পৃ. দ্রষ্টব্য] যাই হোক বিংশ শতকের শেষার্ধে বিশেষত

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জাতিচেতনার(caste) এর বদলে শ্রেণীচেতনার(class) ধারণা গ্রথিত হওয়ায় বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে জাতি আন্দোলনের গতি শ্লথ হয়ে যায়। সেজন্যই কৈবর্ত জাতির কোন জননেতা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হয়ে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর মধ্যে সেই স্বজাতি চেতনা জাগ্রত হয়নি বা এই জাতির উন্নয়নের কথা তার কণ্ঠে বিশেষ শোনা যায়নি। যদিও একবিংশ শতকে পুনরায় বাংলা তথা সারা দেশব্যাপী জাতি আন্দোলন মাথাচাড়া দিলে কৈবর্ত জাতির মধ্যেও বিশেষত চাষী কৈবর্ত জাতির বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে ও সারা বাংলায় আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। সেইসঙ্গে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতিও মাহিষ্য জাতিকে অনগ্রসর জাতি হিসাবে যুক্ত করতে দাবী জানাতে থাকে। আগামী দিনে এই আন্দোলন যৌথভাবে আরো সক্রিয় হলে এবং সমস্ত কৈবর্ত সমাজের মানুষ একত্রিত হলে বাংলার রাজনৈতিক আঙিনায় কৈবর্ত জাতির ক্ষমতালাভের পুনরাবৃত্তি ঘটবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

সূত্রনির্দেশ:

১. ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেমব্লি প্রোসিডিংস, অফিসিয়াল রিপোর্ট, ভল্যুম -১০৩, নং-১, ১৯৯৪, পৃ. ৯৯৪

২. ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেমব্লি প্রোসিডিংস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৪

৩. গভর্ণমেণ্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নং – ১০৫৪-বি.সি.ডব্লিউ/ইসি/এম.আর/৩০২/৯৭, *ক্যালকাটা গেজেট*, ৬ নভেম্বর, ১৯৯৭

৪. *ইন্ডিয়া গেজেট*, নং- ১২০১১/৪৪/৯৯/বি.সি.সি, গভর্ণমেণ্ট অফ ইন্ডিয়া, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০

৫. রূপকুমার বর্মন, *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক,* কলকাতা:অ্যালফাবেট বুকস,২০১৯,পৃ.৩৫

৬. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, *সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস, (সোশ্যাল মোবিলিটি ইন বেঙ্গল* থেকে বঙ্গানুবাদ মনস্বিতা সান্যাল), কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০১৫, পৃ. ১৮

৭. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, মেদিনীপুর: মহেন্দ্রনাথ দাস, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৮

৮. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, তদেব, পৃ ৪৮

৯. ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, তদেব, পৃ ৪৯

১০. সেন্সাস রিপোর্ট ১৯২১

১১. সেন্সাস রিপোর্ট ১৮৭২, *এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল,* ভল্যুম ৩, পার্ট-২, পৃ. ৩৮

১২. এল.এস.এস.ও'মেলি, *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স মেদিনীপুর, (১৯১১)* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সংস্করণ ১৯৯৫, পৃ. ৭০

১৩. আম্বেদকর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দিল্লী: ভারত সরকার, পৃ. ২২৮

১৪. ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, সেভেনথ রিপোর্ট, পয়েন্ট নং- ২৪, ১৯৯৭

১৫. ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস, সেভেনথ রিপোর্ট, পয়েন্ট নং- ২৪, ১৯৯৭

১৬. *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১ শ্রাবণ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ; ধর্মানন্দ মহাভারতী, *মাহিষ্যসিদ্ধান্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

সংযোজনীসমূহ

সংযোজনী-১

বাংলার বিভিন্ন জাতিসমূহের নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ:

জাতি	শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মি: মি:
ব্রাহ্মণ	৭৮.৮	৭০.৮	১৬৭৬
সদগোপ	৭৮.৬	৭৪.১	১৬৩৩
কৈবর্ত	**৭৭.৫**	**৭৬.৬**	**১৬২৯**
রাজবংশী	৭৫.৭	৭৬.৯	১৬০৭
পোদ	৭৭.৮	৭৬.৪	১৬২৫
গোয়ালা	৭৭.৩	৭৬.৬	১৬৪৬
বাগদি	৭৬.৪	৮০.৮	১৬০৩
বাউরী	৭৫.১	৮৪.৩	১৫৮৫
চণ্ডাল	৭৮.১	৭৪.১	১৬১৯

সংযোজনী-২

বাংলার বিভিন্ন জাতিসমূহের গড় নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ:

জাতি	শির-সূচক সংখ্যা	নাসিকা-সূচক সংখ্যা	দেহ-দৈর্ঘ্য মি: মি:
ব্রাহ্মণ	৭২-৮৭	৫৬-১০০	১৫৫০-১৭৩৪
সদগোপ	৭২-৮৭	৫৪-৯৫	১৫১০-১৭৮০
কৈবর্ত	**৭২-৮৭**	**৬৩-১০৩**	**১৪৯০-১৭৭৬**
পোদ	৭০-৮৫	৬৩-৯১	১৪৩০-১৭৭০
গোয়ালা	৭২-৮৭	৬৩-১০০	১৫১০-১৮৩০
বাগদি	৬৮-৮৩	৬২-১০০	১৪৩৪-১৭২২
চণ্ডাল	৭০-৮৯	৬২-৮৯	১৪০২-১৭৩৪

<u>সংযোজনী-৩</u>

মেদিনীপুর জেলার মানচিত্র

Figure সূত্র: বসন্ত কুমার দাস, স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, প্রথম খণ্ড, মানচিত্র পাতা

সংযোজনী- ৪

তাম্রলিপ্ত সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী'

তাম্রলিপ্ত সরকারের মুখপত্র 'বিপ্লবী'তে প্রকাশ

‘তমলুকে নবযুগ

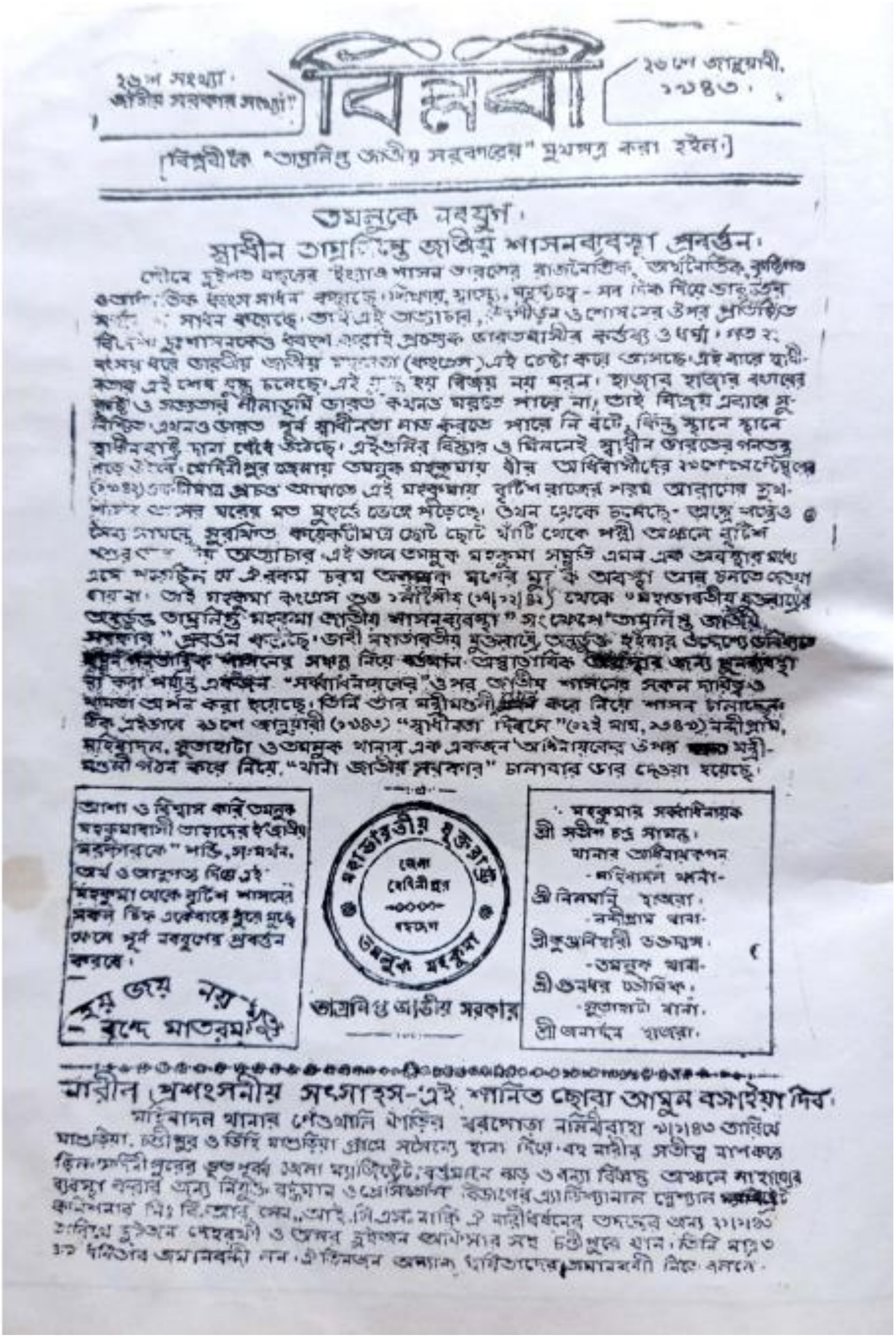

২৬শে সংখ্যা। "জাতীয় সরকার সংখ্যা"

বিপ্লবী

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৩।

[বিপ্লবীকে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের" মুখপত্র করা হইল।]

তমলুকে নবযুগ।

স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন।

পৌনে দুইশত বছরের ইংরাজ শাসন ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস সাধন করেছে। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, মনুষ্যত্ব - সব দিক দিয়ে ভারতের [illegible] সাধন করেছে। তার এই অত্যাচার, [illegible] ও শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিদেশী দুঃশাসনকে ধ্বংস করাই প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য ও ধর্ম। গত [illegible] বৎসর ধরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেস) এই চেষ্টা করে আসছে। এই বারে স্বাধীনতার এই শেষ যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধে হয় বিজয় নয় মরণ। হাজার হাজার বছরের কৃষ্টি ও সভ্যতার লীলাভূমি ভারত কখনও মরতে পারে না, তাই বিজয় এবারে সুনিশ্চিত। এখনও ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে স্বাধীনরাষ্ট্র দানা বেঁধে উঠেছে। এইগুলির বিস্তার ও মিলনেই স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র গড়ে উঠবে। মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমায় বীর অধিবাসীদের ২৯শে সেপ্টেম্বরের (১৯৪২) অভিযানের প্রচণ্ড আঘাতে এই মহকুমায় বৃটিশ রাজের শয়তানী আমলাতন্ত্রের দুঃশাসন [illegible] ঘরের মত মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়েছে। তখন থেকে চলছে- অস্ত্রে শস্ত্রে সৈন্য সামন্তে সুরক্ষিত কয়েকটীমাত্র ছোট ছোট ঘাঁটি থেকে পল্লী অঞ্চলে বৃটিশ [illegible] অত্যাচার এই ভাবে তমলুক মহকুমা সম্প্রতি এমন এক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল যে ঐ রকম চরম অরাজক মগের মুল্লুক অবস্থা আর চলতে দেওয়া যায় না। তাই মহকুমা কংগ্রেস গত ১৭ই পৌষ (১৭।১২।৪২) থেকে "মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তাম্রলিপ্ত মহকুমা জাতীয় শাসনব্যবস্থা" সংক্ষেপে "তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" প্রবর্তন করেছে। ভাবী মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনের সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমান অস্বাভাবিক [illegible] জন্য পুনর্ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত একজন "সর্বাধিনায়কের" উপর জাতীয় শাসনের সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। তিনি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী [illegible] করে নিয়ে শাসন চালাচ্ছেন। ঠিক এইভাবে ২৬শে জানুয়ারী (১৯৪৩) "স্বাধীনতা দিবসে" (১২ই মাঘ, ১৩৪৯) নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, সুতাহাটা ও তমলুক থানায় এক একজন 'অধিনায়কের' উপর [illegible] মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে নিয়ে "থানা জাতীয় সরকার" চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে।

আশা ও বিশ্বাস করি তমলুক মহকুমাবাসী তাহাদের "জাতীয় সরকারকে" শক্তি, সমর্থন, অর্থ ও আনুগত্য দিয়ে এই মহকুমা থেকে বৃটিশ শাসনের সকল চিহ্ন একেবারে মুছে দিয়ে পূর্ণ নবযুগের প্রবর্তন করবে।

জয় জয় নবযুগ
— বন্দে মাতরম —

মহাভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র
জেলা মেদিনীপুর
বঙ্গদেশ
তমলুক মহকুমা

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার

মহকুমার সর্বাধিনায়ক
শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্ত।
থানার অধিনায়কগণ
-মহিষাদল থানা-
শ্রী নীলমণি হাজরা।
-নন্দীগ্রাম থানা-
শ্রী কুঞ্জবিহারী ভক্তদাস।
-তমলুক থানা-
শ্রী গুণধর ভৌমিক।
-সুতাহাটা থানা-
শ্রী জনার্দন হাজরা।

নারীর প্রশংসনীয় দুঃসাহস - এই শানিত ছোরা আমূল বসাইয়া দিব।

মহিষাদল থানার [illegible] নারীনির্যাতন [illegible] তারিখে মাশুড়িয়া, চণ্ডীপুর ও [illegible] গ্রামে সৈন্যেরা হানা দিয়ে বহু নারীর সতীত্ব নাশ করে [illegible] মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্তমানে ঝড় ও বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যের ব্যবস্থা করার জন্য নিযুক্ত বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের এ্যাডিশ্যানাল স্পেশ্যাল [illegible] কমিশনার মিঃ বি. আর. সেন, আই. সি. এস. নারী ধর্ষণের তদন্তের জন্য [illegible] তারিখে দুইজন দেহরক্ষী ও অপর দুইজন অফিসার সহ চণ্ডীপুরে যান। তিনি [illegible] ধর্ষিতার জবানবন্দী নেন। ঐ তিনজন অন্যান্য ধর্ষিতাদের জবানবন্দী নিতে বললে -

সংযোজনী- ৫

বৃহদ্ধর্মপুরাণে বর্ণিত জাতির তালিকা

উত্তম সংকর শ্রেণীর ২০টি জাতি

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি/ উপবর্ণ	বংশগত বৃত্তি
১	করণ	লেখক / করণিক
২	অম্বষ্ঠ	চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদচর্চা
৩	উগ্র	ক্ষত্রিয় – যুদ্ধবিদ্যাই এদের ধর্ম
৪	মাগধ	স্থল ও জলপথে বাণিজ্য
৫	তন্ত্রবায়	তাঁতি, বস্ত্রবয়ন
৬	গান্ধিক বণিক	গন্ধদ্রব্য বিক্রেতা – গন্ধবণিক
৭	নাপিত	ক্ষৌরকর্ম ও বিবাহাদি কর্মে সহায়তা
৮	গোপ	লেখক
৯	কর্মকার	কামার
১০	তৈলিক বা তৌলিক	সুপুরি ব্যবসায়ী
১১	কুম্ভকার	কুমোর
১২	কংসকার	কাঁসারি
১৩	শাঙ্খিক	শাঁখারি

১৪	দাস বা চাষী	কৃষিকর্ম
১৫	বারজীবী বা বারুই	পানের বরজ ও পান উৎপন্ন
১৬	মোদক	ময়রা
১৭	মালাকার	বৃত্তির উল্লেখ নেই
১৮	সূত	বৃত্তির উল্লেখ নেই, তবে অনুমান অশ্বসারথি
১৯	রাজপুত্র	বৃত্তির উল্লেখ নেই, রাজপুত?
২০	তাম্বলী বা তামলী	পানবিক্রেতা

মধ্যম সংকর শ্রেণীর ১২টি জাতি

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি/ উপবর্ণ	বংশগত বৃত্তি
২১	তক্ষণ	খোদাইকর
২২	রজক	ধোপা
২৩	স্বর্ণকার	স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারক
২৪	সুবর্ণবণিক	সোনা ব্যবসায়ী
২৫	আভীর	গোয়ালা বা গোরক্ষক
২৬	তৈলকার	তেলি
২৭	ধীবর	মৎস্য ব্যবসায়ী

২৮	শৌণ্ডিক	শুঁড়ি
২৯	নট	নাচ, খেলা ও বাজী দেখায়
৩০	শাবাক/শাবার	কোলজাতি, বৃত্তি অনুল্লেখিত
৩১	শেখর	কোলজাতি, বৃত্তি অনুল্লেখিত
৩২	**জালিক/ কৈবর্ত**	জেলে, জালিয়া

অধম সংকর শ্রেণীর ৯টি জাতি

ক্রমিক সংখ্যা	জাতি/ উপবর্ণ	বংশগত বৃত্তি
৩৩	মলেগ্রাহী	বৃত্তি উল্লিখিত নেই
৩৪	বারুড়	বাউরি
৩৫	চর্মকার	চামার
৩৬	কুড়ব	বৃত্তি উল্লিখিত নেই
৩৭	তক্ষ	বৃত্তি উল্লিখিত নেই
৩৮	মল্ল	বর্তমানে মালো, বৃত্তি স্পষ্ট নয়
৩৯	চণ্ডাল	বৃত্তি উল্লিখিত নেই
৪০	ঘট্টজীবী	খেয়া পারাপার মাঝি, পাটনি
৪১	ডোলবাহী	ডুলি-বেহারা, বর্তমানে দুলে

সূত্র: নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* আদি পর্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০০ সন, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

সংযোজনী- ৬

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত জাতির তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	সৎ শূদ্র জাতি	ক্রমিক সংখ্যা	অসৎ শূদ্র জাতি
১	করণ	১	অট্টালিকাকার
২	অম্বষ্ঠ	২	কোটক বা গৃহ নির্মাণকারী
৩	বৈদ্য – চিকিৎসাবৃত্তি	৩	তীবর(ধীবর?)
৪	গোপ	৪	তৈলকার
৫	নাপিত	৫	লেট
৬	ভিল্ল	৬	মল্ল
৭	মোদক	৭	চর্মকার
৮	কুবর	৮	শুঁড়ি
৯	তাম্বুলী	৯	পৌণ্ড্রক (পোদ?)
১০	স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক	১০	মাংসচ্ছেদ-কসাই
১১	মালাকার	১১	রাজপুত্র
১২	কর্মকার	১২	**কৈবর্ত (কলিযুগের ধীবর)**
১৩	শংখকার	১৩	রজক
১৪	কুবিন্দক (তন্তুবায়)	১৪	কৌয়ালি
১৫	কুম্ভকার	১৫	গঙ্গাপুত্র
১৬	কংসকার	১৬	যুঙ্গি (যুগী?)
১৭	সূত্রধার	১৭	আগরী বা আগুরী
১৮	চিত্রকার		
১৯	স্বর্ণকার		

সূত্র: নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালি হিন্দুর বর্ণভেদ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২ সন, পৃ. ৯৩-৯৪।

সংযোজনী-৭

রানি রাসমণির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খাতা

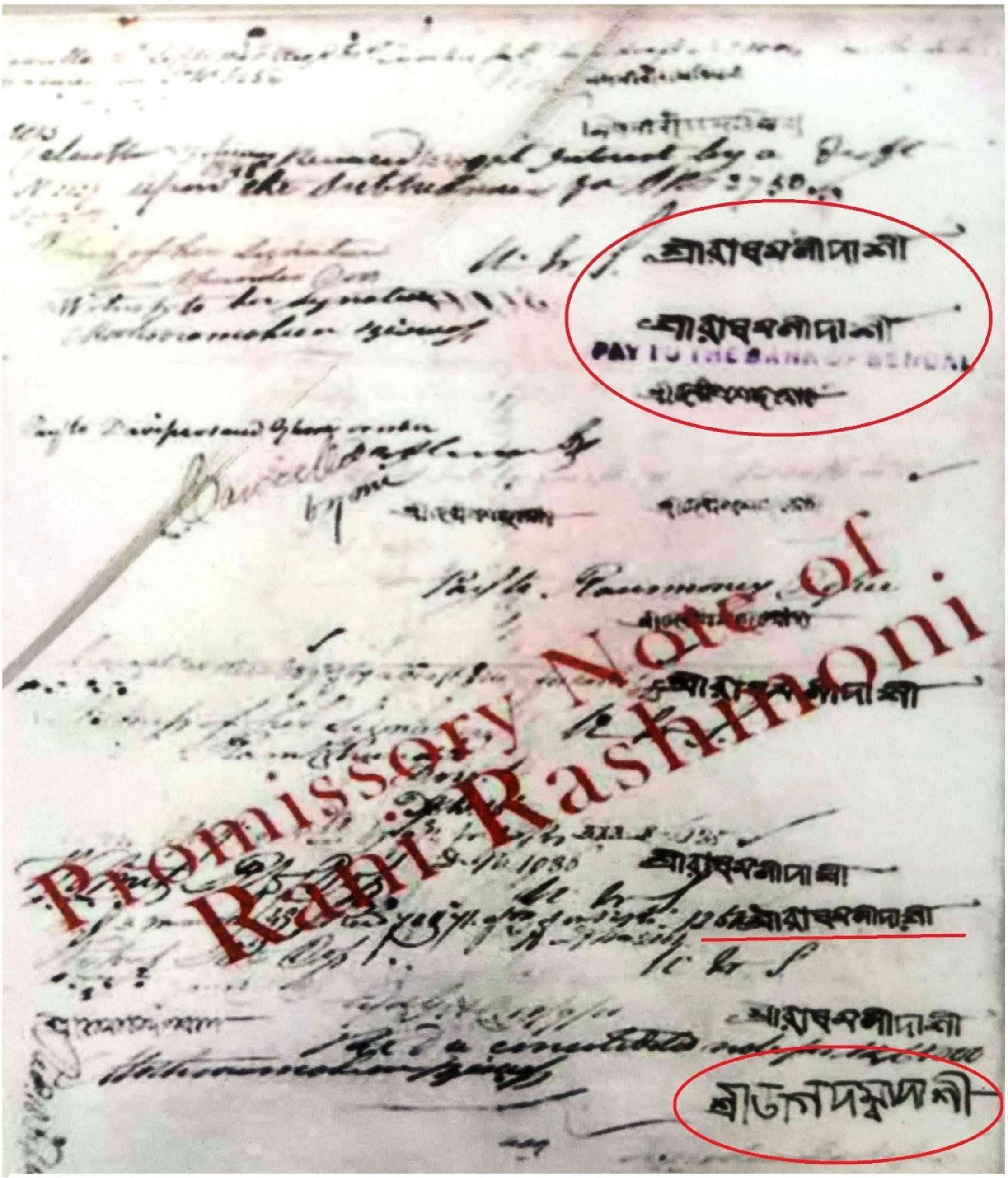

শ্রী রাষমনি দাশী, শ্রী জগদম্বা দাশী নামোল্লেখ ব্যাঙ্কের খাতায়। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কলকাতা শাখার আর্কাইভ থেকে সংগৃহীত।

সংযোজনী- ৮

রানি রাসমণির দেবোত্তর দলিলে 'দাশী' উল্লেখ

নকুলেশ্বর, পঞ্চম মন্দিরে নাকেশ্বর, সষ্ট মন্দিরে নির্য্যরেশ্বর ও ঐ চাঁদনীর দক্ষিণদিকে প্রথম মন্দিরে নরেশ্বর দ্রিতিয় মন্দিরে নন্দীশ্বর ত্রিতিয় মন্দিরে নাগেশ্বর চত্তর্থ মন্দিরে জগদীশ্বর পঞ্চম মন্দিরে জলেশ্বর সষ্ট মন্দিরে জঙ্গেশ্বর প্রসশীত দেবতাগণের জুক্ত নাম শ্রীশ্রী ঁকালী কৃষ্ণ যোগেশ্বর সিবাদী নাম পত্তন ও আমার নাম সেবাত্রত লিখিত হইয়া সরকারের নিরপীত কর আদায় হইতে থাকীবেক উপরোক্ত শ্রীশ্রী ঁজগদীশ্বরি কালী ঠাকুরানি ও শ্রীশ্রী ঁরাধাকৃষ্ণ জিউর পূজা রাঢ়িয় শ্রেণী ও দ্বাদশ সিব ঠাকুরের পূজা স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণের দ্বারায় জেরূপ প্রচলিত আছে ঐরূপ থাকিবেক ঁনা করেন জদীস্বাৎ দৈব ব্যাঘাত জন্মে উপরোক্ত দেব দেবি মধ্যে কেহ ভগ্ন অথবা দস্ব কত্রিক অপহৃত হএন তবে উত্তরাধিকারি সেবাএতগণের (৩) কত্তর্ব্ব জে তদনুরূপ প্রতি মুত্তি উক্ত ইষ্টেটের মুদ্রার দ্বারায় নির্মাণ ও শাস্ত্রানুজায়ি স্থাপিত ও প্রতিষ্টা করিয়া উপরোক্ত নিয়মমতে সেবাদী পুত্র পৌত্রাদীক্রমে করিতে থাকিবেন। আমি অবর্ত্তমানে আমার নাম খারিজে আমার স্থলাভিসীক্ত পতি মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণের সেবাএত রূপে সেবাএত শ্রেণীতে নাম দাখিল হইবেক এবং সেবাএত দিগের কাহারো অবর্ত্তমানে তদুর্ত্তরাধিকারি তৎ স্থলাভিশীক্ত হইয়া আর ২ সেবাএতের সহিত সেবা নির্ব্বাহ করিবেন এইরূপে উপরোক্ত সকল নিয়মে সেবাত্রত দিগের পুরসানুক্রমে উক্ত দেব সেবাদী চলিতে থাকিবেক এতদর্থে আপন সচ্ছন্দ সরিরে সানন্দ চিত্তে দেবত্তর দান ও সেবাএত নিয়োগ পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর।

Ramnarain Dass	RAUSMONEY DOSSI কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাসমনী দাসি Seal	শ্রীরাষমণী দাশী

শ্রী রামকিশোর সেন, কবিরাজ সাং অম্বিকা
শ্রী শ্রীকণ্ঠ দত্ত সাং হাল জানবাজার
শ্রী শ্রীহরি ঘোষ সাং হাল জানবাজার
শ্রী প্রসন্ন চন্দ্র বসু সাং হাল জানবাজার
শ্রী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং হাল জানবাজার।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণ সাং বরাহনগর হাল জানবাজার
শ্রী দুর্গাপ্রসাদ মান্না সাং জানবাজার
শ্রী গুরুচরণ দাশ সাং ইটালি

Acknowledged before me by Sreemoty Rasmony Dossee as having been executed by her this 18th Feby 1861 Sd/- Illegible.

(৩) ।০ চতুর্থ পৃষ্ঠা আরম্ভ

রানি রাসমণী দাশীর দেবোত্তর সম্পত্তির হুবহু উইলের স্ট্যাম্পেও উল্লেখ শ্রী রাষমণী দাশী।

<u>সংযোজনী- ৯</u>

সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, পেশা- চাষাদি

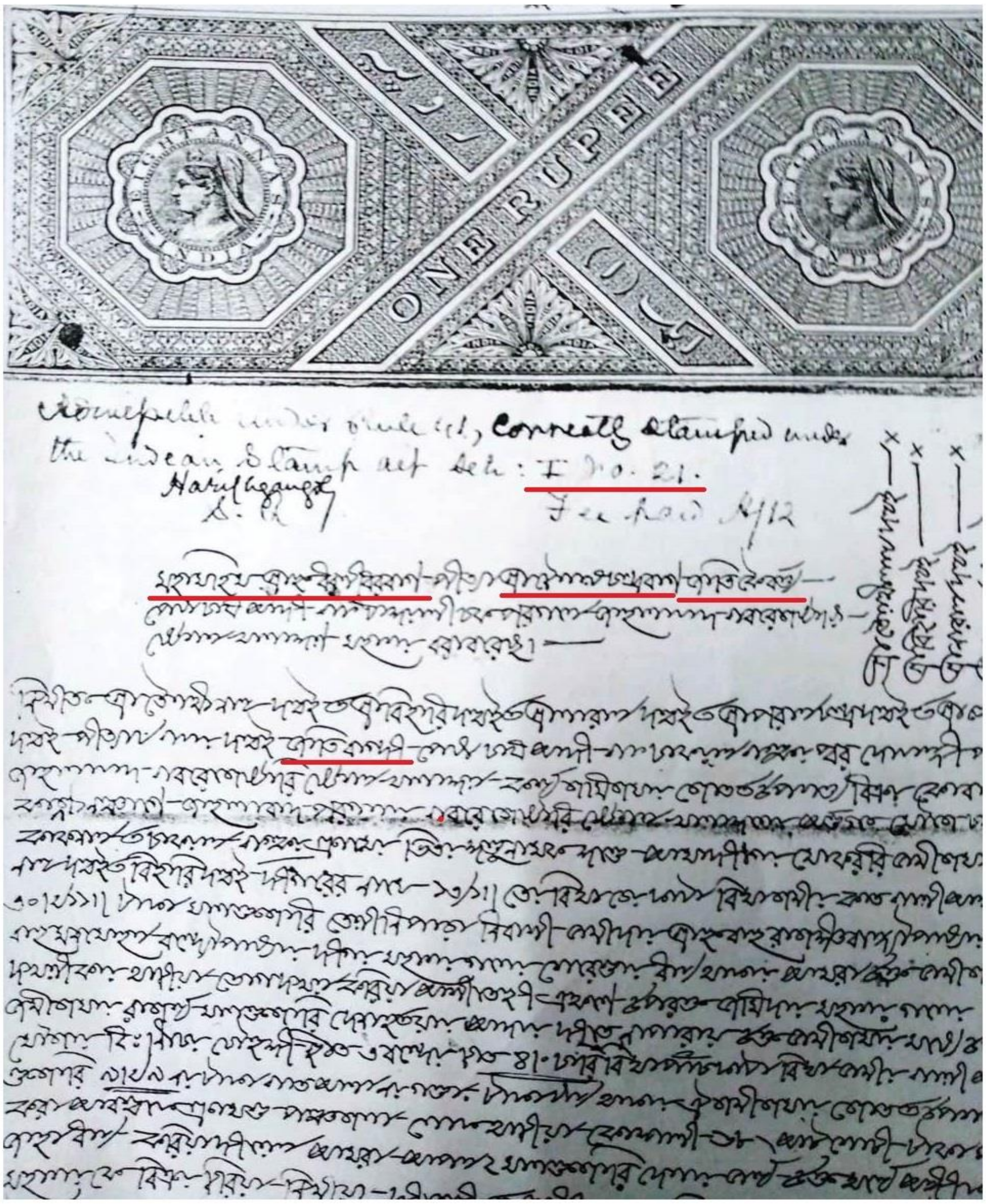

১৯২১ সালের সরকারি দলিলে জাতি ও পেশার উল্লেখ
শ্রী ধরণীধর বাগ, জাতি- কৈবর্ত্ত্য, পেশা - চাষাবাদী।

সংযোজনী- ১০

সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, জাতি- বৈষ্ণব

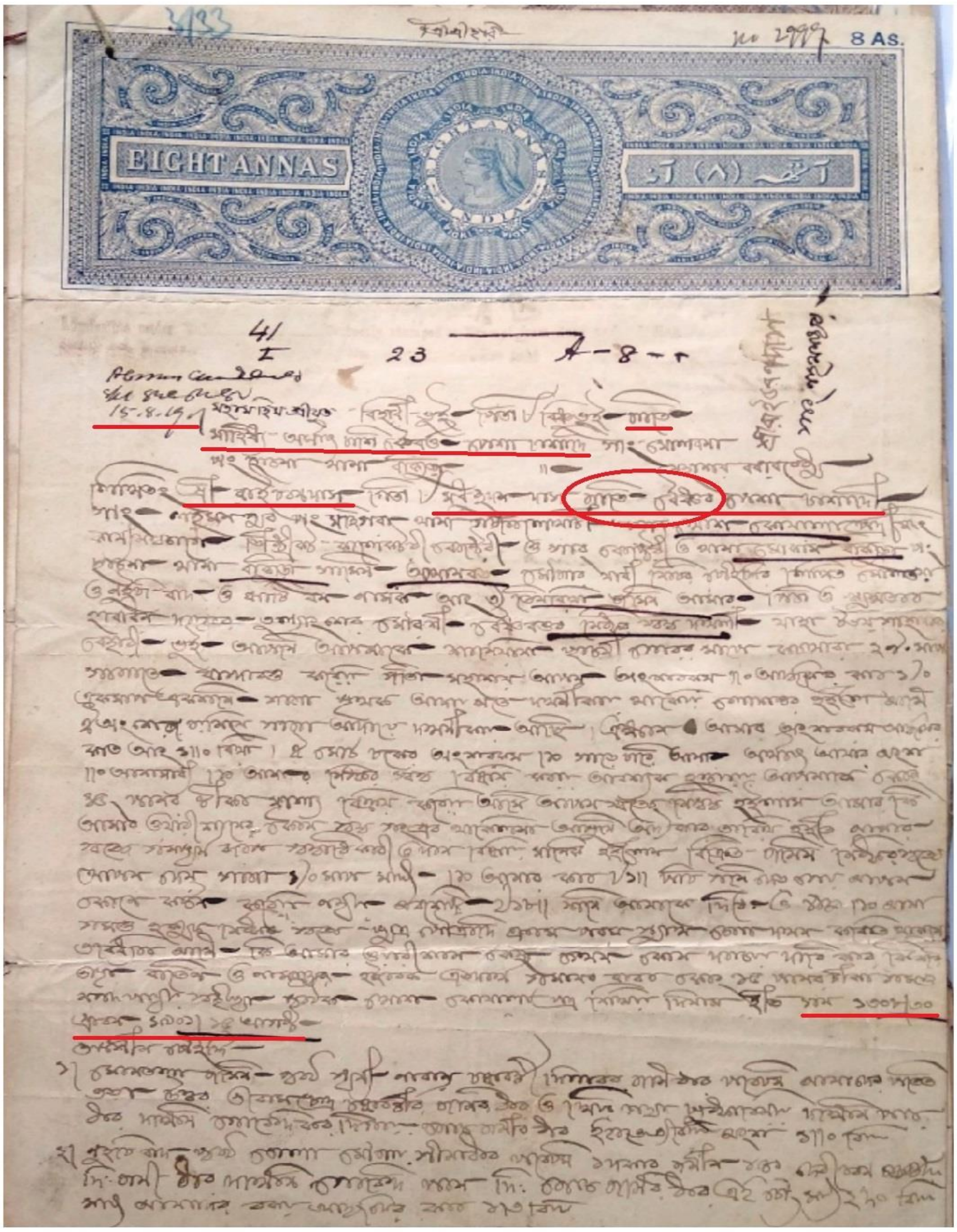

১৯০১ সালের ১৫ আগস্ট সরকারি দলিলে উল্লিখিত
শ্রী রাইচরণ দাস, জাতি বৈষ্ণব, পেশা চাশাদি।

সংযোজনী-১১

সরকারি দলিলে জাতি- কৈবর্ত্ত, পেশা– মহাজনী

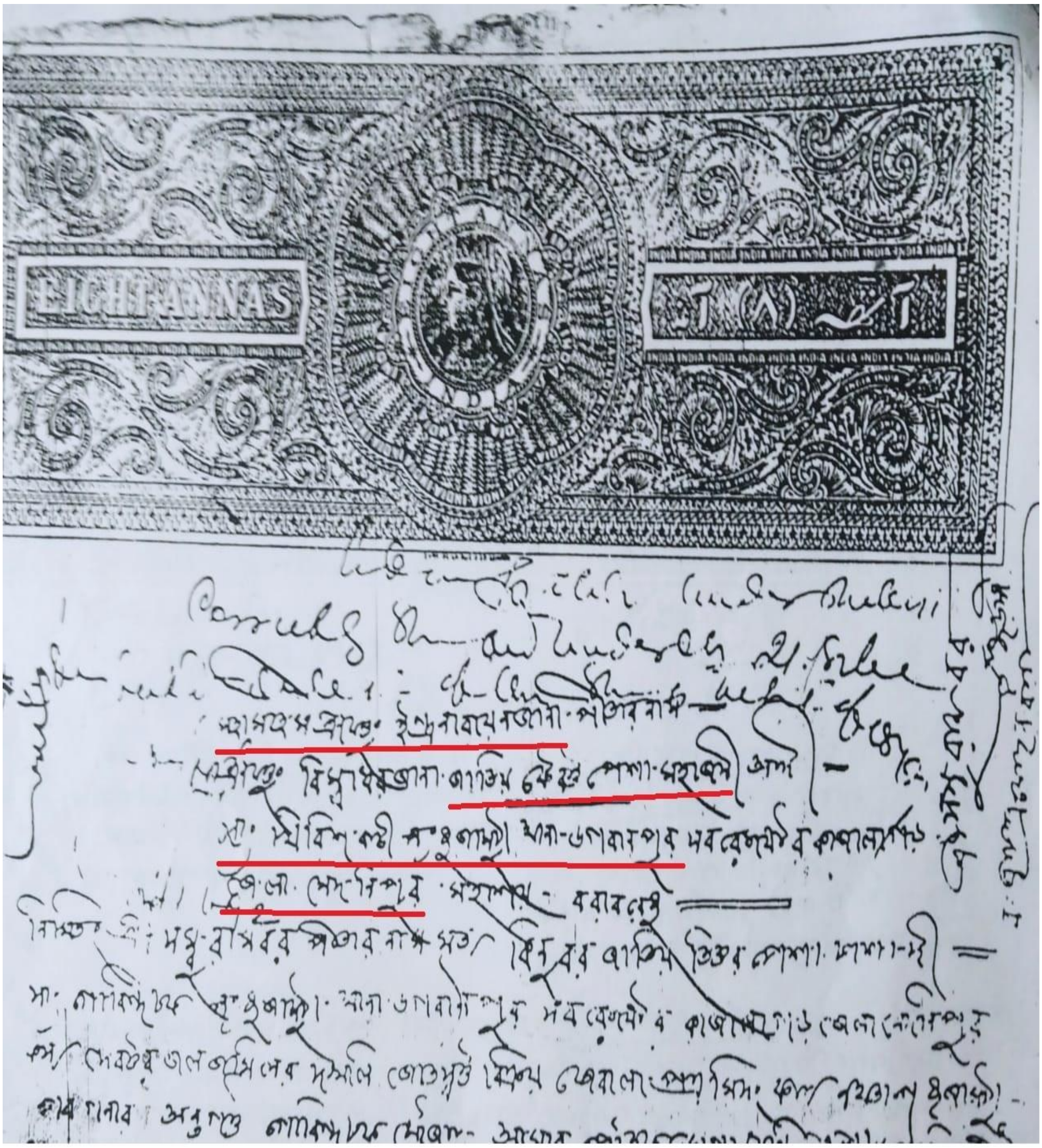

মেদিনীপুর জেলার ইন্দ্রনারায়ণ জানা, জাতি- কৈবর্ত্ত, পেশা মহাজনী।

সরকারি দলিলে দুজনেরই জাতি- চাশি কৈবত্ত, পেশা - চাষাদি

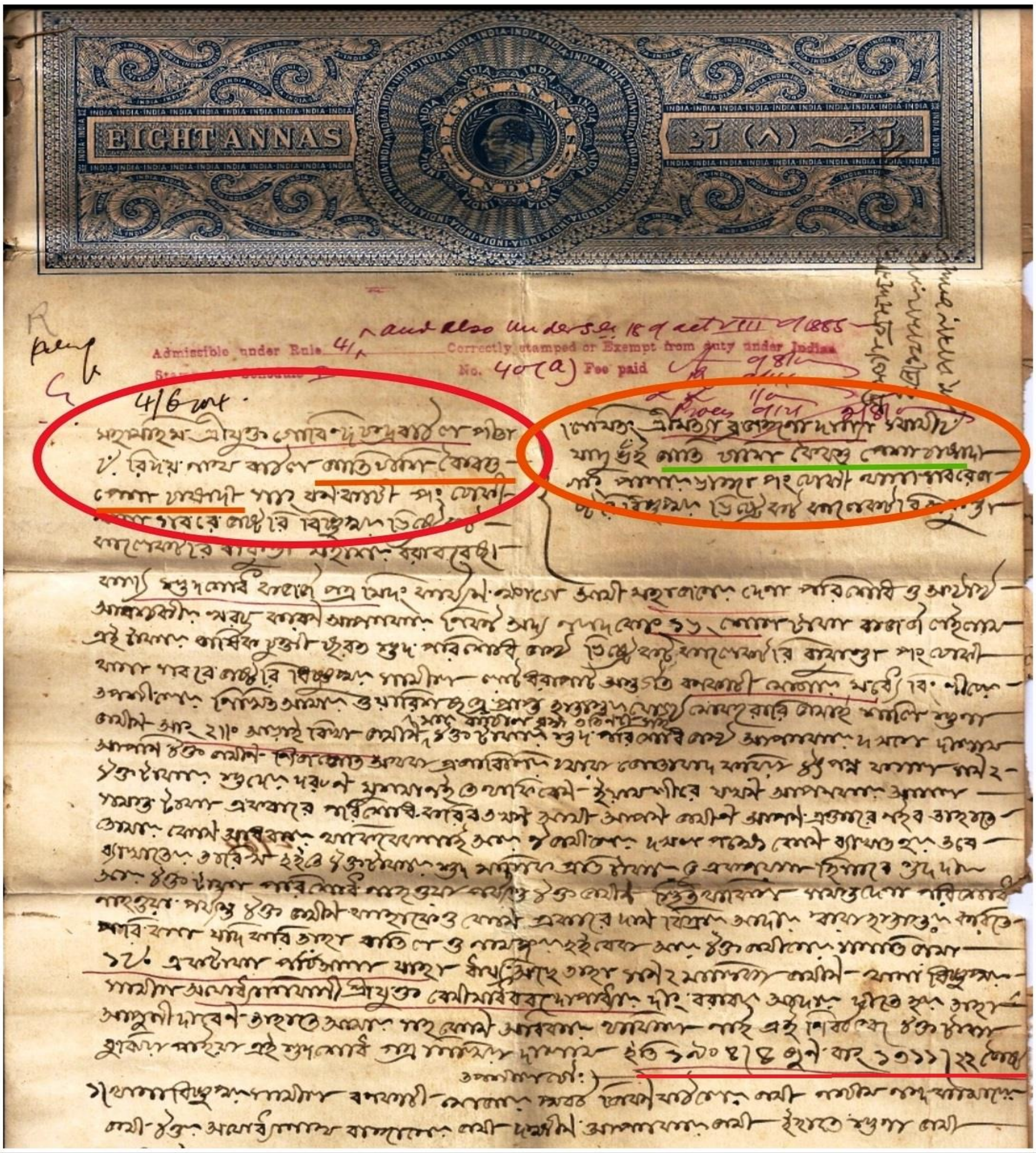

EIGHT ANNAS

INDIA

Admissible under Rule 4/

Correctly stamped or Exempt from duty under Indian Stamp Act Schedule

No. 40(a) Fee paid

১৯০৪ সালের সরকারি দলিলে উল্লিখিত দুজনেরই জাতি চাশি কৈবত্ত

সংযোজনী-১৩

কৈবর্ত আন্দোলনের নেতা শান্তিরঞ্জন সামন্তের জাতি হিন্দু চাষী কৈবর্ত্য

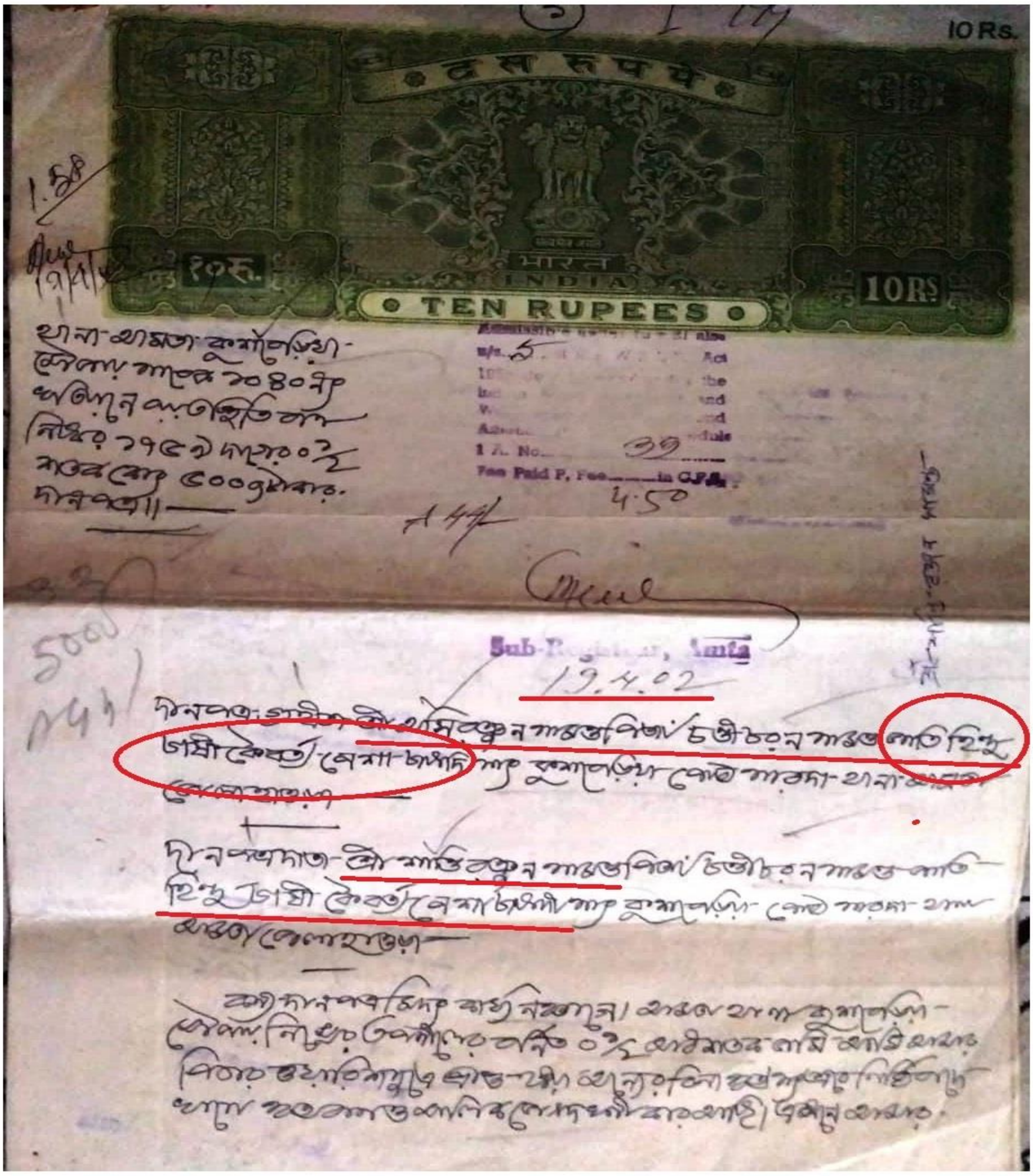

১৯০২ সালের সরকারি দলিলে উল্লিখিত শ্রী শান্তিরঞ্জন সামন্তের জাতি - হিন্দু চাষী কৈবর্ত্য

সংযোজনী-১৪

অস্পৃশ্যতার শিকার স্বামী বিবেকানন্দ

প্রিয় সম্পাদক

অস্পৃশ্যতার শিকার বিবেকানন্দ

১৮৯৩ সালে বিবেকানন্দ এক পত্রে আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন, 'হিন্দু ধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরিব ও পতিতদের গলায় পা দেয়, জগতের আর কোনও ধর্ম এরূপ করে না।' এই 'পৈশাচিক পা' বিবেকানন্দকেও রেহাই দেয়নি। শূদ্র বলে অনেক সন্ন্যাসী-মঠে আশ্রমে তাঁকে অপরাপর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পঙক্তি ভোজনে বসতে দেওয়া হয়নি। বিখ্যাত জজসাহেব ও প্রখ্যাত সমাজসেবী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দর সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করতে অস্বীকার করেন। এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শোকসভায় সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করা হলে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'দেশে যদি হিন্দ রাজা থাকত তবে শূদ্র হয়েও সন্ন্যাসী হওয়ার অপরাধে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হত' (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, খ-৪, পৃঃ- ৬২)। এমনকি এটাও জ্বলন্ত সত্য যে, শ্রী রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর মথুর বিশ্বসেরা বিবেকানন্দকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঢুকতে দেননি তার শূদ্রত্বের কারণে। 'স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরে ঢুকেছিলেন বলে দেবীর পুনরাভিষেকের প্রয়োজন হয়েছিল।' (ঐ, পৃঃ- ১৫৫)। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সেই পৈশাচিক ধর্মের মহিমা কীর্তন করে গেছেন এবং জাতবাদ-এরও তিনি ছিলেন প্রবল সমর্থক। জাতবাদ-এর আর এক শিকার ড. আম্বেদকর। তাঁর পরীক্ষার উত্তর-পত্রাদি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রথমে পবিত্র করা হত, তারপরই শিক্ষকরা তা মার্কিং-এর জন্য দেখতেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবু জগজীবন রাম বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ড. সম্পূর্ণানন্দের মূর্তি উন্মোচন করেন। মুচির ছেলের স্পর্শে মূর্তি অপবিত্র হওয়ায়, পরে গঙ্গাজলে ধুয়ে তাকে পুনরায় পবিত্র করা হয়। কিন্তু মাঝগঙ্গার অতলে ডুবিয়েও ড. আম্বেদকরদের পবিত্র করা যায়নি। তাঁরা রয়ে গেছেন অস্পৃশ্যই। আবার শূদ্রাণী কৈবর্ত রাণি রাসমণি তাঁর দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর করে না দেওয়া পর্যন্ত গদাধরের পুজোর প্রসাদ গ্রহণ না করার জেদ মুগ্ধ করেছিল সনাতনপন্থী হিন্দু সম্প্রদায়কে। তাঁরা তুরীয় আনন্দে রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলে ঘোষণা করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে গোঁড়া ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ নিম্নবর্ণকে চিরকাল নিচু চোখে দেখে এসেছেন। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পুঁথি'-র লেখক অক্ষয় সেন (শাঁকচুন্নী) লিখেছেন, 'প্রভুদেব রামকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে।।/একস্তরে সবে কিন্তু স্বতন্ত্র স্থান।/বর্ণ ভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান।।' (পৃঃ- ৫২২)। কিংবা 'পবিত্র ব্রাহ্মণ বিনা বন্দন না হয়।/অন্যে পরশিলে অন্ন ঘৃণা অতিশয়।।' (পৃঃ- ৪৮৮)। গান্ধীজি 'বর্ণাশ্রম' ধর্মের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু অচ্ছ্যুৎ প্রথাকে ঘৃণা করতেন। কিছুকাল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়াস চালিয়ে ধর্মের ঠিকাদারদের আক্রমণের শিকার হন। গোঁড়া হিন্দু সমাজের বাঘা বাঘা সমালোচকরা তাঁকে অভিহিত করেন 'শয়তান' বলে। গান্ধীজির প্রয়াস সফল হয়নি। তিনি বোঝেননি, বর্ণভেদ-জাতিভেদ প্রথা সমূলে উচ্ছেদ না করে এবং যে ধর্মের ঈশ্বর সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকে 'পাপযোনি' এবং 'দাস' করে সৃষ্টি করেছেন, সেই ধর্ম এবং তার ধর্মগ্রন্থের আধুনিক ভাষ্যের মাধ্যমে ব্রহ্মণ্য ধর্মের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণের মানুষদের শৃঙ্খল মোচন সম্ভব নয়। প্রমাণ, চুনী কোটাল ও রোহিত ভেমুলা।

আজও প্রতিদিন এই মহান ভারতের কোথাও না কোথাও অস্পৃশ্যদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের নারীদের ধর্ষণ করা হয়। ভৌতিক উল্লাসে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়। তথ্য বলছে, ২০০০ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে উচ্চবর্ণের সন্ত্রাসবাদীরা নিম্নবর্ণের ২৬০০০ মানুষকে হত্যা করেছে। মূল থেকে পচে যাওয়া সমাজব্যবস্থায় রোহিতের মৃত্যু আরও একটি সংখ্যা মাত্র। নানা মিডিয়ায় কিছুদিন ফাটাফাটি যুক্তি-তর্ক চলবে, তারপর সব শান্তিকল্যাণ হয়ে যাবে। মানুষ নয়, অস্পৃশ্য হোক অমানবিক ধর্মীয় বিধান।

অঞ্জন সাহা। কলকাতা- ৫১

সংযোজনী-১৫

অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটির প্রচার পুস্তিকা পৃ. ১

অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী - কৈবর্ত কমিউনিটি

রেজিস্ট্রেশন নং — এস/১ এল /৭৭৪ অব ২০০০-২০০১

১৩ নং রাণী রাসমণি রোড, জানবাজার, কলকাতা - ৭০০ ০৮৭

কৈবর্ত (মাহিষ্য) — বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়

CENSUS 1931

"পৃথিবীতে এমন দু'এক জন হতভাগ্য আছে যে পিতা / পিতামহের নাম জানে না।
এমন দু-এক হতভাগ্য জাতি আছে যে কীর্তিমন্ত পূর্বপুরুষগণের কীর্তি অবগত নহে।"

— বঙ্কিমচন্দ্র

১৯৩১ সালের জাতিভিত্তিক শেষ জনগণনার পূর্বে "মাহিষ্য" নামটি সরকারী নথিপত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে প্রথম জাতি পরিচয়সহ জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে। ঐ সময় মেক্‌লে ডিরোজিওর সৃষ্টি ইয়ংবেঙ্গলদের সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলার কয়েক কোটি মূল-নিবাসী জনগণকে ৩৬০টি পেশা ভিত্তিক গোষ্ঠী বা জাতে (Caste) চিহ্নিত করে সেন্সাস রিপোর্টে নথিভূক্ত করা হয়।" Statistical Account of Bengal — W.W. Hunter 1876 ইতিহাস থেকে দেখা যায় (জনগণনার রিপোর্ট, ভারত সরকার, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১) মর্যাদার তালিকায় কৈবর্তদের ঠাঁই হয়েছিল নবশাখের (নবশাখ-তাঁতি, মালাকার, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, তিলি, ময়রা) নীচে। ১৯২৪ সালে অচ্ছুৎ হিসাবে গণ্য হয়ে বীরেন্দ্র শাসমল অতি দক্ষ প্রশাসক হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা কর্পোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসার পদে তাঁকে যখন নিযুক্ত করার কথা হয় তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিগ-ফাইভ — বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বোস, তুলসী গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ, নলিনী সরকার আপত্তি তুলে বললেন, "মেদিনীপুরের জাতে কেওটা। ও কলকাতা কর্পোরেশন চালাবে কি করে?" "The strongman of Midnapore was brushed aside to appease the Kayastha Clique' The Stateman dt 6.10.1991.

এখানে উল্লেখ করা যায় যে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং উমেশ সি. ব্যানার্জীর "কংগ্রেস" বনাম ব্রিটিশ সরকার ১৮৯২ এর চুক্তি অনুসারে জনগণনায় চিহ্নিত Superior Caste ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শুদ্র (কায়স্থ এবং বৈদ্য) দের জন্য তদানিন্তন সরকারি চাকুরীতে সংরক্ষণ চালু ছিল। ১৯২২ সালে বাংলার অন্যান্য ৩৯টি জাতিসহ "চাষী-কৈবর্ত" Depressed Classes এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অপমানিত শ্রী শাসমল সেই সময় বাংলার গভর্ণর জন এন্ডারসন সাহেবের নিকট নিজের জাতের পরিচয় চাষী-কৈবর্ত — নামান্তরিত করে "মাহিষ্য" এবং মাহিষ্যকে বর্ণ হিন্দু জাতিভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন।

১৮৯১ সালে জনগণনার পর জমিদার, মহাজন ও ব্রিটিশ অনুগত শ্রেণির কৈবর্তরা "চাষী-কৈবর্ত" জাতি হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে। কৈবর্তদের দরিদ্রতম অংশ "জালিক-কৈবর্ত" জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়, ১৯৩৫ সালে গভঃ অব্ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বলে সিডিউল কাস্ট হিসাবে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় আইনসভায় সংরক্ষিত নির্বাচন ক্ষেত্র ও শিক্ষা, বিচার বিভাগ ও প্রশাসনের চাকুরী প্রভৃতিতে সংরক্ষণের সুযোগ পায়।

১৯৩২ এ গোলটেবিল বৈঠকে ডঃ আম্বেদকর মূল নিবাসী, (চাতুর বর্ণ বহির্ভূত) ভারতীয় জাতিসমূহের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণের যে অধিকার আদায় করেন (সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারা) সেই সময় বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির নেতৃবৃন্দ চিন্তা-বিভ্রমে, বর্ণ হিন্দু পরিচয়ের প্রলোভনে মাহিষ্য নামটি চাষী-কৈবর্তের পরিবর্তিত নাম হিসাবে গ্রহণ করার জন্য দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন করেন। ফলতঃ ১৯৩১ সালের জনগণনায় জাতি পরিচয়ে চাষী-কৈবর্তের স্থলে "চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য)" নামটি নথিভূক্ত হয়।

অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি নামক সংগঠনের প্রচার পুস্তিকা,
জাতি সংগঠনের অফিস থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত।

অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটির প্রচার পুস্তিকা পৃ. ২

দ্রষ্টব্য :— জনগণনার রিপোর্ট ১৯৩১, প্রধান জাতি চাষী. কৈবর্ত (মাহিষ্য) ২৩৮১২৬৬।
"The name Mahisya is a new one adopted since the census of 1901".
Bengal District Gazetteers, Midnapur, 1911,
Reprint :— Edu. Dept. Bikash Bhaban, Salt Lake City. Kolkata — 700 091.

১৯১১ সালের পূর্বে আমাদের পিতামহ / প্রপিতামহের দলিল দস্তাবেজে জাতি-কৈবর্ত পেশা-চাষাদি ও পরবর্তীকালে জাতি-মাহিষ্য, পেশা-চাষাদি এবং ১৯৩১ সালের পর শাসক শ্রেণি তথা বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনায় "জাতি — হিন্দু" লিখতে বাধ্য হয়। আজও কিন্তু ব্রাহ্মণরা জাতি — ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা জাতি — কায়স্থ এবং বৈদ্যরা জাতি — বৈদ্য লেখেন। বর্তমানে ওবিসি জাতিভূক্ত মানুষেরা জমির দলিল দেখিয়ে 'পিতা/পিতামহের জাতি' প্রমাণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

আবার ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে মন্ডল রিপোর্ট চালু করার জন্য যে এ.কে.সেন কমিশন গঠিত হয় তাতে ঐ জাত্যাভিমানী গোষ্ঠী সরকারের যোগ-সাজশে "মাহিষ্য"দের ও বি. সি.'র অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দেয়। ১৯৯৫ সালে বেগতিক দেখে মান্যবর বিষ্ণুপদ দাস (বনগাঁ) ও শান্তিরঞ্জন সামন্ত (হাওড়া) কমিশনের নিকট চাষী-কৈবর্তকে ও. বি. সি. তালিকাভূক্ত করার জন্য আবেদন নিবেদন করেন। তীব্র বাগ-বিতন্ডা ও বিরোধিতা অতিক্রম করে ১৯৯৭ সালে চাষী-কৈবর্ত পশ্চিমবঙ্গে ও.বি.সি. হিসাবে স্বীকৃতি পায়। Calcutta Gazette dt. 6th Nov. 1997, Govt. of West Bengal No 1054-BCW/EC/MR/302/97.

৬ আগস্ট ১৯৯৫ বিধানসভায় মাননীয় মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া ঘোষণা করেন "এই (ও.বি.সি.) শ্রেণিভূক্ত মানুষ এবং তাঁদের প্রতিবেশীরা নিজেদের (জাতি) পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁরাই বলে দেবেন কে ও.বি.সি. তালিকাভূক্ত আর কে নয়।"
— আনন্দবাজার পত্রিকা ৭ আগস্ট, ১৯৯৫।

মধ্যরাতে, ১৯৪৭ সালে লর্ড মাউন্টবটনের ছত্রছায়ায় বাঙলার "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য" এই তিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জোট বাংলার শাসক শ্রেণিতে উপনীত। আর সংখ্যাগুরু কৈবর্ত সম্প্রদায় শাসিত ও শোষিত প্রজা শ্রেণিভূক্ত। বর্তমানে চাষী-কৈবর্তদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি — যা অন্ততঃ দেড়শত স্বাধীন স্বার্বভৌম প্রত্যেকটি দেশের লোকসংখ্যার বেশী। চাষী-কৈবর্তদের জাতি চেতনা না থাকায় "ইউরোপীয় জিন সম্ভূত" শাসক জাতি গোষ্ঠী কর্তৃক তারা শাসিত হচ্ছে "কি বিচিত্র এই দেশ"!!! চাষী-কৈবর্ত ভাইবোনেরা স্বাধীন দেশের সংবিধান আপনাদের দেশশাসন করার ভাগীদার হিসাবে চিহ্নিত করেছে। উঠুন, জাগুন — একমাত্র ও.বি.সি.-দের নির্বাচিত করে আইন সভায় পাঠান ও নিজেদের শাসক শ্রেণিতে উন্নীত করুন। আপনার অঞ্চলে 'অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি'র আঞ্চলিক শাখা গঠন করুন। মাহিষ্য ভাইবোনেরা পাড়ায় পাড়ায় সদর্পে নিজেদের চাষী-কৈবর্ত পরিচয় ঘোষণা করুন। প্রতিটি গ্রামে ও.বি.সি. ভাই বোনেদের, চাকুরী ও উচ্চশিক্ষায় ২৭% সংরক্ষণের দাবীতে সামিল করে OBC FRONT গড়ে তুলুন।

একবিংশ শতাব্দীতে পুনরায় আপনার জমির দলিলে জাতি — চাষী-কৈবর্ত লিখুন।

।। জয় কৈবর্তক কেশব।। ।। জয় ভারত।। ।। জয় ভীম।।

শ্রী তরণী চন্দ্র দাস
(সভাপতি)
গ্রাম ও পোঃ- মির্জাপুর-বাঁকিপুর
জেলা — হুগলী
মো : ৯৪৩৩৬৫৫১৬৩

শ্রী দুর্গাদাস মণ্ডল
(কোষাধ্যক্ষ)
গোপীনাথপুর, পোঃ মৌখালী
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
মো : ৯৮৩৬২২৩৮১৫

শ্রী শান্তিরঞ্জন সামন্ত
(সাধারণ সম্পাদক)
ফোন — ২৬৪২-০৩১৫
৬৩/৪, স্বামী বিবেকানন্দ রোড
হাওড়া-৭১১ ১০৪
মো : ৯৪৩৩৮৯৪৫২৭

সংযোজনী-১৬

অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি নদীয়া জেলার প্রচার পুস্তিকা

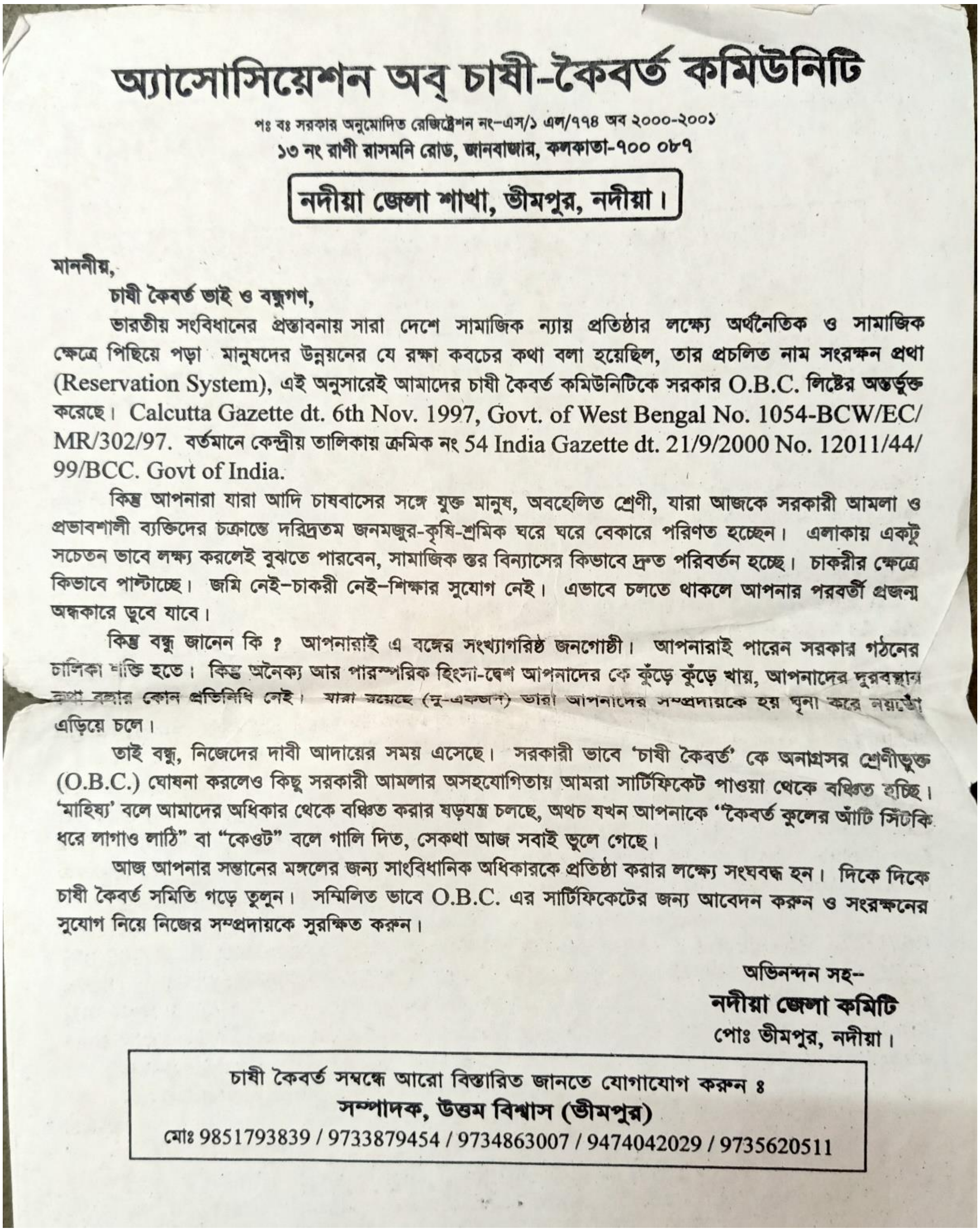

অ্যাসোসিয়েশন অব্ চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি

পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত রেজিষ্ট্রেশন নং-এস/১ এল/৭৭৪ অব ২০০০-২০০১

১৩ নং রাণী রাসমনি রোড, জানবাজার, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

নদীয়া জেলা শাখা, ভীমপুর, নদীয়া।

মাননীয়,

চাষী কৈবর্ত ভাই ও বন্ধুগণ,

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় সারা দেশে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের উন্নয়নের যে রক্ষা কবচের কথা বলা হয়েছিল, তার প্রচলিত নাম সংরক্ষন প্রথা (Reservation System), এই অনুসারেই আমাদের চাষী কৈবর্ত কমিউনিটিকে সরকার O.B.C. লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করেছে। Calcutta Gazette dt. 6th Nov. 1997, Govt. of West Bengal No. 1054-BCW/EC/MR/302/97. বর্তমানে কেন্দ্রীয় তালিকায় ক্রমিক নং 54 India Gazette dt. 21/9/2000 No. 12011/44/99/BCC. Govt of India.

কিন্তু আপনারা যারা আদি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, অবহেলিত শ্রেণী, যারা আজকে সরকারী আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চক্রান্তে দরিদ্রতম জনমজুর-কৃষি-শ্রমিক ঘরে ঘরে বেকারে পরিণত হচ্ছেন। এলাকায় একটু সচেতন ভাবে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, সামাজিক স্তর বিন্যাসের কিভাবে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। চাকরীর ক্ষেত্রে কিভাবে পাল্টাচ্ছে। জমি নেই-চাকরী নেই-শিক্ষার সুযোগ নেই। এভাবে চলতে থাকলে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম অন্ধকারে ডুবে যাবে।

কিন্তু বন্ধু জানেন কি ? আপনারাই এ বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। আপনারাই পারেন সরকার গঠনের চালিকা শক্তি হতে। কিন্তু অনৈক্য আর পারস্পরিক হিংসা-দ্বেশ আপনাদের কে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়, আপনাদের দুরবস্থার কথা বলার কোন প্রতিনিধি নেই। যারা রয়েছে (দু-একজন) তারা আপনাদের সম্প্রদায়কে হয় ঘৃনা করে নয়তো এড়িয়ে চলে।

তাই বন্ধু, নিজেদের দাবী আদায়ের সময় এসেছে। সরকারী ভাবে 'চাষী কৈবর্ত' কে অনাগ্রসর শ্রেণীভুক্ত (O.B.C.) ঘোষনা করলেও কিছু সরকারী আমলার অসহযোগিতায় আমরা সার্টিফিকেট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। 'মাহিষ্য' বলে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে, অথচ যখন আপনাকে "কৈবর্ত কুলের আঁটি সিঁটকি ধরে লাগাও লাঠি" বা "কেওট" বলে গালি দিত, সেকথা আজ সবাই ভুলে গেছে।

আজ আপনার সন্তানের মঙ্গলের জন্য সাংবিধানিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হন। দিকে দিকে চাষী কৈবর্ত সমিতি গড়ে তুলুন। সম্মিলিত ভাবে O.B.C. এর সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করুন ও সংরক্ষনের সুযোগ নিয়ে নিজের সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত করুন।

অভিনন্দন সহ--

নদীয়া জেলা কমিটি

পোঃ ভীমপুর, নদীয়া।

চাষী কৈবর্ত সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

সম্পাদক, উত্তম বিশ্বাস (ভীমপুর)

মোঃ 9851793839 / 9733879454 / 9734863007 / 9474042029 / 9735620511

সংযোজনী-১৭

ডায়মণ্ড হারবার চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের রাজ্য সম্মেলনের পুস্তিকা

আপনি কি মাহিষ্য? আপনি কি ও.বি.সি.? আপনি কি জানেন 'মাহিষ্য'দের জাতি নাম (CASTE NAME) 'চাষী-কৈবর্ত' (CHASI–KAIBARTTA)?

পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত সরকারের চাকুরী, পড়াশুনা, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সমস্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পেতে (মাহিষ্য নয়) ও.বি.সি. চাষী-কৈবর্ত শংসাপত্র সংগ্রহ করুন। শংসাপত্র পেতে ও বিস্তারিত জানতে **আগামী ১৩/০৩/২০১৬ তারিখ রবিবার ডাঃ হাঃ চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের ডাকে ও.বি.সি. সম্মেলনে যোগদিন।**

স্থান : ডায়মণ্ডহারবার হাইস্কুল শতবার্ষিকী হল।
সময় : সকাল ৯ টা থেকে
আরও বিষদে জানতে ফোন করুন :
৯২৩২৬০৫০১৬ / ৮৯২৬৭৪৪৭৪৫

পথ নির্দেশ : শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে অথবা ধর্মতলা হইতে বাসে ডায়মণ্ডহারবার আসুন।

- মণ্ডল কমিশন নির্ধারিত মাহিষ্য, তিলি, সাহা, সদগোপসহ পশ্চিমবঙ্গের ১৭৭টি জনগোষ্ঠীকে অবিলম্বে OBC ঘোষণার দাবিতে
- প্রথম শ্রেণী থেকে সমস্ত OBC ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড
- উচ্চ শিক্ষা, চাকুরী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সমস্ত ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে OBC সংরক্ষণ
- OBC দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী "A" ও "B" শ্রেণী বিভাজন বিলুপ্ত করার দাবিতে
- বিধানসভা, লোকসভাসহ সমস্ত আইন সভাগুলিতে আনুপাতিক OBC সংরক্ষণের দাবিতে
- OBC সংশাপত্রের আবেদনকারীদের অযথা হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ও দ্রুত সহজভাবে OBC সার্টিফিকেট প্রদানের দাবিতে
- OBC দের ক্রিমিলেয়ার প্রথা তুলে দেবার দাবিতে
- রাজ্য জুড়ে OBC দের দীর্ঘ বঞ্চনার প্রতিকার করতে

১৩ই মার্চ, ২০১৬ (বাং-২৯শে ফাল্গুন, ১৪২২) রবিবার / সকাল ৯টা থেকে

OBC রাজ্য সম্মেলন

স্থান : ডায়মণ্ডহারবার হাইস্কুল শতবার্ষিকী হল, দঃ ২৪ পরগণা।

বক্তা : OBC আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্ববর্গ।

ডায়মণ্ড হারবার চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের রাজ্য সম্মেলনের পুস্তিকা

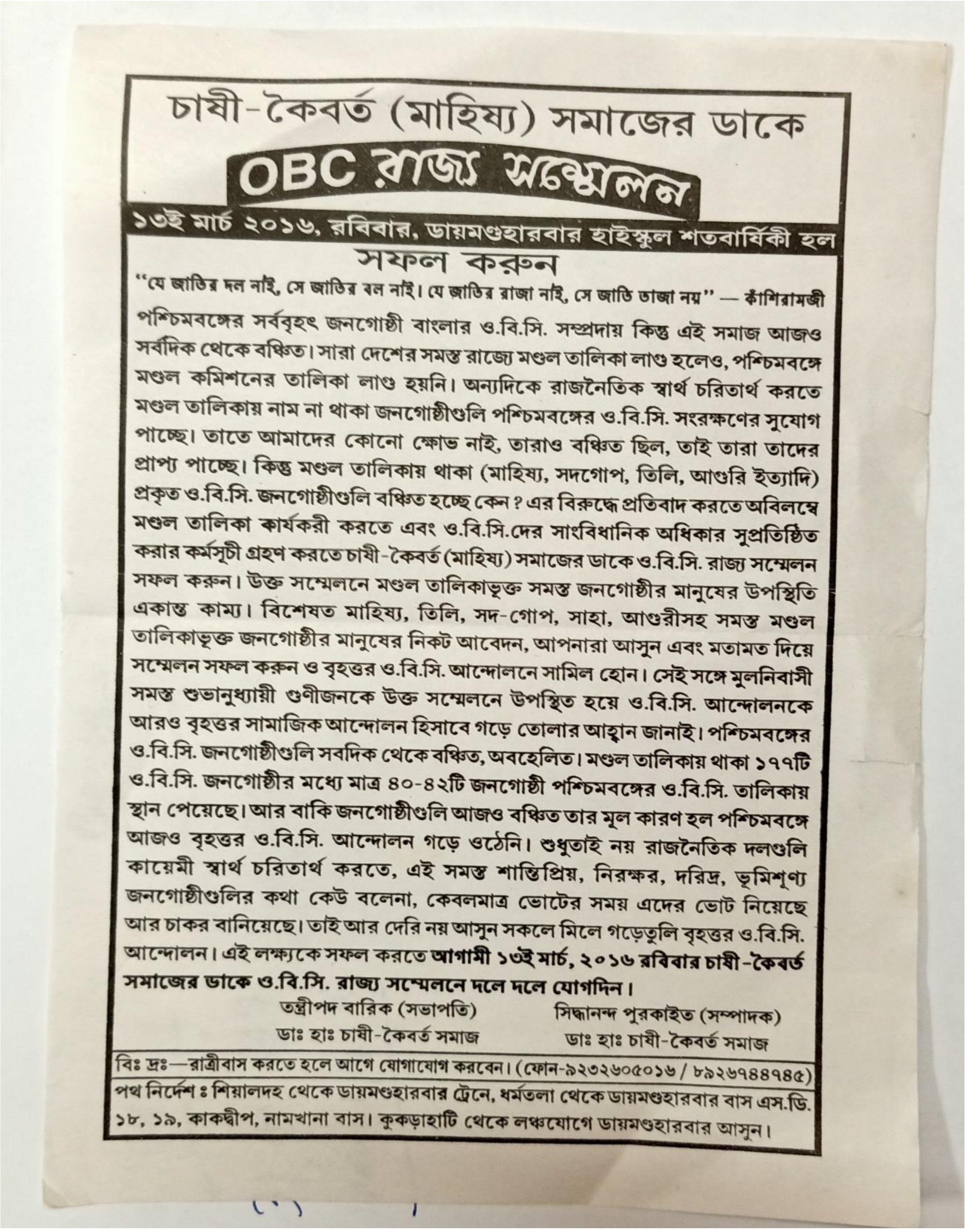

চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের ডাকে

OBC রাজ্য সম্মেলন

১৩ই মার্চ ২০১৬, রবিবার, ডায়মণ্ডহারবার হাইস্কুল শতবার্ষিকী হল

সফল করুন

"যে জাতির দল নাই, সে জাতির বল নাই। যে জাতির রাজা নাই, সে জাতি তাজা নয়" — কাঁশিরামজী

পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ জনগোষ্ঠী বাংলার ও.বি.সি. সম্প্রদায় কিন্তু এই সমাজ আজও সর্বদিক থেকে বঞ্চিত। সারা দেশের সমস্ত রাজ্যে মণ্ডল তালিকা লাগু হলেও, পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল কমিশনের তালিকা লাগু হয়নি। অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে মণ্ডল তালিকায় নাম না থাকা জনগোষ্ঠীগুলি পশ্চিমবঙ্গের ও.বি.সি. সংরক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। তাতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নাই, তারাও বঞ্চিত ছিল, তাই তারা তাদের প্রাপ্য পাচ্ছে। কিন্তু মণ্ডল তালিকায় থাকা (মাহিষ্য, সদগোপ, তিলি, আগুরি ইত্যাদি) প্রকৃত ও.বি.সি. জনগোষ্ঠীগুলি বঞ্চিত হচ্ছে কেন ? এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অবিলম্বে মণ্ডল তালিকা কার্যকরী করতে এবং ও.বি.সি.দের সাংবিধানিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে চাষী-কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের ডাকে ও.বি.সি. রাজ্য সম্মেলন সফল করুন। উক্ত সম্মেলনে মণ্ডল তালিকাভূক্ত সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। বিশেষত মাহিষ্য, তিলি, সদ-গোপ, সাহা, আগুরীসহ সমস্ত মণ্ডল তালিকাভূক্ত জনগোষ্ঠীর মানুষের নিকট আবেদন, আপনারা আসুন এবং মতামত দিয়ে সম্মেলন সফল করুন ও বৃহত্তর ও.বি.সি. আন্দোলনে সামিল হোন। সেই সঙ্গে মুলনিবাসী সমস্ত শুভানুধ্যায়ী গুণীজনকে উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ও.বি.সি. আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানাই। পশ্চিমবঙ্গের ও.বি.সি. জনগোষ্ঠীগুলি সবদিক থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত। মণ্ডল তালিকায় থাকা ১৭৭টি ও.বি.সি. জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাত্র ৪০-৪২টি জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের ও.বি.সি. তালিকায় স্থান পেয়েছে। আর বাকি জনগোষ্ঠীগুলি আজও বঞ্চিত তার মূল কারণ হল পশ্চিমবঙ্গে আজও বৃহত্তর ও.বি.সি. আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। শুধুতাই নয় রাজনৈতিক দলগুলি কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করতে, এই সমস্ত শান্তিপ্রিয়, নিরক্ষর, দরিদ্র, ভূমিশূণ্য জনগোষ্ঠীগুলির কথা কেউ বলেনা, কেবলমাত্র ভোটের সময় এদের ভোট নিয়েছে আর চাকর বানিয়েছে। তাই আর দেরি নয় আসুন সকলে মিলে গড়েতুলি বৃহত্তর ও.বি.সি. আন্দোলন। এই লক্ষ্যকে সফল করতে **আগামী ১৩ই মার্চ, ২০১৬ রবিবার চাষী-কৈবর্ত সমাজের ডাকে ও.বি.সি. রাজ্য সম্মেলনে দলে দলে যোগদিন।**

তন্ত্রীপদ বারিক (সভাপতি)
ডাঃ হাঃ চাষী-কৈবর্ত সমাজ

সিদ্ধানন্দ পুরকাইত (সম্পাদক)
ডাঃ হাঃ চাষী-কৈবর্ত সমাজ

বিঃ দ্রঃ—রাত্রীবাস করতে হলে আগে যোগাযোগ করবেন। (ফোন-৯২৩২৬০৫০১৬ / ৮৯২৬৭৪৪৭৪৫)

পথ নির্দেশ ঃ শিয়ালদহ থেকে ডায়মণ্ডহারবার ট্রেনে, ধর্মতলা থেকে ডায়মণ্ডহারবার বাস এস.ডি. ১৮, ১৯, কাকদ্বীপ, নামখানা বাস। কুকড়াহাটি থেকে লঞ্চযোগে ডায়মণ্ডহারবার আসুন।

সংযোজনী- ১৮

বারুইপুর এস.ডি.ও কে লেখা সি.আর.আই এর চিঠিতে চাষী-কৈবর্ত অথবা মাহিষ্য

Cultural Research Institute
Govt. of West Bengal
Backward Classes Welfare Department ,
P1/4, C. I.T. Scheme No. VII M, V.I.P. Road,
Kakurgachi, Kolkata –700054.

Memo No…**929/CRI**
B-3/CRI –98

Dated:14/12/2005

To
The Sub-divisional Officer
Baruipur
24-Parganas (South).

Sub: Clarification, regarding the Caste Status of Sri Sudip Das, S/O Sri Amiya Das.

Sir,

With reference to your letter no. 1372/BRPS/SC/ST/OBC dt. 07.07.2005, addressed to the Project Officer-Cum-District Welfare Officer, this is to inform you that Kaibarta is a generic term. Since the census report of 1911 therehas been reference to three different caste groups among the Kaibartas –Kaibarta(Chasi or Mahishya),Kaibarta(Jalia) and Kaibarta(Unspecified). In 1921 the agricultural Kaibartas were returned as Chasi Kaibarta or Mahishyas while Jalias were returned as Adi (or original) Kaibarta. In 1931 the dichotomy was dropped and agricultural Kaibartas were simply returned as Mahishyas and the fisherman Kaibartas as Adi or Jalia Kaibarta. At that time Mahishyas disclaim all connection with Jalia Kaibartas .In the old deed of 1889 the caste name was written as Kaibarta with agriculture as their profession ,In this case they may be treated as Hele /Halia/or Chasi Kaibarta which is as enlisted "Other Backward Classes of West Bengal.But in the recent deed of 1925 their caste name was mentioned as Mahishya. Under this circumstances it may be mentioned that at certain times the claimant identified themselves as "Mahishya" which is not an enlisted OBC of West Bengal .So if the claimant is locally recognized as "Mahishya" and as per the recent deed he is not enlisted to get OBC certificate as Chasi/ Hele/Halia Kaibarta.

Yours faithfully ,

Sd/-
Deputy Director
Cultural Research Institute

[illegible]

Dated:14/12/2005

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ
কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর রিপোর্টে
উল্লেখ কৈবর্ত জাতি (চাষি কৈবর্ত অথবা মাহিষ্য)।

সংযোজনী- ১৯

সরকারি দলিলে লেখা বিহারী ভুঁই-এর জাতি- চাষী কৈবর্ত অর্থাৎ মাহিষ্য

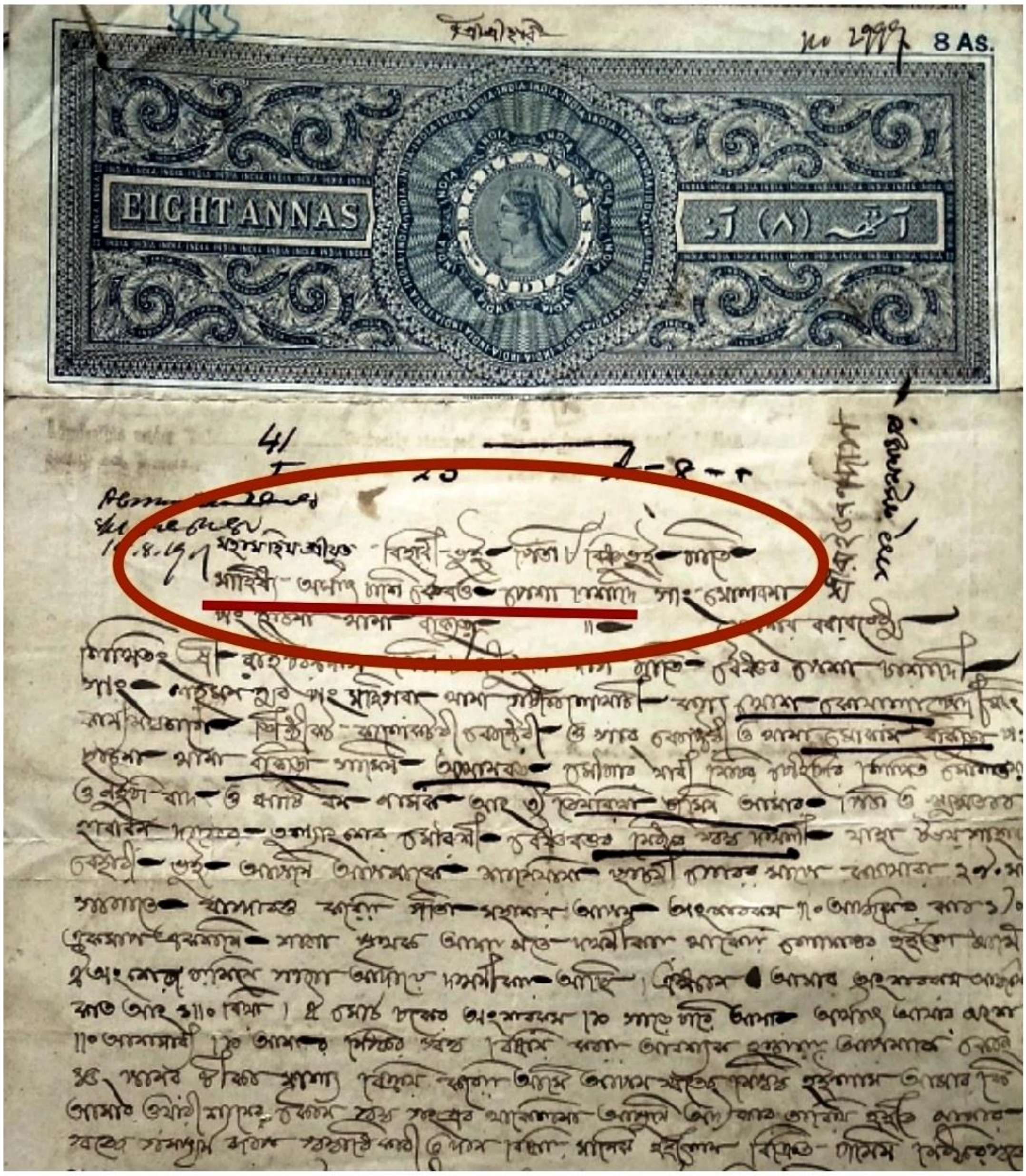

১৯০১ সালের সরকারি দলিলে উল্লিখিত
শ্রী বিহারী ভুঁই জাতি মাহিষ্য অর্থাৎ চাশি কৈবর্ত্ত

সংযোজনী- ২০

মাহিষ্য কল্যাণ সমিতিকে লেখা সরকারি চিঠিতে জাতি- চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য)

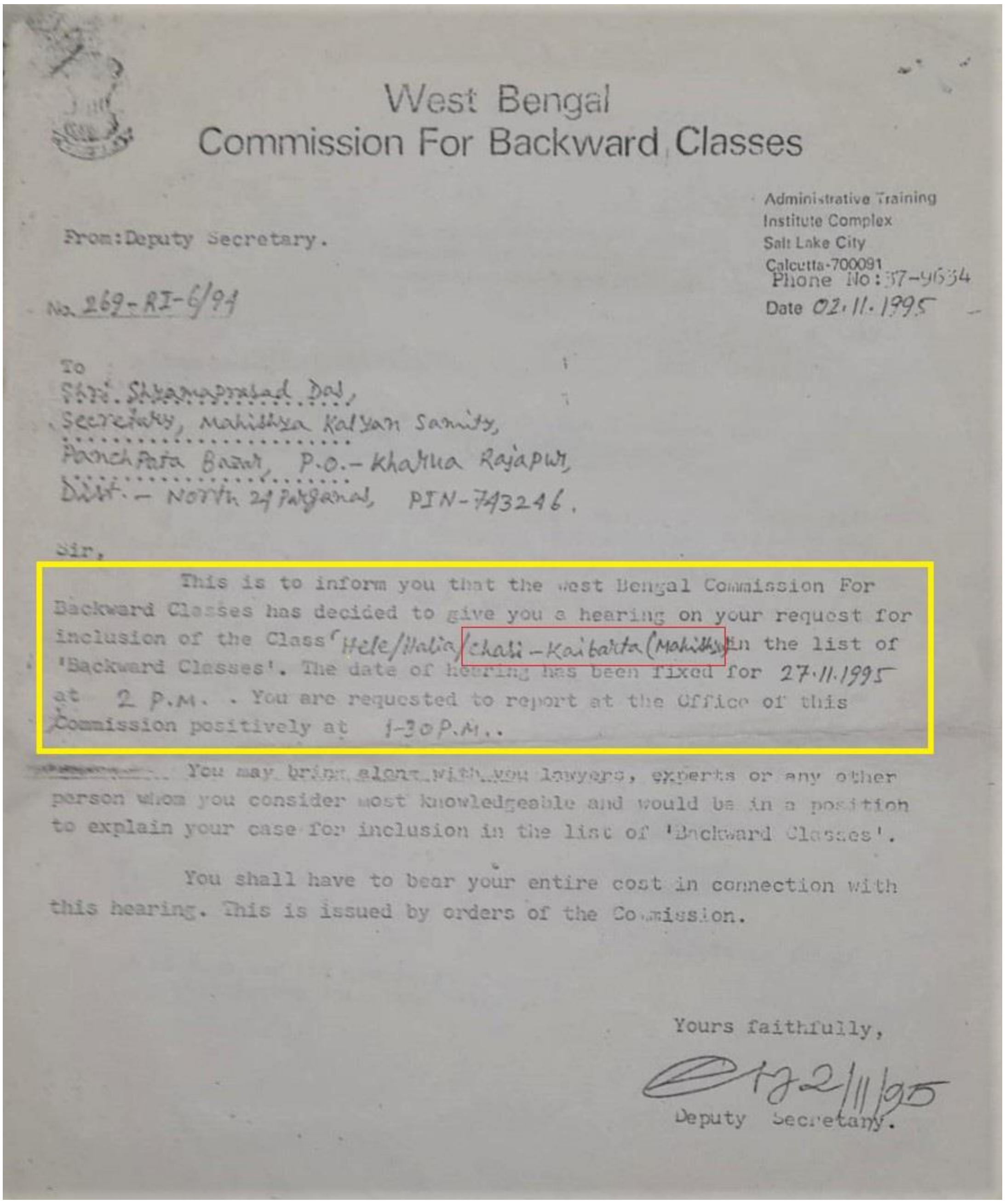

West Bengal
Commission For Backward Classes

From: Deputy Secretary.

Administrative Training
Institute Complex
Salt Lake City
Calcutta-700091
Phone No: 37-9634

No. 269-RI-6/91

Date 02.11.1995

To
Shri. Shyamaprasad Das,
Secretary, Mahishya Kalyan Samity,
Panchpara Bazar, P.O.- Kharua Rajapur,
Dist.- North 24 Parganas, PIN-743246.

Sir,

This is to inform you that the West Bengal Commission For Backward Classes has decided to give you a hearing on your request for inclusion of the Class 'Hele/Halia/Chasi-Kaibarta (Mahishya)' in the list of 'Backward Classes'. The date of hearing has been fixed for 27.11.1995 at 2 P.M. . You are requested to report at the Office of this Commission positively at 1-30 P.M..

You may bring along with you lawyers, experts or any other person whom you consider most knowledgeable and would be in a position to explain your case for inclusion in the list of 'Backward Classes'.

You shall have to bear your entire cost in connection with this hearing. This is issued by orders of the Commission.

Yours faithfully,

2/11/95

Deputy Secretary.

সংযোজনী- ২১

মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় সংবাদপত্রে প্রকাশ

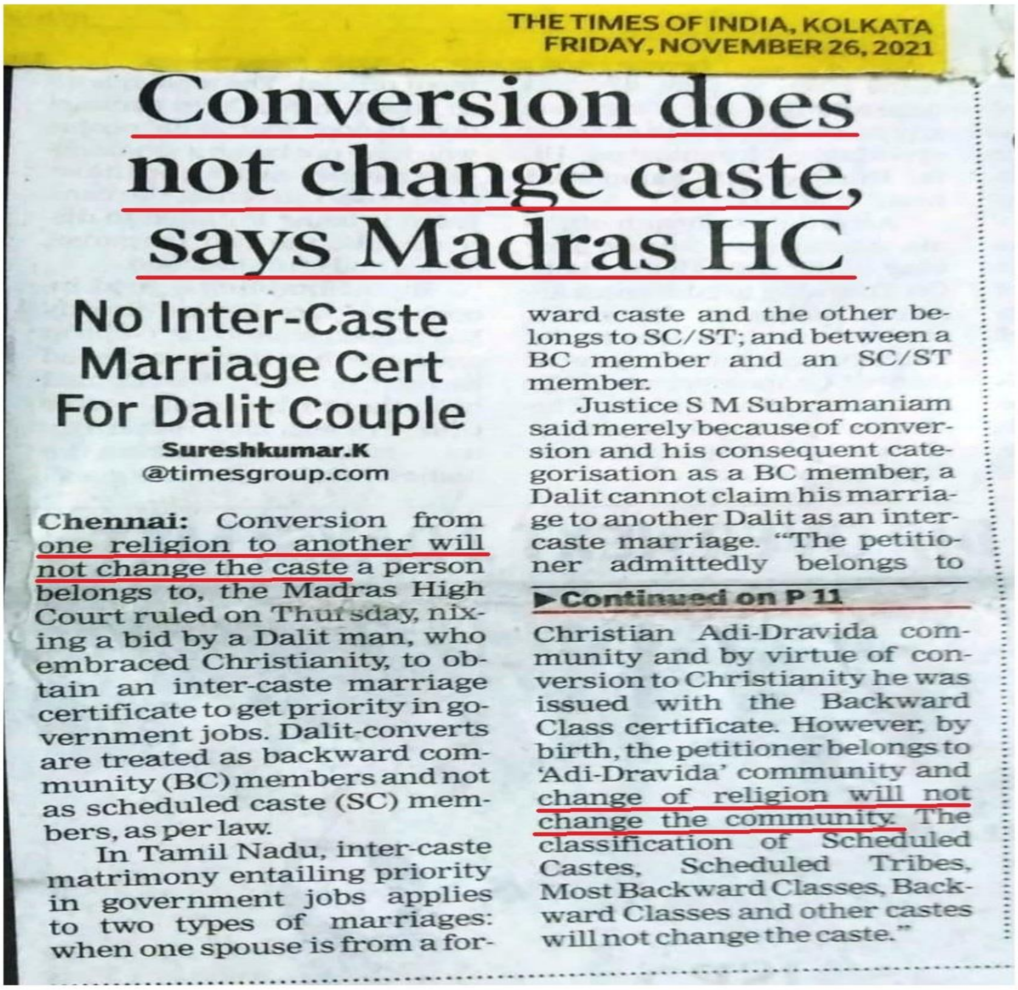

THE TIMES OF INDIA, KOLKATA
FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021

Conversion does not change caste, says Madras HC

No Inter-Caste Marriage Cert For Dalit Couple

Sureshkumar.K
@timesgroup.com

Chennai: Conversion from one religion to another will not change the caste a person belongs to, the Madras High Court ruled on Thursday, nixing a bid by a Dalit man, who embraced Christianity, to obtain an inter-caste marriage certificate to get priority in government jobs. Dalit-converts are treated as backward community (BC) members and not as scheduled caste (SC) members, as per law.

In Tamil Nadu, inter-caste matrimony entailing priority in government jobs applies to two types of marriages: when one spouse is from a forward caste and the other belongs to SC/ST; and between a BC member and an SC/ST member.

Justice S M Subramaniam said merely because of conversion and his consequent categorisation as a BC member, a Dalit cannot claim his marriage to another Dalit as an inter-caste marriage. "The petitioner admittedly belongs to

▶Continued on P 11

Christian Adi-Dravida community and by virtue of conversion to Christianity he was issued with the Backward Class certificate. However, by birth, the petitioner belongs to 'Adi-Dravida' community and change of religion will not change the community. The classification of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Most Backward Classes, Backward Classes and other castes will not change the caste."

ধর্ম পরিবর্তন করলেই জাতি পরিবর্তন করা যায় না।
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২৬ নভেম্বর ২০২১।

<u>সংযোজনী- ২২</u>

সংবাদপত্রে প্রকাশ - অনগ্রসর কমিশনের শুনানিতে হইচই

আ: বা: পত্রিকা ১৫মে ১৯৯৪

মাহিষ্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হবে কি না, কমিশনে হইচই

স্টাফ রিপোর্টার : মাহিষ্যদের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত করা হবে কি না এই নিয়ে রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনে শুক্রবার তুমুল হইচই হয়। এক সময় চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এন সেন শুনানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। বিধাননগরের এ টি আই ভবনে কমিশনের শুনানি চলছে।

আইনজীবী প্রশান্ত গায়েন বলেন, তমলুকের রাজারা ছিলেন মাহিষ্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হয়েছিল তার দুই প্রধান ছিলেন মাহিষ্য। সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া। শতকরা ৭০ ভাগ মাহিষ্যই শিক্ষিত। তাই তাদের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করা উচিত নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কমিশনে উপস্থিত একদল লোক প্রতিবাদ করেন। তাঁরা সবাই একসঙ্গে বলতে থাকেন মাহিষ্যদের ও বি সি তালিকায় রাখতে হবে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এন সেন তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, "এটা ময়দান নয়। সবাইকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন। না হলে শুনানি স্থগিত করে দিতে বাধ্য হব।"

প্রশান্ত গায়েন বলেন, "কলকাতা শহরে তিনজন মহিলার মূর্তি আছে। তাঁদের দু' জন মাহিষ্য সম্প্রদায়ের (মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি রাসমণি)। এটা মাহিষ্যদের গর্ব। তাই মাহিষ্যদের অনগ্রসর বলার অধিকার বা সাহস আমার নেই। অনগ্রসরতার ভিত্তি যদি অর্থনৈতিক কারণ হত তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে মাহিষ্যরা কোনওমতেই পিছিয়ে নেই।"

অনগ্রসর তালিকায় মাহিষ্যদের অন্তর্ভুক্তি চেয়ে ফণি রায় বলেন, "বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাহিষ্যরা অবহেলিত। এম এল এ, এম পি তো বটেই জেলার সভাধিপতি, পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করার সময়েও মাহিষ্যদের কথা ভাবা হয় না। যেখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অন্য কেউ এম এল এ, এম পি হয়ে কলকাতা আসেন বা দিল্লি যান।

কেনই বা মাহিষ্যরা পিছিয়ে? তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে কবে?"

ফণিবাবু আরও জানান, হুগলি জেলার চাষের জমির পরিমাণ দিনকে দিন কমছে। চার বিঘার বেশি জমি কারও নেই। ওই জমি থেকে বছরে আয় হয় ২০ হাজার টাকা। তাতে কি স্যার সংসার চলে? এর পরে ফণিবাবু কমিশনকেই প্রশ্ন করেন, সবই কি আমাদের থেকে জানবেন? সরকারি তথ্য তো কিছু থাকা দরকার।

আইনজীবী এ জানা বলেন, "নদীয়া জেলায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামে একটি মৌজা আছে। সেখানে মাহিষ্যদের মধ্যে একজন মাত্র স্নাতক। পাঁচজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ১০১ জন মাধ্যমিক পাশ করেছেন। তাহলেই বুঝুন স্যার মাহিষ্যরা কত পিছিয়ে আছে।" প্রশান্ত গায়েনকে জমিদারের ছেলে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ওঁকে দিয়ে সবাইকে বিচার করলে চলবে না। কলকাতা বা সল্টলেকে কতজন মাহিষ্য থাকার জায়গা পেয়েছেন তা খোঁজ নিলেই জানা যাবে স্যার।"

মাহিষ্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিরোধ থাকলেও যাদবরা কিন্তু ছিলেন এককাট্টা। যাদবদের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সাধারণ সম্পাদক নিতাইপদ ঘোষ বলেন, "কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম। তারপর কৃষ্ণের শৈশব, বাল্যকাল এবং যৌবনের প্রথমটা কাটে নন্দ ঘোষ বা নন্দ গোপের ঘরে। আমরা সেই নন্দ ঘোষ বা নন্দ গোপের বংশধর। কিন্তু সমাজে আমাদের কোনও স্থান নেই।"

কমিশনের চেয়ারম্যান এ এন সেন এই সময় মন্তব্য করেন, "আপনারা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। আপনারা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হতে চাইছেন। এটা কি ভাল দেখায়! শ্রীকৃষ্ণের বংশধর হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাননি অনগ্রসর শ্রেণীর সুযোগ নিয়ে চাকরি-বাকরি পেলে কি তা ফিরে আসবে?"

নিতাইবাবু বলেন, স্যার অর্থনীতিটাই এখন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূল অবলম্বন। তাই স্যার অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় এলে চাকরি

পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর কমিশনে মাহিষ্যদের অন্তর্ভূক্তির শুনানি,
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯৯৪

সংযোজনী- ২৩

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আবেদন

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আবেদন

গত ৩০ শে মার্চ "বর্তমান" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় কিছু ব্যক্তি এক বিজ্ঞাপনী আবেদনে মাহিষ্য জাতিকে অনগ্রসর তালিকাভুক্তির বিপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, অভিসন্ধিমূলক ও মাহিষ্য স্বার্থবিরোধী। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

মাহিষ্যেরা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ও একক সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি। অধিকাংশই কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। কেহ মাঝারী চাষী, কেহ প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর। এছাড়া আনাজ ব্যবসায়ী, হাস-মুরগী পালক, পান ও ফুলচাষী, ছোট মুদী, নানা ক্ষুদ্র শিল্পের কর্মী, বৃহৎ শিল্পের শ্রমিক ও ঝি-চাকর ইত্যাদি পেশায়, নিযুক্ত যা অগ্রসরবর্গের মধ্যে কদাচিত দেখা যায়।

মাহিষ্যদের শিক্ষিত ১০%। এরমধ্যে স্কুলের শেষ দরজাও অনেকেই পার হতে পারেননি। অথচ উক্ত আবেদনকারীরা বলেছেন মাহিষ্যরা ৭৫% শিক্ষিত। উক্ত ১০% শিক্ষিতের মধ্যেই রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চাকুরে, শিক্ষক, কিছু অধ্যাপক, চিকিৎসক ও আইনজীবি। আর রয়েছে অসংখ্য বেকার। আমরা নমুনা সমীক্ষা মারফৎ জানি মাহিষ্যদের মধ্যে ডাক্তার ২·৫%, ইঞ্জিনীয়ার ১·৫%, আইনজীবি ৩% ও শিক্ষক ৪%। শয়ে শয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ হাইকোর্টের জজ, ৪৮ জন সেক্রেটারী, ১০ ভাইস-চ্যান্সেলরের মধ্যে মাহিষ্য একজনও নেই। মন্ত্রী নেই। বিধায়ক ও সাংসদও নগণ্য। ৭৫% শিক্ষিত হলে সমাজের সর্বস্তরে তার প্রভাব থাকতো। প্রশাসন, সাহিত্য ও গণমাধ্যমগুলিতেও দেখা যেতো। সার্বিক অনগ্রসরতাই এর মূল কারণ। উক্ত আবেদনকারীরা বলেছেন অসংরক্ষিত চাকরীতে কম প্রতিযোগী শ্রেণী থাকায়, শতকরা ১৫/১৬ ভাগ চাকরী মাহিষ্যরা করায়ত্ব করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। অসংরক্ষিত চাকরীর হার হ্রাস পাওয়ার ফলে উচ্চবর্গের শিক্ষিতদের চাপ বাড়বে। উচ্চবর্গের আয়োজিত ও পরিচালিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মাহিষ্যদের অবস্থা হবে আরও সঙ্গীন। উক্ত আবেদনকারীরা কয়েকটি প্রাচীন মাহিষ্য রাজবংশের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যুগ পরিবর্তনের ফলে তারা এখন সাধারণ স্তরেই নেমে এসেছেন। মাহিষ্য সমাজে দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদ জন্মেছেন সত্য। কিন্তু শিক্ষা ও সামাজিকভাবে মাহিষ্যেরা অনুন্নত বলেই আজও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জাতীয় নেতার মর্যাদা পেলেন না। কলকাতার জন্য প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি কর কর্তৃক নির্মিত লোকমাতা রানী রাসমণির মূর্তি আজও সরকারি গুদাম ঘরে বন্দী। আজও ইডেন উদ্যানের নাম 'রানী রাসমণি উদ্যান' হিসাবে নামকরণ হলো না।

বহুদিন যাবৎ উচ্চবর্গ প্রভাবিত রাজনীতিতে মাহিষ্যেরা বঞ্চনা, অবহেলা ও ঘৃণার ফলে রাজনীতি, শিক্ষা, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ। অধিকাংশই দারিদ্র্য সীমার নীচে, কাঁচা মেটে ঘরে বাস করে। অপুষ্টি হেতু ধুকছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সংরক্ষিত চাকরিতে অনগ্রসররা অযোগ্য বিবেচিত হবে উক্ত আবেদনকারীদের এই মন্তব্য সমগ্র তপশিলি, আদিবাসি ও অনগ্রসর শ্রেণীর কাছে অত্যন্ত অপমানকর ও বেদনাদায়ক।

সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ে মণ্ডল কমিশন রিপোর্ট মর্যাদা পেয়েছে এবং সামাজিক পশ্চাদপদতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আমরা সমিতির পক্ষ থেকে মাহিষ্য জাতিকে অনগ্রসর তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জোরালো দাবি রাখছি।

ডাঃ সিদ্ধেশ্বর দাস
সভাপতি

শ্রীনিত্যশরণ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাঁজা
সহ-সভাপতি ও
ও· বি· সি· এ্যাকশান
কমিটির চেয়ারম্যান

ADVT.

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আবেদন,
বর্তমান পত্রিকা, ৭ এপ্রিল ১৯৯৫

<u>সংযোজনী- অতিরিক্ত</u>

নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ থেকে সংগৃহীত কিছু পেপার কাটিং এবং গবেষকের তোলা কিছু প্রাসঙ্গিক ছবি

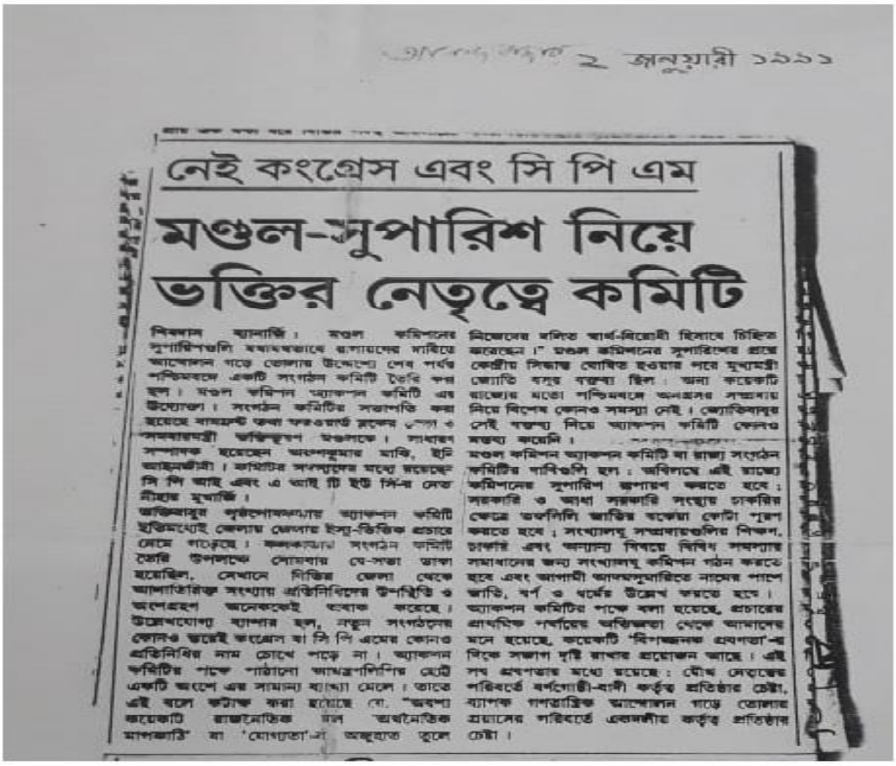

আনন্দবাজার ২ জানুয়ারী ১৯৯১

নেই কংগ্রেস এবং সি পি এম

মণ্ডল-সুপারিশ নিয়ে ভক্তির নেতৃত্বে কমিটি

শিবদাস ব্যানার্জি। মণ্ডল কমিশনের সুপারিশগুলি যথাযথভাবে রূপায়ণের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে একটি সংগঠন কমিটি তৈরি করা হল। মণ্ডল কমিশন অ্যাকশন কমিটি এর উদ্যোক্তা। সংগঠন কমিটির সভাপতি করা হয়েছে বামফ্রন্ট তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের [illegible] সমবায়মন্ত্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডলকে। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন অরুণকুমার মাঝি, ইনি [illegible]। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সি পি আই এবং এ আই টি ইউ সি-র নেতা নীহার মুখার্জি।

ভক্তিবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যাকশন কমিটি ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় ইস্যু-ভিত্তিক প্রচারে নেমে পড়েছে। কলকাতায় সংগঠন কমিটি তৈরি উপলক্ষে সোমবার যে-সভা ডাকা হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে আশাতিরিক্ত সংখ্যায় প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ অনেককেই অবাক করেছে। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, নতুন সংগঠনের কোনও স্তরেই কংগ্রেস বা সি পি এমের কোনও প্রতিনিধির নাম চোখে পড়ে না। অ্যাকশন কমিটির পক্ষে পাঠানো আমন্ত্রণলিপির [illegible] একটি অংশে এর সামান্য ব্যাখ্যা মেলে। তাতে এই বলে কটাক্ষ করা হয়েছে যে, "অবশ্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল 'অর্থনৈতিক মাপকাঠি' বা 'যোগ্যতা'-র অজুহাত তুলে নিজেদের দলিত স্বার্থ-বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।" মণ্ডল কমিশনের সুপারিশের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বক্তব্য ছিল: অন্য কয়েকটি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর সম্প্রদায় নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা নেই। জ্যোতিবাবুর সেই বক্তব্য নিয়ে অ্যাকশন কমিটি কোনও মন্তব্য করেনি।

মণ্ডল কমিশন অ্যাকশন কমিটি বা রাজ্য সংগঠন কমিটির দাবিগুলি হল: অবিলম্বে এই রাজ্যে কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণ করতে হবে; সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থায় চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতির বকেয়া কোটা পূরণ করতে হবে; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা, চাকরি এবং অন্যান্য বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে হবে এবং আগামী আদমসুমারিতে নামের পাশে জাতি, বর্ণ ও ধর্মের উল্লেখ করতে হবে।

অ্যাকশন কমিটির পক্ষে বলা হয়েছে, প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, কয়েকটি 'বিপজ্জনক প্রবণতা'-র দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। এই সব প্রবণতার মধ্যে রয়েছে: যৌথ নেতৃত্বের পরিবর্তে বর্ণগোষ্ঠী-ধনী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসের পরিবর্তে একদলীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ জানুয়ারি ১৯৯১

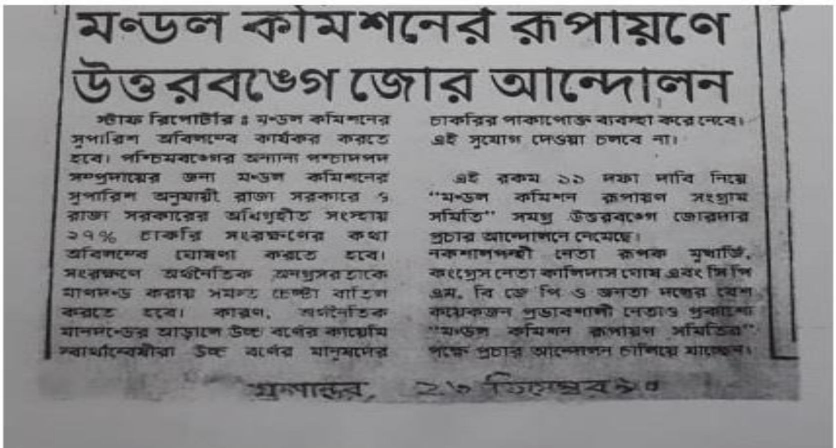

মন্ডল কমিশনের রূপায়ণে উত্তরবঙ্গে জোর আন্দোলন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের জন্য মন্ডল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারে ও রাজ্য সরকারের অধিগৃহীত সংস্থায় ২৭% চাকরি সংরক্ষণের কথা অবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে। সংরক্ষণে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে মাপদন্ড করায় সমস্ত চেষ্টা বাতিল করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক মানদন্ডের আড়ালে উচ্চ বর্ণের কায়েমি স্বার্থান্বেষীরা উচ্চ বর্ণের মানুষদের চাকরির পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে নেবে। এই সুযোগ দেওয়া চলবে না।

এই রকম ১১ দফা দাবি নিয়ে "মন্ডল কমিশন রূপায়ণ সংগ্রাম সমিতি" সমগ্র উত্তরবঙ্গে জোরদার প্রচার আন্দোলনে নেমেছে। নকশালপন্থী নেতা রূপক মুখার্জি, কংগ্রেস নেতা কালিদাস ঘোষ এবং সি পি এম, বি জে পি ও জনতা দলের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাও প্রকাশ্যে "মন্ডল কমিশন রূপায়ণ সমিতির" পক্ষে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর৯০

যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৯০

Mandal proposals slashed by expert panel

From Our Staff Correspondent

■ The committee, asked to detect discrepancies in the Mandal recommendations and State lists, weeded out double-counting and said income was not the main criterion for reservations

NEW DELHI, July 12. — The expert committee, constituted by the Ministry of Welfare to prepare a fresh list of socially and educationally backward classes after examining the Mandal Commission recommendations, has reduced by one-third the list of those eligible for reservation.

The expert committee, appointed after the Supreme Court verdict on the Mandal Commission report on November 16, 1992, comprises Justices Ram Nandan Prasad, Mr M. L. Sahare, Mr P. S. Krishnan and Mr R. L. Majithia.

The committee put forward its recommendations on the socio-economic criteria in its report submitted in the last week of June.

The Mandal Commission had identified nearly 3,700 castes as backward and eligible for reservation. The then Janata Dal Government had asked the States to prepare a separate list of backward classes.

Confusion reigned since there were major discrepancies between the lists compiled by the Centre and the States, with some of the castes listed not really backward.

The Janata Dal Government directed that a fresh list be prepared after comparing the existing lists.

The committee had, therefore, compiled a common list. According to sources, the committee also weeded out those castes which had been included many times under slightly different names, and had included them under one name.

In cases where certain castes are known by different names, particularly those of artisans and other professions, the committee, which has included all of them in the list, has asked the Government to give a common name.

The committee also said several castes listed in the Mandal report no longer existed. Those names had been removed from the list.

Sources said the committee had recommended setting up of separate commissions at the Central and State levels to deal with Central and State services.

Earlier, the expert committee, in a separate report, had specified the criteria for identification of socially advanced persons among the socially and economically backward classes.

It said the main consideration for reservation — going by the Supreme Court's verdict — was not income, though economic backwardness was the corollary of social and educational backwardness.

Therefore, it said, the factors determining who would be denied the benefits of reservations "would be the social and educational factors and only when the advancement in this regard is such as to put that person at par with the forward classes that he may be placed in the excluded category."

Explaining in its report what the term "creamy layer" implies, the committee stated: "When a person has been able to shed off the attributes of social and educational backwardness and has secured employment or has engaged himself in some trade or profession of high status, he, at that stage is no longer in need of reservation for himself."

Statesman 1993

স্টেটসম্যান, ১২ জুলাই ১৯৯৩

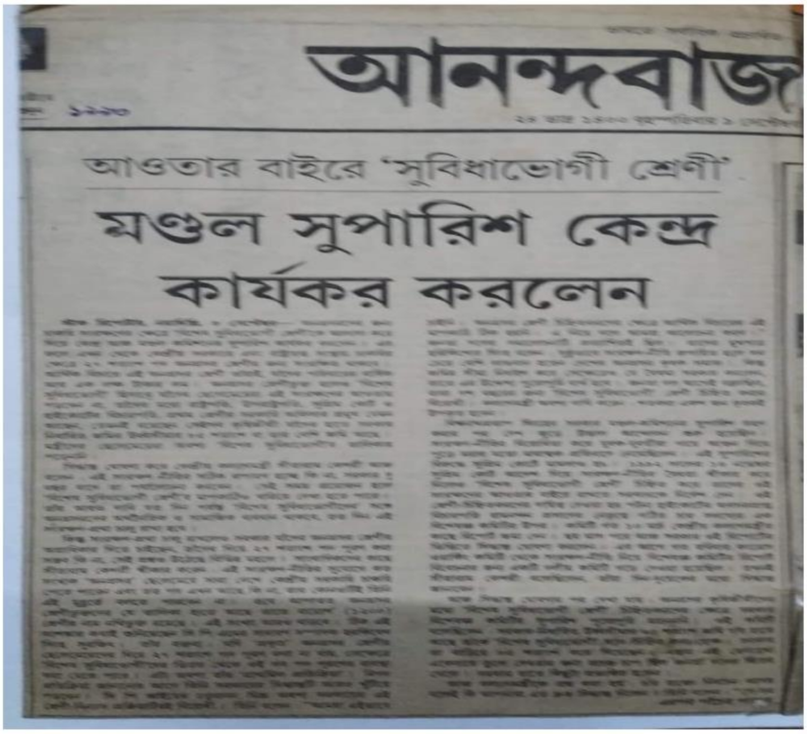

আনন্দবাজা

আওতার বাইরে 'সুবিধাভোগী শ্রেণী'

মণ্ডল সুপারিশ কেন্দ্র কার্যকর করলেন

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

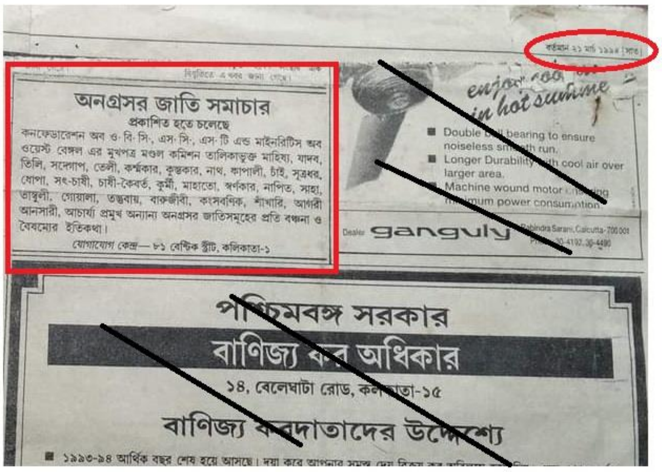

বর্তমান ২১ মার্চ ১৯৯৪

অনগ্রসর জাতি সমাচার

প্রকাশিত হতে চলেছে

কনফেডারেশন অব ও·বি·সি·, এস·সি·, এস·টি এন্ড মাইনরিটিস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল এর মুখপত্র মণ্ডল কমিশন তালিকাভুক্ত মাহিষ্য, যাদব, তিলি, সদ্গোপ, তেলী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, নাথ, কাপালী, চাঁই, সূত্রধর, ধোপা, সৎ-চাষী, চাষী-কৈবর্ত, কুর্মী, মাহাতো, স্বর্ণকার, নাপিত, সাহা, তাম্বুলী, গোয়ালা, তন্তুবায়, বারুজীবী, কংসবণিক, শাঁখারি, আগরী আনসারী, আচার্য্য প্রমুখ অন্যান্য অনগ্রসর জাতিসমূহের প্রতি বঞ্চনা ও বৈষম্যের ইতিকথা।

যোগাযোগ কেন্দ্র— ৮১ বেন্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাণিজ্য কর অধিকার

১৪, বেলেঘাটা রোড, কলকাতা-১৫

বাণিজ্য করদাতাদের উদ্দেশ্যে

বর্তমান, ২১ মার্চ ১৯৯৪

মাহিষ্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হবে কি না, কমিশনে হইচই

স্টাফ রিপোর্টার : মাহিষ্যদের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত করা হবে কি না এই নিয়ে রাজ্য অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনে শুক্রবার তুমুল হইচই হয়। এক সময় চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এন সেন শুনানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন। বিধাননগরের এ টি আই ভবনে কমিশনের শুনানি চলছে।

আইনজীবী প্রশান্ত গায়েন বলেন, তমলুকের রাজারা ছিলেন মাহিষ্য। পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হয়েছিল তার দুই প্রধান ছিলেন মাহিষ্য। সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া। শতকরা ৭০ ভাগ মাহিষ্যই শিক্ষিত। তাই তাদের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্ত করা উচিত নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কমিশনে উপস্থিত একদল লোক প্রতিবাদ করেন। তাঁরা সবাই একসঙ্গে বলতে থাকেন মাহিষ্যদের ও বি সি তালিকায় রাখতে হবে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এন সেন তাদের ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন, "এটা ময়দান নয়। সবাইকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন। না হলে শুনানি স্থগিত করে দিতে বাধ্য হব।"

প্রশান্ত গায়েন বলেন, "কলকাতা শহরে তিনজন মহিলার মূর্তি আছে। তাঁদের দু' জন মাহিষ্য সম্প্রদায়ের (মাতঙ্গিনী হাজরা এবং রানি রাসমণি)। এটা মাহিষ্যদের গর্ব। তাই মাহিষ্যদের অনগ্রসর বলার অধিকার বা সাহস আমার নেই। অনগ্রসরতার ভিত্তি যদি অর্থনৈতিক কারণ হত তা হলে আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে মাহিষ্যরা কোনওমতেই পিছিয়ে নেই।"

অনগ্রসর তালিকায় মাহিষ্যদের অন্তর্ভুক্তি চেয়ে ফণি রায় বলেন, "বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাহিষ্যরা অবহেলিত। এম এল এ, এম পি তো বটেই জেলার সভাধিপতি, পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করার সময়েও মাহিষ্যদের কথা ভাবা হয় না। যেখানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানেও অন্য কেউ এম এল এ, এম পি হয়ে কলকাতা আসেন বা দিল্লি যান। মহাকরণে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখুন মাহিষ্যরা নেই। কেন এই অবস্থা? কেনই বা মাহিষ্যরা পিছিয়ে? তাদের সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে কবে?"

ফণিবাবু আরও জানান, হুগলি জেলার চাষের জমির পরিমাণ দিনকে দিন কমছে। চার বিঘার বেশি জমি কারও নেই। ওই জমি থেকে বছরে আয় হয় ২০ হাজার টাকা। তাতে কি স্যার সংসার চলে? এর পরে ফণিবাবু কমিশনকেই প্রশ্ন করেন, সবই কি আমাদের থেকে জানবেন? সরকারি তথ্য তো কিছু থাকা দরকার।

আইনজীবী এ জানা বলেন, "নদীয়া জেলায় কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামে একটি মৌজা আছে। সেখানে মাহিষ্যদের মধ্যে একজন মাত্র স্নাতক। পাঁচজন উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ১০১ জন মাধ্যমিক পাশ করেছেন। তাহলেই বুঝুন স্যার মাহিষ্যরা কত পিছিয়ে আছে।" প্রশান্ত গায়েনকে জমিদারের ছেলে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "ওঁকে দিয়ে সবাইকে বিচার করলে চলবে না। কলকাতা বা সল্টলেকে কতজন মাহিষ্য থাকার জায়গা পেয়েছেন তা খোঁজ নিলেই জানা যাবে স্যার।"

মাহিষ্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিরোধ থাকলেও যাদবরা কিন্তু ছিলেন এককাট্টা। যাদবদের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলে বঙ্গীয় যাদব মহাসভার সাধারণ সম্পাদক নিতাইপদ ঘোষ বলেন, "কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম। তারপর কৃষ্ণের শৈশব, বাল্যকাল এবং যৌবনের প্রথমটা কাটে নন্দ ঘোষ বা নন্দ গোপের ঘরে। আমরা সেই নন্দ ঘোষ বা নন্দ গোপের বংশধর। কিন্তু সমাজে আমাদের কোনও স্থান নেই।"

কমিশনের চেয়ারম্যান এ এন সেন এই সময় মন্তব্য করেন, "আপনারা শ্রীকৃষ্ণের বংশধর। আপনারা অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হতে চাইছেন। এটা কি ভাল দেখায়! শ্রীকৃষ্ণের বংশধর হয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাননি অনগ্রসর শ্রেণীর সুযোগ নিয়ে চাকরি-বাকরি পেলে কি তা ফিরে আসবে?"

নিতাইবাবু বলেন, স্যার অর্থনীতিটাই এখন সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূল অবলম্বন। তাই স্যার অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় এলে চাকরি পাবে আমাদের ছেলে মেয়েরা।

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ মে ১৯৯৪

30-3-95 **মাহিষ্যদের প্রতি আবেদন** (Thursday.)

পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মাহিষ্য জাতিকে অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার একটা চেষ্টা চলছে। সাধারণভাবে মাহিষ্যদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে ও. বি. সি. র মধ্যে ঢুকলে সরকারী চাকরী পেতে বা সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মাহিষ্য ছেলেমেয়েরা বিশেষ সুবিধা পাবে।

প্রকৃত হিসাব করে দেখা যাক ব্যাপারটা সত্য না মিথ্যা। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান জনসংখ্যা মোট প্রায় ৭ কোটির মত।

তার মধ্যে তপশিলী ও উপজাতি—প্রায় ২ কোটি, তাদের জন্য সংরক্ষিত ২২ ভাগ, ও.বি.সি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতিসমূহ প্রায় ২ কোটি, তাদের জন্য সংরক্ষিত ২৭ ভাগ, মুসলমান প্রায় ৬০ লক্ষ, প্রস্তাবিত সংরক্ষন ৭ ভাগ। খৃষ্টান বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায় প্রায় ২ লক্ষ।

তথাকথিত অগ্রসর জাতিসমূহ—প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ, তাদের জন্য বাদবাকী ৪৪ ভাগ। মাহিষ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি।

(১) যদি মাহিষ্যরা ও. বি. সি. তে যায় তাহলে ২ কোটির সঙ্গে আরও ১ কোটি যুক্ত হবে। অর্থাৎ ১৬৭টি সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষিত ২৭ ভাগের মধ্যে মাহিষ্যদের ভর্তি এবং চাকরীর জন্য লড়তে হবে। (২) অন্যদিকে তথাকথিত অগ্রসরদের সঙ্গে থাকলে ১ কোটি ৪০ লক্ষ + ১ কোটি=২ কোটি ৪০ লক্ষের জন্য রক্ষিত ৪৪ ভাগের মধ্যে মহিষ্যদের লড়তে হবে। ঠিক কথা অনগ্রসরদের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কম। কিন্তু ২৫/২৬ টি সম্প্রদায় ছাড়া অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা জোর হবে এবং সেখানে খুব বেশী হলে ৮/১০ ভাগের বেশী সুযোগ মাহিষ্যরা চেষ্টা করে ও কব্জা করতে পারবেন না। অন্যদিকে অগ্রসরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হলেও ১৫/১৬ ভাগ সুযোগ মাহিষ্যদের করায়ত্ত হতে বাধ্য। **মনে রাখবেন ১৯৩১ সালের পর জাতিভিত্তিক কোন আদমসুমারী (census) আমাদের দেশে হয়নি।**

একথাও বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, যারা মেধাবী বা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁদের জন্য জেনারেল ক্যাটেগোরীর দরজা খোলা আছে। কিন্তু যারা মেধাবী বা যোগ্যতা সম্পন্ন তারাও নিজেদের সুযোগটাকে আরও পাকা করার জন্য যতটা সম্ভব ঝুঁকি এড়িয়ে চলেন। দরখাস্তে একবার ও. বি. সি. র উল্লেখ থাকলে তা আর জেনারেল ক্যাটেগোরীতে বিবেচ্য হবে না। এটাই হল পদ্ধতি।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তিত নীতির ফলে **বহুজাতিক সংস্থা ও বিদেশী লগ্নী বিপুলভাবে ভারতে ঢুকতে শুরু করেছে।** অধিকাংশ সরকারী সংস্থাও ধীরে-ধীরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে চলে যাচ্ছে। একমাত্র সরকারী সংস্থা ছাড়া এই সব বিদেশী বা দেশী প্রাইভেট কোম্পানী গুলিতে কোটা বা সংরক্ষণের কোন সুযোগ নেই। সংরক্ষিত কোটাতে পাশ করা ছেলে, মেয়েদের সাধারণভাবে অযোগ্য বলেই ধরা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু দেরীতে হলেও বর্তমান অবস্থাটা উপলব্ধি করে বলে দিয়েছেন—কাজ পেতে হলে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট ১৯৯২ সালের এক রায়ে বলেছেন-গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের মাপকাঠি প্রধানত যোগ্যতার উপর নির্ভর করবে।

এই যোগ্যতার সংগ্রামে মাহিষ্যরা আজ পুরোধা। শয়ে-শয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবহারজীবি, অধ্যাপক এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মাহিষ্যরা আজ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন।

জানেন কী ও. বি. সি. কমিশনে অনগ্রসরতার মাপকাঠি অর্থনৈতিক নয় তাহল সামাজিকতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা।

মাহিষ্য মাত্রই জানেন এই দুদিক থেকে আমরা এখন আর কোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে পিছিয়ে নেই। লোকমাতা রাসমণি, বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী যে সম্প্রদায়কে মহিমামণ্ডিত করেছেন তার সামাজিক পরিচিতি বাহুল্যমাত্র। প্রাক স্বাধীনতা যুগের ১০ ভাগ থেকে আজ মাহিষ্যরা ৭৫ ভাগ শিক্ষিত।

দাসত্ব আত্মসম্মানজ্ঞানহীন মানুষের পরিণতি। এই দাসত্বের বিরুদ্ধে-রাসমনি, বীরেন্দ্রনাথ, বসন্ত বিশ্বাস, মাতঙ্গিনী, আলামোহনরা যে সর্বতোমুখী সংগ্রাম করে গিয়েছেন আমরা তাঁদেরই বংশধর। এই হীনমণ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপনারাও আমাদের সাথী হোন।

বিনীত

রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (তমলুক), রবিকুমার দাস (কর্মবীর আলামোহন দাশের পুত্র), কুশল চৌধুরী (সেক্রেটারী দক্ষিণেশ্বর কালী টেম্পল ও দেবোত্তর এষ্টেট); সতীশচন্দ্র মাইতি (জাতীয় শিক্ষক) অধ্যাপক সুধাংশু শেখর ভৌমিক (তমলুক), দীপক কুমার সরকার (ইঞ্জিনীয়র), অসিত সামন্ত (প্রাক্তন মাহিষ্য সমাজ সভাপতির পুত্র), জীবানন্দ বাহুবলীন্দ্র (ময়নাগড় রাজবাড়ী), গজেন্দ্র মহাপাত্র (তুর্কাগড় রাজপরিবার), স্বদেশ রঞ্জন ভৌমিক (অবসরপ্রাপ্ত-জয়েন্ট ডিরেক্টর; কৃষি বিভাগ, প: ব: সরকার) অধ্যাপক প্রদ্যোতকুমার মাইতি এম. এ., পি. এইচ. ডি (লন্ডন) ডি-লিট (যাদবপুর) অধ্যাপিকা বুলবুল গায়েন, ডঃ প্রণবকুমার মাইতি, এম. বি. বি. এস (কলকাতা), এফ. আর. সি. ও. জি (লন্ডন)

যোগাযোগের ঠিকানা : রাজেন্দ্র কুমার বেরা, ৪৬ বলরাম বোস ফার্স্ট লেন : কলি-৭০০০২০

- BARTAMAN -

বর্তমান, ৩০ মার্চ ১৯৯৫

বিশেষ আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের মাহিষ্য ভাইবোনেরা জানেন যথার্থ তদন্ত করে মণ্ডল কমিশন মাহিষ্য জাতিকে O.B.C তালিকাভুক্ত করেছেন। হাজার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও পঃবঃ সরকার নিয়োজিত 'সেন কমিশন' মাহিষ্যদের O.B.C তালিকাভুক্ত করতে শুধু টালবাহানা করছে। এই জাতের কিছু ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী ৯৯% অবহেলিত পিছিয়ে পড়া মাহিষ্যদের দাস-শ্রমিক-মজুর করে রাখবার জন্যে সংবাদপত্রে মিথ্যা প্রচার করে সংরক্ষণের বিরোধিতা করছেন। এঁরা জানেন না পঃ বঙ্গের প্রায় দেড়কোটি মাহিষ্যদের এখনও ৭০% নিরক্ষর। তারা গ্রাম-বস্তীতে মাটির/বেড়ার চালাঘরে বাস করে। ঝড়-বৃষ্টি অনাহারে সর্পাঘাতে মরে। মাঠে, ঝোপে শৌচ করে। এদের অধিকাংশই ভাগচাষী, দীনমজুর। এদের শিশুরা জন খাটে, মেয়েরা ঝি-এর কাজ করে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার প্রায় ২৫% মাহিষ্য, ক'জন MLA/MP বা সিলেকশন কমিটির মেম্বার আছেন? ক'জন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, সরকারি উচ্চপদস্থ আছেন? আপনারা জানেন, বীরেন শাসমলকে "কেওট", মাতঙ্গিনীকে শূদ্রাণী, রাণী রাসমনিকে 'ছোট জাতের মেয়ে', আভা মাইতিকে 'ঝি' বলে অপমান করা হয়েছিল। সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে উন্নত হওয়াটা হীনমন্যতা নয়। এতে অযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় না। এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। চক্রান্তকারীদের অপপ্রচারে কান দেবেন না। তাই সর্বস্তরের মাহিষ্য ভাইবোনদের কাছে আবেদন, সব দুর্বলতা প্রলোভন, আভিজাত্য ও রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গ্রামে ব্লকে মাহিষ্য সমিতি গড়ে মিটিং মিছিল করে ঐক্যবদ্ধভাবে ন্যায্য দাবী আদায়ে সোচ্চার হন। আমাদের দাবী— মাহিষ্যদের O.B.C এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা ও কৃষিতে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ মাহিষ্য ঐক্য সমিতির পক্ষে—

শ্রী সুবল চন্দ্র মণ্ডল [রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক]
গ্রাম- লালপুর, পোঃ- চাকদহ, নদীয়া।

বর্তমান, ২০ মে ১৯৯৫

২৮ মার্চ ২০০৫ বর্তমান [৯]

আপনি কি মাহিষ্য ? ওবিসি ?

মাহিষ্যদের জাতি নাম (CASTE NAME) — 'চাষী-কৈবর্ত'

"Nearly all Kaibarttas are cultivating Kaibarttas or Mahisyas. The name Mahisya is a new one adopted since the Census of 1901." Bengal District Gazetteers 1911. Reprint, Bikash Bhavan, Edu. Dept., Salt Lake

আপনার বংশের ১০০ বৎসরের পুরাতন পারিবারিক দলিলে আপনার / জ্ঞাতি ভাই-এর ঠাকুরদার পিতা / পিতামহের জাতি-কৈবর্ত লিপিভুক্ত (রেজিঃ অফিসে খোঁজ নিন)।

পাড়ায় পাড়ায় চাষী-কৈবর্ত সমাজ গঠন করুন

অঞ্চল প্রধান /এম.এল.এ.-র নিকট হতে জাতি শংসাপত্র
(চাষী কৈবর্ত ওবিসি সার্টিফিকেট) সংগ্রহ করুন।
প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর, সরকারী বৃত্তি পাওয়া যাবে।
এস.ডি.ও.-র সার্টিফিকেট থাকলে সরকারী চাকরীতে সংরক্ষণ।

অ্যাসোসিয়েসন অব্ চাষী-কৈবর্ত কমিউনিটি
যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ ৬৩/4, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৭১১ ১০৪
শ্রী শান্তিরঞ্জন সামন্ত (সম্পাদক) ফোন ঃ (০৩৩) ২৬৪২ ০৩১৫ (সন্ধ্যা)

বর্তমান, ২৮ মার্চ ২০০৫

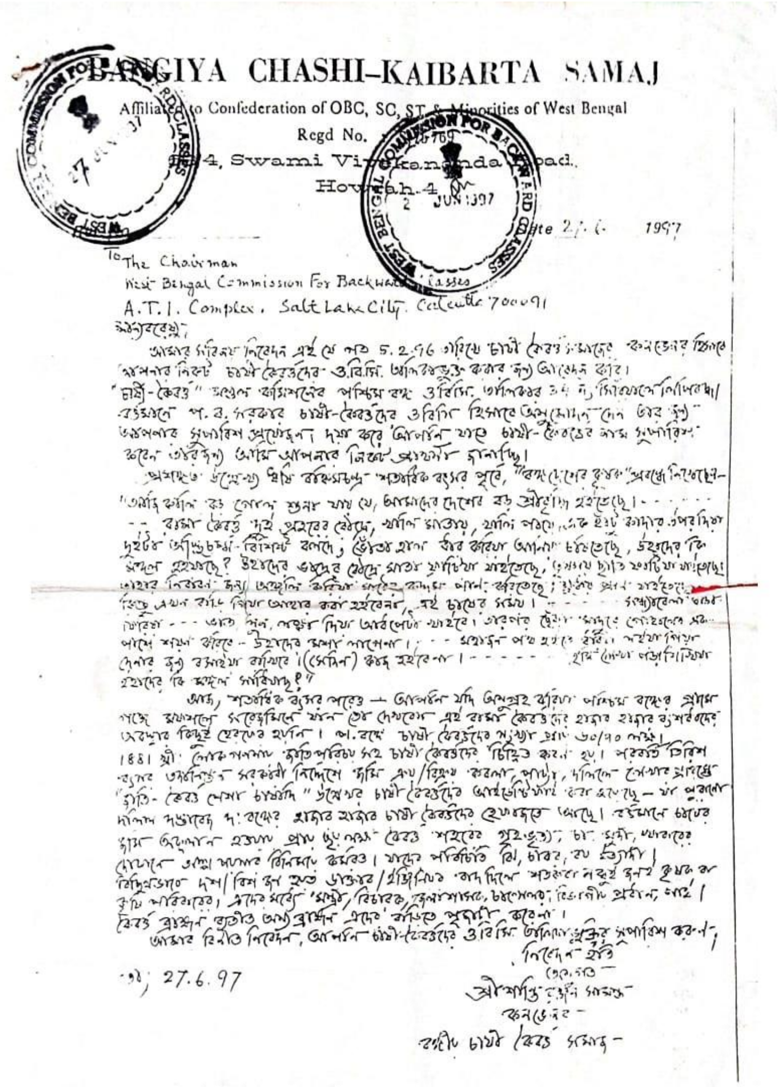

BANGIYA CHASHI-KAIBARTA SAMAJ

Affiliated to Confederation of OBC, SC, ST & Minorities of West Bengal

Regd No. [illegible]

[illegible]4, Swami Vivekananda Road.

Howrah-4

Date 27.6. 1997

To
The Chairman
West Bengal Commission For Backward Classes
A.T.I. Complex. Salt Lake City. Calcutta 700091

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে গত 5.2.96 তারিখে চাষী কৈবর্ত সমাজের কনভেনর হিসাবে আপনার নিকট চাষী কৈবর্তদের ও.বি.সি. তালিকাভুক্ত করার জন্য আবেদন করি। "চাষী-কৈবর্ত" সম্বন্ধে কমিশনের পশ্চিমবঙ্গ ও.বি.সি. তালিকার [illegible] বর্তমানে প.ব. সরকার চাষী-কৈবর্তদের ও.বি.সি. হিসাবে অনুমোদন দেন তার জন্য আপনার সুপারিশ প্রয়োজন। দয়া করে আপনি যাতে চাষী-কৈবর্তের নাম সুপারিশ করেন তার জন্য আমি আপনার নিকট প্রার্থনা জানাচ্ছি।

[illegible]

আমার বিনীত নিবেদন, আপনি চাষী-কৈবর্তদের ও.বি.সি. তালিকাভুক্তির সুপারিশ করুন।

নিবেদন ইতি

[illegible]; 27.6.97

শ্রী শান্তিরঞ্জন সামন্ত
কনভেনর
বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত সমাজ

বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত সমাজের চিঠি, ২৭ জুন ১৯৯৭

BANGIYA CHASI-KAIBARTTA SAMAJ, 63/4, SWAMI VIVEKANANDA ROAD,
HOWRAH - 711 104

To
The Chairperson,
West Bengal Commission for Backward Classes,
Salt Lake City, A.T.I Complex,
Calcutta 700 091

Date : 5/2/96

চাষীকৈবর্ত
5/2/96

Sub : Inclusion of 'Chasi-Kaibartta' in the State Govt. lists as 'Other Backward Class'.

Respected Sir,

In pursuence of the historical judgement of supreme court dated 16.11.92 in the reservation case relating to socially and educationally Backward classes, I have to state that 'Chasi-Kaibartta' have already been included in the list of other backward classes of West Bengal by the Mandal Commission in the Sl. No. 43. According to Bankim Chandra Chatterjee we see in his writing 'Bankim Rachana Samgraha' vol. 1. Part-I ~~pz~~ eassay, page no. 462, that "Kaibartta is a Backward class community and Das, Dhibar & Kaibartta are same, and after few years kaibartta is devided into two groups such as Jalia Kaibartta and chassi Kaibartta in order to their occupation." Jalia kaibartta ~~have~~ has been already included in the list of scheduled castes in W.B. as per Govt. order No 111(2)-TW/EC .. 7.3.1991.

Population of chasi kaibartta is about seventy lakhs. Most of them are very poor cultivators. - Five percent of the total population of chasi Kaibartta are secondary Exam. passed . 1% of chasi kaibartta are graduate, L.L.B , Doctor Engineer , Master Degree holder etc. So we see that 10% of the total population of West Bengal socially and educationally backward and this very percentage of population belongs to 'chasi kaibartta'.

Under circumstances , I request you to kindly include 'chasi kaibartta as O.B.C. in the list prepared by you for the state of West Bengal. Thank you for your earliest attention.

Yours faithfully,
Santiranjan Samanta
Convener
Bangiya Chasi Kaibartta Samaj

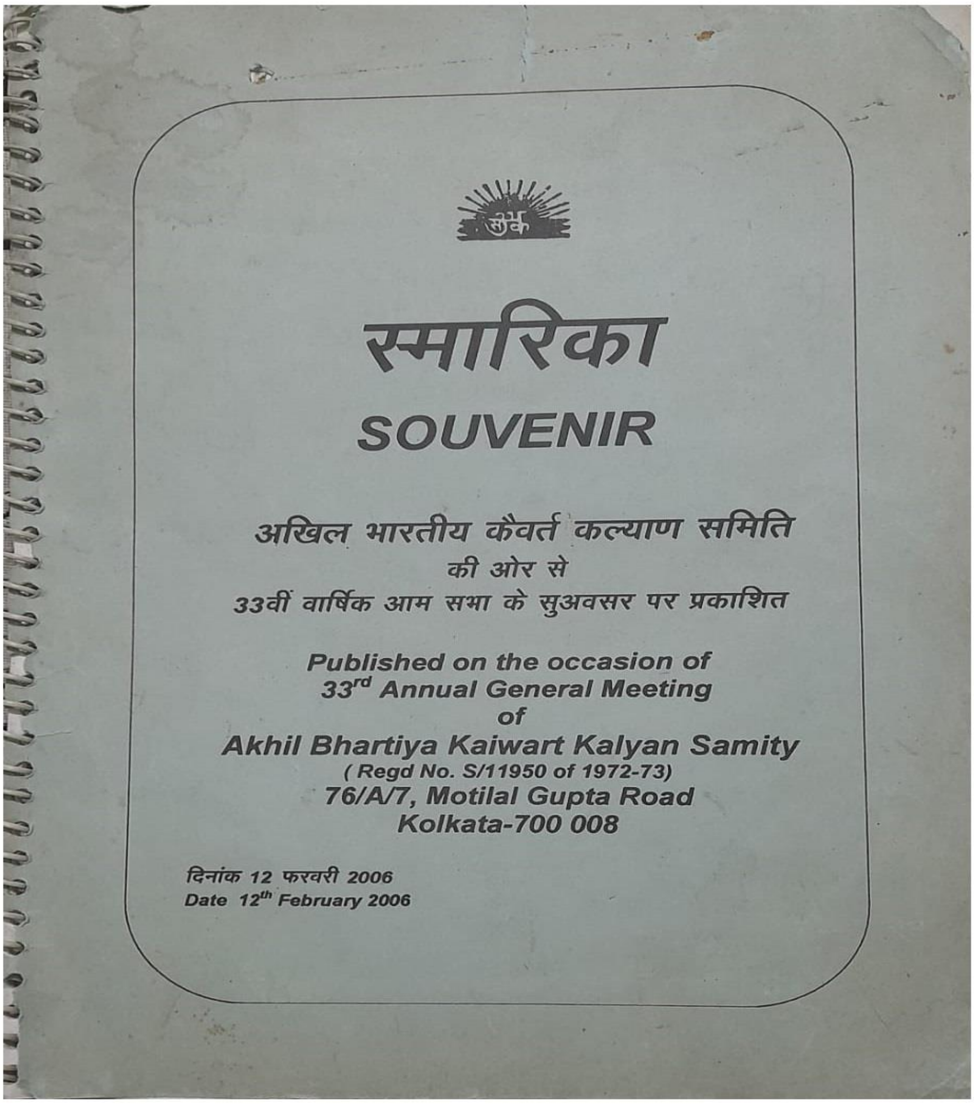

स्मारिका

SOUVENIR

अखिल भारतीय कैवर्त कल्याण समिति
की ओर से
33वीं वार्षिक आम सभा के सुअवसर पर प्रकाशित

Published on the occasion of
33rd Annual General Meeting
of
Akhil Bhartiya Kaiwart Kalyan Samity
(Regd No. S/11950 of 1972-73)
76/A/7, Motilal Gupta Road
Kolkata-700 008

दिनांक 12 फरवरी 2006
Date 12th February 2006

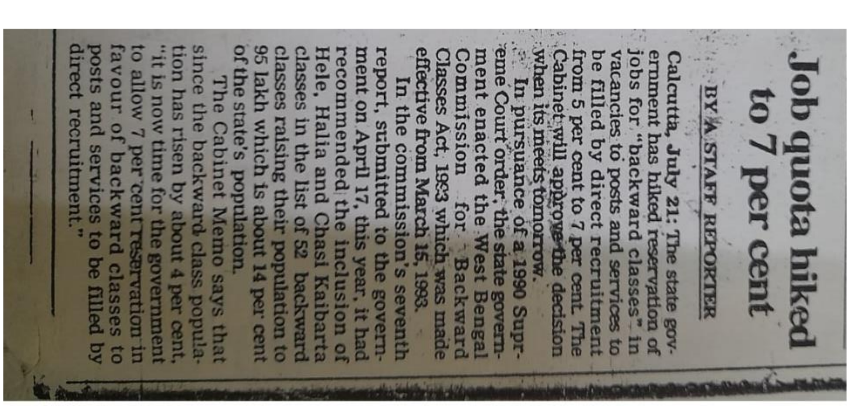

Job quota hiked to 7 per cent

BY A STAFF REPORTER

Calcutta, July 21: The state government has hiked reservation of jobs for "backward classes" in vacancies to posts and services to be filled by direct recruitment from 5 per cent to 7 per cent. The Cabinet will approve the decision when its meets tomorrow.

In pursuance of a 1990 Supreme Court order, the state government enacted the West Bengal Commission for Backward Classes Act, 1993 which was made effective from March 15, 1993.

In the commission's seventh report, submitted to the government on April 17, this year, it had recommended the inclusion of Hele, Halia and Chasi Kaibarta classes in the list of 52 backward classes raising their population to 95 lakh which is about 14 per cent of the state's population.

The Cabinet Memo says that since the backward class population has risen by about 4 per cent, "it is now time for the government to allow 7 per cent reservation in favour of backward classes to posts and services to be filled by direct recruitment."

Telegraph, 21 July 1997

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

৭ এপ্রিল, ১৯৯৮

বন্ধুগণ,

বহুকাল ধরে নানা ঐতিহাসিক কারণে ভারতের বিশাল সংখ্যক মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ ও উপবর্ণ-জনিত ভেদাভেদ রয়ে গেছে। আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এঁদের মধ্যে অনেকেই সমষ্টিগতভাবে বেশ পিছিয়ে পড়ে আছেন। এখানেই আমাদের প্রধান জাতীয় দুর্বলতা। সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, উপবর্ণ ও গোষ্ঠীর মানুষকে জাতীয় মূলস্রোতে শামিল করা একান্ত প্রয়োজন।

পিছিয়ে-পড়া মানুষের জন্য চাকুরিতে ও শিক্ষায় সংরক্ষণ সহ নানা-রকমের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আমাদের সংবিধানে আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের জন্য চাকুরিতে যথাক্রমে শতকরা ২২, ৬ ও ৭ ভাগ সংরক্ষণ চালু করেছে। তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে যথাক্রমে শতকরা ২২ ও ৬ ভাগ সংরক্ষণ চালু আছে। সংরক্ষণের নিয়মভঙ্গ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এ রাজ্যে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে অনগ্রসর মানুষের বড় একটি অংশকে গ্রাম-জীবনে ইতিমধ্যে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা গেছে। এ কাজ চলছে। ভূমি সংস্কার কর্মসূচী ছাড়াও চাকুরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বৃত্তি, এস·সি·পি, টি·এস·পি, আই·আর·ডি·পি, ইন্দিরা আবাস যোজনা, জাতীয় সাফাই-কর্মী কর্মসূচী ইত্যাদি নানা পরিকল্পনা অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে চালু আছে। এই সব কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য অনগ্রসর শ্রেণী সহ শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি সকল স্তরের গণতান্ত্রিক মানুষকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

জ্যোতি বসু

(জ্যোতি বসু)

বর্তমান, ১৪ এপ্রিল ১৯৯৮

মহিলা সংরক্ষণ বিল

একটি সরল অঙ্ক

মে মাসে সংসদের অধিবেশনে মাননীয়া সাংসদ গীতা মুখার্জির বহুলপ্রচারিত মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হতে চলেছে। এটি একটি বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

তাঁর দাবিমত লোকসভা এবং বিধানসভার ৩৩% পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, সমষ্টিগত ভাবে মহিলারা পুরুষশাসিত সমাজে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, বর্তমানে চালু এস সি এবং এস টি-দের জন্য ২২% এবং মহিলাদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ যুক্ত হলে একটি সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে। এইভাবে যদি লোকসভা এবং বিধানসভায় সংরক্ষণ চালু হয়—

এস সি মহিলাদের জন্য	৫%
এস টি মহিলাদের জন্য	২%
ও বি সি মহিলাদের জন্য	১৮%
সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য	৪%
উচ্চবর্ণের অর্থনৈতিক দুর্বল মহিলাদের জন্য	৪%

তা হলে সরল অঙ্ক দাঁড়ায়—

২২%— (৫%+২%) + ৫% + ২% +১৮% + ৪% + ৪% = ৩৯%

অংমঞ্জনের এই পত্রটি প্রকাশের উদারতা আপনার আছে এই আশায়।

শান্তিরঞ্জন সামন্ত। আহ্বায়ক, বঙ্গীয় চাষী-কৈবর্ত সমাজ। ৬৩/৪ স্বামী বিবেকানন্দ রোড। হাওড়া ৪

আজকাল, ১ মে ১৯৯৮

(১৯৪৪ সালে ভারতের বড়োলাট লর্ড ওয়াভেলকে লেখা বাংলার লাট আর.জি. কেসির চিঠিটি পাঁচ পৃষ্ঠার। ১২নং অনুচ্ছেদে তমলুক সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এটি বিশেষ অর্থবহ। এখানে উল্লেখ্য যে 'তাম্রলিপ্তি জাতীয় সরকার' চলেছিল ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত।)

Pol 6289/44
14th August, 1944.

My dear Lord Wavell,

I write in continuation of my last general letter dated 11th July, 1944.

* * *

Para 12. MIDNAPUR SITUATION

The position as regards political crime in the Tamluk Subdivision in the Midnapore District is still difficult. A high proportion of the inhabitants are in sympathy with the local "National Government" or "Jatiya Sarkar" as it calls itself, which has existed since the early days of the congress rebellion. Their more recent and notable performances include sticking pins in the eyeballs of an unfortunate Muslim and thus blinding him, and rubbing salt into wound made in the arm of one of the parties before their "court". Lists of reported cases show a shocking record of outrages, hooliganism, extortion, robbery and intimidation. Recently the position has shown signs of further deterioration. I propose to see that something vigorous is done about it, for it is clearly intolerable that this state of affairs should be permitted to continue. By the way I found the Chief Minister recommending the other day that the collective fines imposed on this area (among others) should be remitted on grounds of prevailing distress. I did not accept his recommendation.

* * *

I am sending copies of this letter to the Governors of Bihar, Assam and Orissa.

His Excellency Field Marshal
The R-t. Hon'ble Viscount Wavell.
G.C.B., G.M.S.I., G.M.I.E., C.M.G., M.C.

I am,
Yours sincerely
Sd. R. G. Casey
(Governor of Bengal)

৯১

বড়োলাট লর্ড ওয়াভেলকে লেখা আর.জি.কেসির চিঠির অংশ,

সূত্র: গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) বিপ্লবীদের মুখোমুখি, প. বঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি, ২০০২, পৃ. ৯১

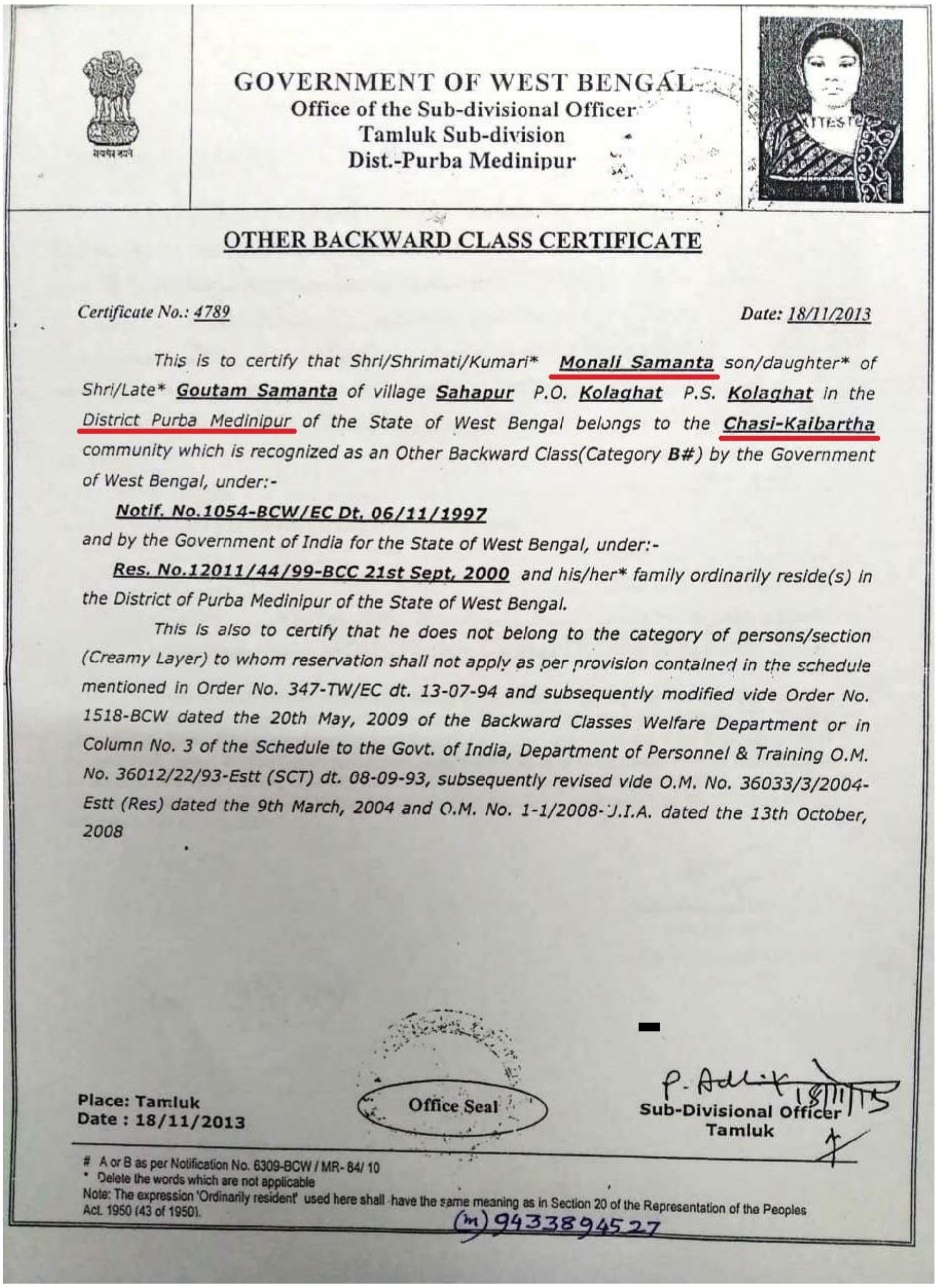

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Sub-divisional Officer
Tamluk Sub-division
Dist.-Purba Medinipur

OTHER BACKWARD CLASS CERTIFICATE

Certificate No.: 4789 *Date: 18/11/2013*

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari **Monali Samanta** son/daughter* of Shri/Late* **Goutam Samanta** of village **Sahapur** P.O. **Kolaghat** P.S. **Kolaghat** in the District Purba Medinipur of the State of West Bengal belongs to the **Chasi-Kaibartha** community which is recognized as an Other Backward Class(Category **B#**) by the Government of West Bengal, under:-*

Notif. No.1054-BCW/EC Dt. 06/11/1997

and by the Government of India for the State of West Bengal, under:-

***Res. No.12011/44/99-BCC 21st Sept, 2000** and his/her* family ordinarily reside(s) in the District of Purba Medinipur of the State of West Bengal.*

This is also to certify that he does not belong to the category of persons/section (Creamy Layer) to whom reservation shall not apply as per provision contained in the schedule mentioned in Order No. 347-TW/EC dt. 13-07-94 and subsequently modified vide Order No. 1518-BCW dated the 20th May, 2009 of the Backward Classes Welfare Department or in Column No. 3 of the Schedule to the Govt. of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dt. 08-09-93, subsequently revised vide O.M. No. 36033/3/2004-Estt (Res) dated the 9th March, 2004 and O.M. No. 1-1/2008-J.I.A. dated the 13th October, 2008

Place: Tamluk
Date : 18/11/2013

Office Seal

P. Adhikari 18/11/15
Sub-Divisional Officer
Tamluk

\# A or B as per Notification No. 6309-BCW / MR- 84/ 10
* Delete the words which are not applicable
Note: The expression 'Ordinarily resident' used here shall have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act. 1950 (43 of 1950).

(m) 9433894527

পূর্ব মেদিনীপুরের মোনালি সামন্ত, চাষি কৈবর্ত জাতি সার্টিফিকেটের নমুনা।

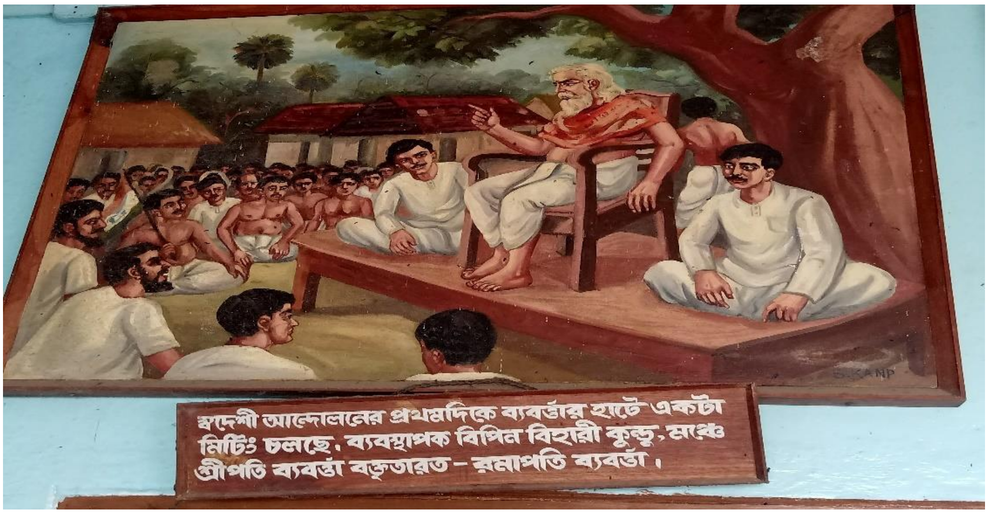
স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমদিকে ব্যবর্ত্তার হাটে একটা
মিটিং চলছে, ব্যবস্থাপক বিপিন বিহারী কুন্ডু, মঞ্চে
শ্রীপতি ব্যবর্ত্তা বক্তৃতারত - রমাপতি ব্যবর্ত্তা।

তমলুক রাজবাড়ীর ভগ্নাংশে লবন সত্যাগ্রহ শিবির:
আচার্য - সতীশ চন্দ্র সামন্ত
উপাচার্য - সুশীল কুমার ধাড়া

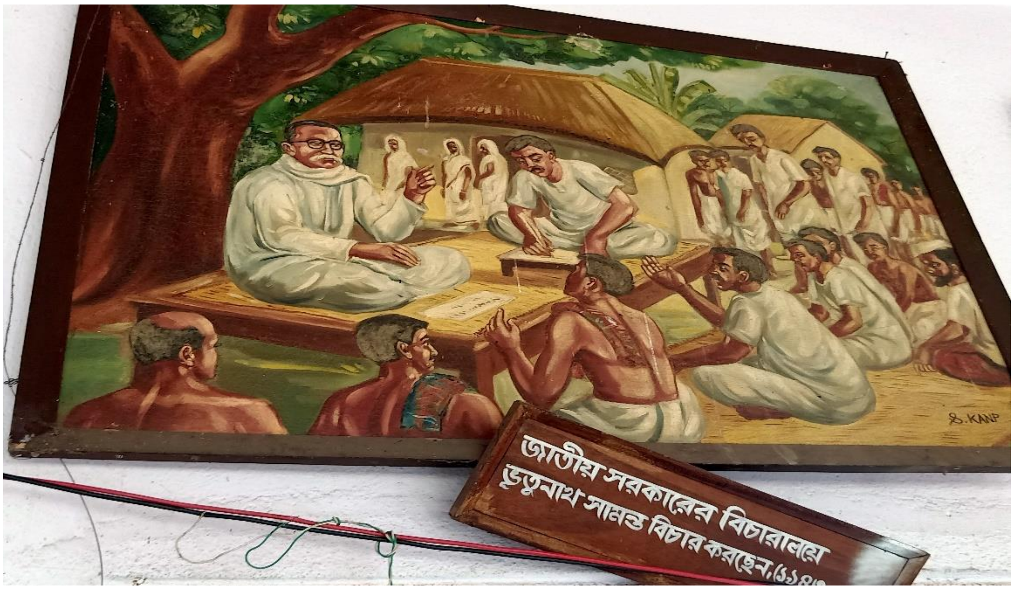
জাতীয় সরকারের বিচারালয়ে
ভূতনাথ সামন্ত বিচার করছেন,

বিদ্যুৎ বাহিনী পতাকা অভিবাদন
করছে (১৯৪২)।

সুলতা দত্ত ও দেবাশীষ দত্ত,
কলেরা রোগীর সেবায় চরখা-তারক, হরিখুড়ো এবং
নারানদার (তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সহায়তায়) সঙ্গে
বালক সুশীল ধাড়া।

সুলতা ও দেবাশীষ
সতীশদার সঙ্গে গান্ধীজীর নিভৃত আলোচনা
(১৯৪৫এর ২৬শে ডিসেম্বর)

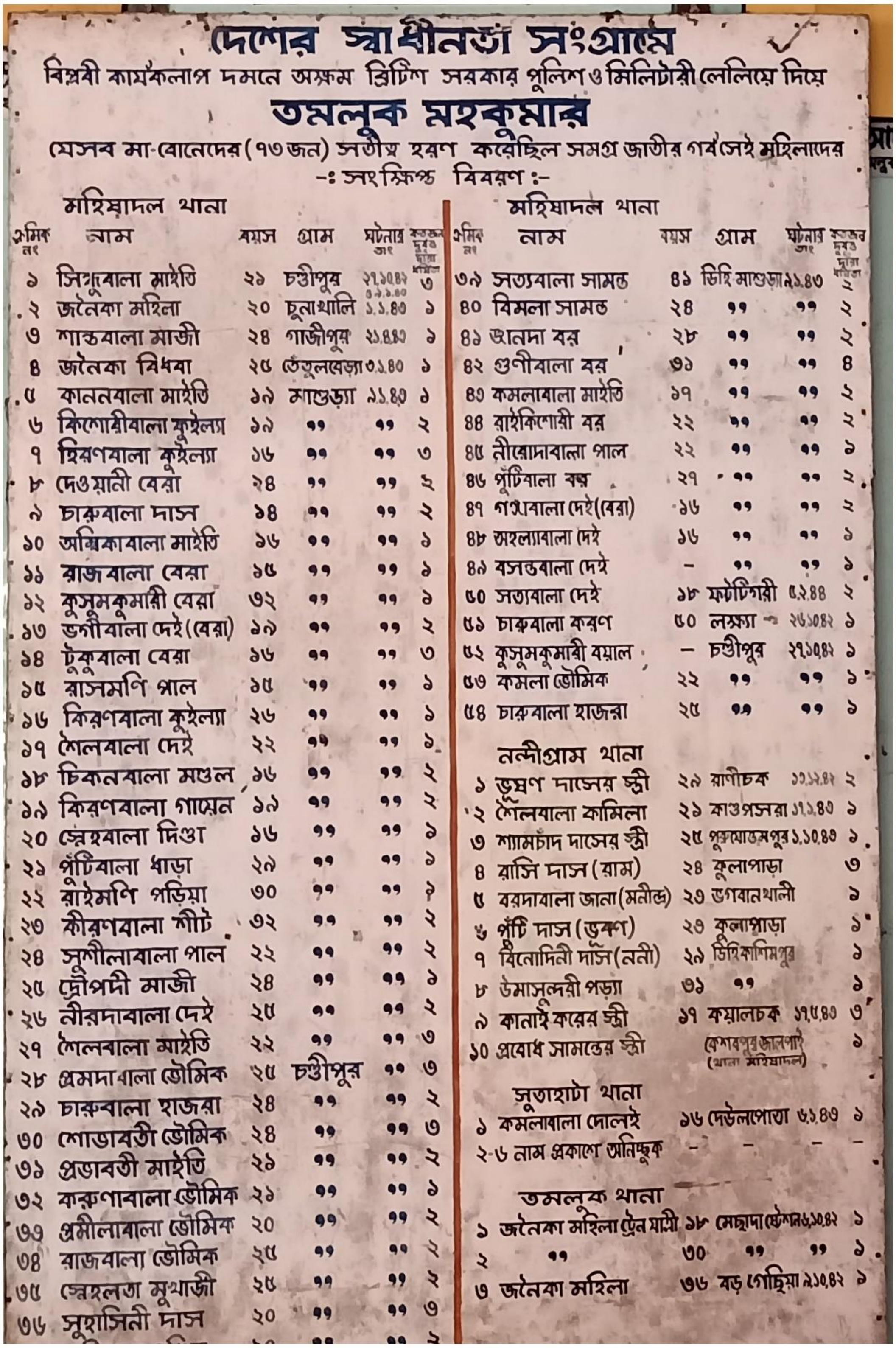

ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ও মিলিটারিদের দ্বারা অত্যাচারের শিকার মেদিনীপুরের মা-বোনেদের সংক্ষিপ্ত তালিকার ফটো, নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ

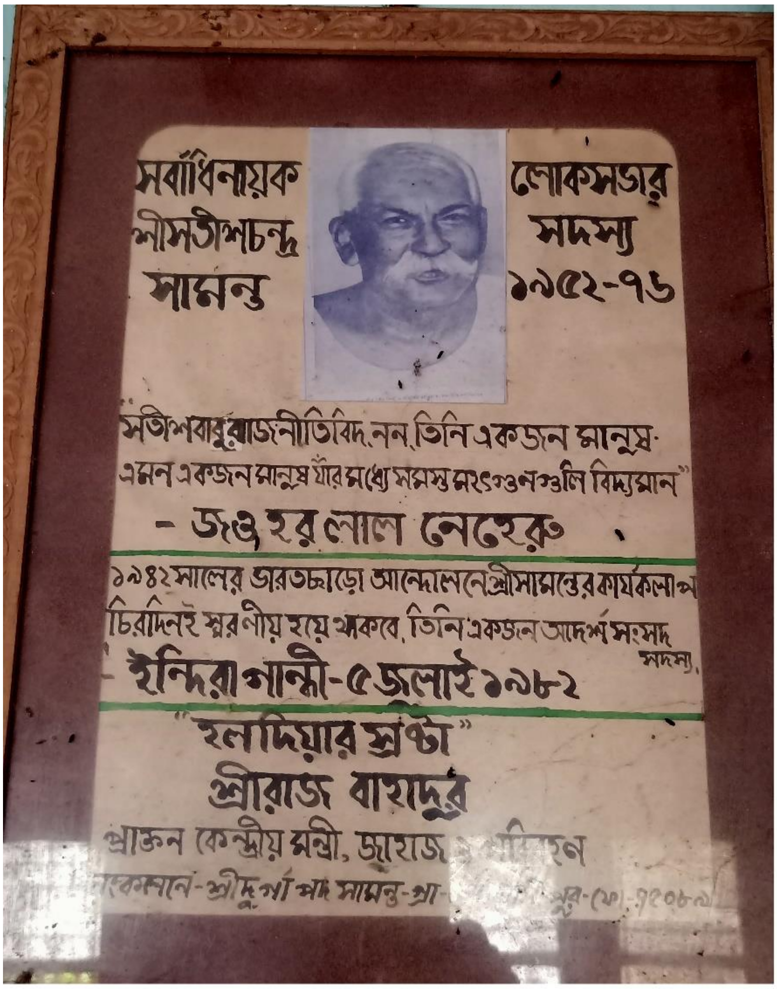

নিমতৌড়ি স্মৃতিসৌধ পাবলিক লাইব্রেরীতে রাখা ফটো থেকে তোলা

১৯৬২ সালে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে মিলিতসংবর্ধনা - সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ধাড়া ও রজনী প্রামানিক মহাশয়কে।
ফটো : রবীন্দ্রনাথ প্রামানিক

মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতির সদস্যবৃন্দ,

প্রথম সারি—(বাম থেকে) : সর্ব্বশ্রী ভূতেশ্বর পড়্যা, বংকিমচন্দ্র পাত্র, পরেশকান্তি দাস, জনাব মাজেদ শাহ, কার্ত্তিক চন্দ্র পাড়ই, শ্যামাচরণ বেরা, চিত্তরঞ্জন মাইতি, অমূল্য কুমার পড়্যা, প্রসন্নকুমার ত্রিপাঠী, ডাঃ রাসবিহারী পাল (কাঁথি) প্রবোধ চন্দ্র মাহাত, বলাইলাল দাস মহাপাত্র, ইন্দুভূষণ কুমার, বংকিম চন্দ্র রায়, ভাস্কর দাস মহাপাত্র, ক্ষুদিরাম গিরি।

দ্বিতীয় সারি—(বাম থেকে) : সর্ব্বশ্রী রামপদ সামন্ত, বংকিমচন্দ্র শাসমল, বলাই হাজরা, কিশোরীমোহন গোস্বামী, শ্যামাপদ রায়, চন্দ্রশেখর রাজপণ্ডিত, তরণীকুমার মেইকাপ, মৃত্যুঞ্জয় জানা, (বাঘাস্তি), বসন্তকুমার দাস, (কাঁথি), বিধুভূষণ জানা, মদনমোহন ঘোষ, পশুপতিনাথ ভট্টাচার্য্য, ভূষণচন্দ্র-মণ্ডল, কৃষ্ণপদ বেরা (নন্দীগ্রাম), রজনী কান্ত মাইতি, পরেশ চন্দ্র দাস, অরবিন্দ মাইতি, ভূপেন্দ্রনাথ জানা।

তৃতীয় সারি—(বাম থেকে) : সর্ব্বশ্রী উপেন্দ্রনাথ প্রধান, বিনয় মহান্তি, বনবিহারী মহান্তি, ভোলানাথ বাগ, সুনীলকুমার পাত্র, অশ্বিনীকুমার পাত্র, হৃষীকেশচন্দ্র সাঁতরা পুলিনবিহারী মণ্ডল, বিহারীলাল সেন, পুঁটিরাম সিংহ, জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, হরিশচন্দ্র কর মহাপাত্র, বংকিমচন্দ্র দাস, নিরঞ্জন সাহু, ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক (জরারনগর) ব্রজেশ্বর মণ্ডল, শচীন্দ্রনাথ মাইতি।

চতুর্থ সারি—(বাম থেকে) : সর্ব্বশ্রী অঞ্জনকুমার পাখিরা, কুমেদ চরণ মণ্ডল, বিষ্ণুপদ সাহু, বটকৃষ্ণ মাইতি, সত্যগোপাল মুখার্জী, নবীনকুমার মহাপাত্র, রাধাকান্ত মাইতি, মতিলাল প্রামাণিক, গুণধর মাইতি, রমনীকান্ত প্রধান, পূর্ণচন্দ্র রথ, পঞ্চানন জানা, শশাঙ্কশেখর মান্না।

পঞ্চম সারি—(বাম থেকে) : সর্ব্বশ্রী দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, মতিলাল প্রধান, ভীমাচরণ পাড়ই, জিতেন্দ্রনাথ দাস, প্রফুল্লকুমার ভূঞ্যা, অমৃতলাল মান্না, হরিপদ মণ্ডল (কলেজিয়েট স্কুল), সূর্য্যকুমার মিশ্র, জগদীশচন্দ্র দাস, আশুতোষকুমার বাঁবুয়া (সবং), বাঁশরীলাল দত্ত, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়' রামচন্দ্র-দ্বিবেদি, শশাংকশেখর পাল, হরিপদ সামুই, গোষ্ঠবিহারী সেন, (অধ্যাপক)' রণেন্দ্রনাথ তলা।

পিছাবনি লবণকেন্দ্র ১৯৩০

কুমার চন্দ্র জানা।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

A) প্রাথমিক উপাদান (Primary Sources)

1) Unpublished Govt. Papers preserved in the State Archives, Kolkata

File No.	**Subject**
25/1906	The history of the organization against the Partition of Bengal.
25/1906	Supplementary Report anti-partition agitation.
No. File No./1908	Note on the Midnapore Revolutionary Conspiracy Case.
51/1909(13-20)	Midnapore Bomb Conspiracy Case.
51/1909(49-58)	Result of Midnapore Bomb Conspiracy Case.
L/2U 5/1921	Local Self Government.
Nos. 20-5/Dec 1921	Bengal Political Proceedings.

Weekly Reports

IB/CID. Bengal, B.N.Sasmal of Midnapore, 23 July, 1913, Page- 6

IB/CID. Bengal, S.P. Midnapore, Reports about proposed partitioned of Midnapore, 4 November, 1914, p. 7

IB/CID. Bengal, Boycott Movement occurred particularly of foreign goods, govt. offices, Dec 1921, pp. 4-5

IB/CID. Bengal, Boycott of foreign cloth in Midnapore, 22 February 1923, p. 5

IB/CID. Bengal, Boycott of British goods in Khejuri, Midnapore District, 4 October 1923, p. 3

2) Unpublished Govt. Papers preserved in the National Archives, New Delhi

File No.	Subject
248/1930	Disturbances in the district of Midnapore.
200/5/1930	Report of the Enquiry Committee into the incident that took place in Contai in the district of Midnapore.

3) Govt. Publications:

1. *1921 Movement: Reminiscences*, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, 1971.

2. *India in 1924-25*, Govt. of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1926.

3. *India in 1929-30*, Govt. of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1931.

4. *India in 1930-31*, Govt. of India, Central Publication Branch, Calcutta, 1932.

5. *Report on the Administration of Bengal 1920-21*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1922.

6. *Report on the Administration of Bengal 1924-25*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1926.

7. *The Calcutta Gazette*, Government of Bengal, Legislative Department, 1935.

4) Govt. Legislative Assembly Report (Proceedings):

Council Proceedings (Official Report): Bengal Legislative Council, Eighth Session, 1922, Vol. VIII, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1922.

Council Proceedings (Official Report): Bengal Legislative Council, Fourteenth Session, 1924, Vol. XIV-No. 1, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1924.

Council Proceedings (Official Report): Bengal Legislative Council, Fourteenth Session, 1924, Vol. XIV-No. 5, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1924.

Council Proceedings (Official Report): Bengal Legislative Council, Eighteenth, 1925, Vol. XVIII, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1925.

Council Proceedings (Official Report): Bengal Legislative Council, Twenty Eighth Session, 1928, Vol. XXVIII-No. 1, Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot., 1928.

5) Published:

Chatterjee, Pranab Kumar(ed.), *Midnapore's Tryst with Struggle*, The State Archives of West Bengal, Higher Education Dept., Govt. of W.B, Kolkata, 2004.

Chattopadhyay, Basudeb, *Bengal Partitioned*, The State Archives of West Bengal, Higher Education Dept., Govt. of W.B, Kolkata, 2007.

Beverley, H,*Report on the Census of Bengal 1872*, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1872.

Census of India- 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951

Hunter, W.W.,*A Statistical Account of the District of Midnapore*, W.B. District Gazetteers, Government of West Bengal, Kolkata, 1997.

Hunter, W.W.,*Statistical Account of Bengal*, 20 vols. , reprint ed., New Delhi, D.K. Publishing House, 1974.

Hutton, J.H.,*Caste in India: Its Nature, function and Origin*, London, Oxford University Press, 1946.

Mitra, A.K,*The Tribes and Castes of West Bengal*, Alipore, West Bengal Government Press, 1953.

O'Malley, L. S. S.,*Bengal District Gazetteers*, W.B. District Gazetteers, Government of West Bengal, Kolkata, 1995.

Risley, H. H.,*The Tribes and Castes of Bengal*, 2 Vols, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1891.

------------,*The People of India*, Calcutta &Simla, Thacker Spink and Co., 1915.

Tramlipta Jatiya Sarkar Records, Smritisoudha Library, Nimtouri, Purba Medinipur.

Tailor, James, 'A sketch of the Topography and statistics of Dacca' Calcutta, G.H. Huttman, Military Orphan Press, 1840.

Wise, James, *Notes on the Races, Castes, and Trades of Eastern Bengal*, Not Published, London, Harrison and Sons, 1883.

Zaidi, A.M. & Zaidi, S.G. (ed): *The Encyclopaedia of the Indian National Congress: The Battle for Swaraj*, Volume Ten: 1930-1935, New Delhi, S. Chand & Company Ltd, 1980.

আত্মজীবনী (Autobiography):

শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ, *স্রোতের তৃণ*, মেদিনীপুর: গোপীনাথ ভারতী, ১৩২৯ সন (১৯২২)

ধাড়া সুশীল, *প্রবাহ*, তিন খণ্ডে, মেদিনীপুর ইতিহাস সংগ্রাম সমিতি, স্মৃতিসৌধ: দে বুক স্টোর, ১৯৮১

সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা (Journals & Newspapers):

আনন্দবাজার পত্রিকা

বর্তমান পত্রিকা

বিপ্লবী (১৯৪২-১৯৪৪)

দৈনিক স্টেটসম্যান

হিজলী হিতৈষী

মাহিষ্য মহিলা পত্রিকা

মাহিষ্য সমাজ পত্রিকা

মাসিক বসুমতী

মেদিনী বান্ধব (১৮৯৮-১৯১৪)

মেদিনীপুর হিতৈষী

নীহার (১৯০১-৪৭)

সত্যাগ্রহ সংবাদ

স্বদেশী বান্ধব (১৯০৭-১৯০৮)

স্বাধীন ভারত (কাঁথি মহকুমা)

তমালিকা (১৯০৩-১৯০৮)

Amrita Bazar Patrika

Economic & Political Weekly

Telegraph

কৈবর্ত/মাহিষ্য জাতি বিষয়ক আকর গ্রন্থ

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, 'সোশ্যাল মোবিলিটি অ্যান্ড দ্য ডায়নামিক্স অফ কাস্ট; দ্য মাহিষ্যস অফ সাউথ-ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল', অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি থিসিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৬

সহায়ক উপাদান (Secondary Sources):

ইংরেজি গ্রন্থ

Ali, Syed Rashed, *Midnapore District: Company, Raiyats and Zamindars 1760-1885,* Kolkata: K.P.Bagchi & Co., 2008

Baily, H.V., *Memoranda of Midnapore, 1852,* Kolkata: Minapore Itihas Rachana Samiti, 1988

Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Politics and the Raj: Bengal 1872-1937,* Kolkata: K.P.Bagchi & Co., 1990.

-----------, *Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namusudras of Bengal 1872-1947*, Surrey: Curzon press, 1997.

-----------, *Changing Borders, Shifting Loyalties, Religion, Caste and The Partition of The Bengal in 1947,* Wellington: Asian Studies Institute, Victoria University, 1998.

------------, *Caste, Culture and Hegemony: Social Domination in Colonial Bengal,* New Delhi: Sage Publications, 2004.

Barman, Rup Kumar, 'Caste Identity Formation: Mobility and Elite Leadership', in B.K.Saha (ed), *Wealth and Welfare*, Kolkata, Academic Enterprise, 2005.

------------, *Fisheries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Postcolonial West Bengal,* Delhi: Abhijeet Publications, 2008.

-------------, 'Caste and Class Awareness among the Dalits', *Voice of Dalits,* Vol.1, No 1(Jan-June 2008).

-------------, 'Caste Violence in India', *Voice of Dalit,* Vol. 3, No 2 (July-December, 2010).

Basu, Sajal(ed.), *Satyagraha as Movement,* Kolkata: Sujan Publications, 2007.

Basu, Swaraj, *Dynamics of Caste Movement: The Rajbanshis of North Bengal: A study of Caste Movement 1910-1947,* New Delhi: Monohar, 2002.

Beteille, Andre, *Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village,* California: University of California Press, 1965.

-----------, *Castes: Old and New, Essays in Social Structure and Social Stratification,* Asia Publishing House, 1969.

Bayly, Susan, *Caste, Society and Politics in India: From the Eighteenth Century to Modern Age,* Cambridge : Cambridge University Press, 1999.

Bhakta, Bangabhusan, *Garam Dal,* Bakpratima, Mahisadal, Midnapore: 1999.

Bhattacharyya, Buddhadev, *Satyagrahas in Bengal 1921-39,* Kolkata: Minerva Associates Pvt. Ltd., 1977.

Bhattacharya, Jogendranath, *The Hindu Castes and Sects: an exposition of the origin of the Hindu caste system and the bearing of the sects towards each other and towards other religious systems*, Kolkata: Firma KLM, 1968.

Bhattacharya, Sabyasachi and Yagati, Chinna Rao (ed.), *The Past of the Outcaste: Reading in Dalit History*, New Delhi: Oriend Blakswan, 2016.

Bhattacharyya, Sukanta, 'Caste, Class and Politics in West Bengal: Case Study of a Village in Burdwan', in *Economic and Political Weekly,* January 18, 2013.

Bhoumik, Manoranjan, *History, Culture and Antiquities of Tramlipta,* Kolkata: 2001.

Bose, Nirmal Kumar, 'The Hindu Method of Tribal Absorption', *Science and Culture, Vol. VII, .No. 4,* 1941.

Chakraborty, Bidyut(Tr. & ed.), *Biplabi: A Journal of the 1942 Open Rebellion*, Kolkata: K.P.Bagchi & Co., 2002.

Chakraborty, Bidyut, *Local Politics and Indian Nationalism: Midnapore 1919-1944,* New Delhi: Manohar, 1997.

Chakravorty Spivak, Gayatri, Subaltern Studies: Deconstructing Historiography, in Ranajit Guha (ed), *Subalterns Studies IV: Writing on South Asian History and Society*, New Delhi: Oxford University Press, 1985.

-------------, Can a Subaltern Speak? In C. Nelson and L. Grossbir (eds): *Marxism and the Interpretation of Culture*, Basingstone: Macmillan Education, 1988.

Chandra, Bipan & Others, *India's Struggle for Independence 1857-1947,* New Delhi: Penguin Books, 1989.

Chandra, Bipan; Mukherjee, Aditya and Mukherjee, Mridula, *India after Independence-1947-2000*, New Delhi, Penguin Books, 1999.

Chandra, Bipan; Tripathi, Amalesh & De, Barun, *Freedom Struggle,* New Delhi: National Book Trust, 1977.

Chatterjee, Biswajit and Chatterjee, Debi (eds), *Dalit Lives and Dalit Vision in Eastern India*, Kolkata: Centre for A Rural Resource and Centre for Ambedkar Studies, Jadavpur University, 2007.

Chatterjee, Debi, *Ideas and Movements in Caste in India: Ancient to Modern Times*, Delhi: Abhijeet Publications, 2010.

------------, ‘Dalit Situation in India Since the 1990’s: An Examination of certain Issues and trends’, *Socialist perspective, Vol. 33, No. 1.2,* June-September, 2005.

Chatterjee, Gouripada, *Midnapore: The forerunner of India’s Freedom Struggle,* Delhi: Mittal Publications, 2010.

Chatterji, Joya, *Bengal Divided: Hindu communalism and partitions 1932-1947*, Cambridge University Press, 1995, First paperback Indian edition, New Delhi Foundation Books, 1996.

------------, *The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Chatterjee, Partha, *Bengal 1920-1947: The Land Question*, Kolkata: K P Bagchi and Co., 1984.

-------------, *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, Delhi: Oxford University Press, 1997.

------------, ‘Caste and Subaltern Consciousness’, in Guha, Ranajit (ed): *Subalterns Studies VI: Writing on South Asian History and Society*, Delhi: Oxford University Press, 1989.

-----------, ‘Historicising Caste in Bengal’ in *Economic and Political Weekly, Vol. XLVII No. 50*, December 15, 2012.

Chattopadhyay, Gautam, *Bengal Electoral Politics and Freedom Struggle 1862-1947,* Delhi: Indian Historical Studies, 1984.

Das, Basanta Kumar, *A Short History of the August Movement in the Contai Sub-division,* Contai, Midnapur: 1963.

Das, Basanta Kumar, *Swadhinata Sangrame Medinipur*, Vol. I & II, Kolkata: Medinipur Swadhinata Sangram Itihas Samiti, 1980, 1984.

Das, Binod Sankar, *Changing Profile of Frontier Bengal*, Delhi: Mittal Publications, 1984.

Das, Narendra Nath, *Midnapore (1905-1919): From Partition of Bengal to Jallianwalabag Tragendy*, Midnapur: Medinipur Itihas Rachana Samiti, 1963.

Desai, A. R., *Social Background of Indian Nationalism*, Bombay: Popular Prakashan, 1948.

Dirks, Nicholas B, *Castes of Mind, Colonialism and the Making of Modern India*, Delhi: Permanent Black, 2001.

Dutt, Nirmal Kumar, *Origin and Growth of Caste in India*, Kolkata: Firma KL M Pvt. Ltd., 1969.

Ghosh, D.K. and Ghosh, Sukla, *Legends of Origin of the Castes and Tribes of Eastern India*, Kolkata: Firm KLM, Pvt. Ltd., 2000.

Ghosh, Niranjan, *Role of Women in the Freedom Movement in Bengal 1919-47*, Kolkata: 1988.

Ghurye, G.S., *Caste and Race in India, London*, Kegan Paul, 1932, reprint edition; Mumbai: Popular Prakashan, 1969.

Guha, B. S., *The Racial Affinities of the People of India*, Delhi: Manager of Publications, 1935.

Guha, Sumit, *Beyond Caste: Identity and Power in South Asia, Past and Present*, Leiden, Brill's Indological Library, 2013.

Gupta, Dipanakar (ed), *Social Stratification*, New Delhi: OUP, 1992.

Jana, Anil Kumar, *Quit India Movement – A Study of Contai Sub-division*, Delhi: Indian Publishers and Distributors, 2016.

Maheshwari, Shriram, *The Mandal Commission and Mandalisation: A Critique*, New Delhi: Concept Publishing Company, 1991.

Maity, Sachindra Kumar, *Freedom Movement in Midnapore, Vol. I,* Kolkata: Firma KLM, 1975.

Majumdar, Debabrata, 'The Hijli Shooting Episode (1931): A Case Study' *Bengal Past and Present,* July-December, 1963.

Majumdar, R.C., *History of the Freedom Movement in India, Vol.I,* Kolkata: Firma KLM, 1963.

Mondal, Swadeshranjan, *The Cracked Portrait of a Patriot: Deshapran Birendranath Sasmal(1881-1934),* Kolkata: Institute of Historical Studies, 2012.

Omvedt, Gail, *Dalits and the Democratic Revolution in India: Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India,* New Delhi: Sage, 1994.

------------, *Dalit Visions: The Anti-caste Movement and the Construction of an Indian Identity*, New Delhi: Orient Longman, 1995.

Pal, Rina, *Women of Midnapore in the Freedom Movement*, Kolkata: Ratna Prakashan, 1996.
Ray, Rajat Kanta, *Social Conflict and Political Unrest in Bengal 1875-1927,* Delhi: OUP, 1984.
Roy, Amarendra, *Students Fight for Freedom*, Kolkata: Anandabazar Patrika Office, 1967
Samanta, Satish and Others, *August Revolution and Two Years National Government in Midnapore, Part. I*(Tamluk), Kolkata: 1946.
Sanyal, Hitesh Ranjan, *Social Mobility in Bengal*, Kolkata: Papyrus, 1981.
Sarkar, Sumit, *Modern India,* New Delhi: Macmillan and Co., 1983.
Sarkar, Sumit, *Popular Movements and Middle Class Leadership in Late Colonial India: Perspective and Problems from a History from Below,* Kolkata: K P Bagchi and Co., 1984.
Sarkar, Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903-08,* New Delhi: People's Pub. House, 1973.
Sarkar, Sumit and Sarkar, Tanika, *Caste in Modern India, Vol. 1 & 2*, New Delhi: Permanent Black, 2014.
Sarkar, Tanika, *Bengal: The Politics of Protest, 1928-1934*, New Delhi: OUP, 1990.
Sen, Ranjit and Sen, Snigdha, *Caste, Class and the Raj*, Kolkata: Progressive Publishers, 2000.
Sen, Sunil, *Agrarian Struggle in Bengal 1946-47*, New Delhi: People's Pub. House, 1972.
Singh, Anita Inder, *The Origins of the Partition of India 1936-1947,* Delhi: OUP, 1987.
Singh, Ekta, *Caste System in India: A Historical Perspective,* Delhi: Kalpaz Publications, 2005.
Singh, Yogendra, *Social Stratification and Change in India*, New Delhi: 1977.
Srinivas, M.N., *Social Change in Modern India, Berkeley*, University of California Press, 1966, reprint edition, Delhi: Allied Publishers, 1967.
Yagati, Chinna Rao, *Dalit Studies: A Bibliographical Handbook*, New Delhi: Kanishka Publishers, Distributors, 2003

বাংলা গ্রন্থ

আহমদ, আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ১৯৬৯

কবিরাজ, নরহরি, *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,* কলকাতা: মণীষা গ্রন্থালয়, ১৯৯৯

কবিরাজ, নরহরি, *উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ, তর্ক ও বিতর্ক,* কলকাতা: কে পি বাগচি, ১৯৮৪

কানুনগো, হেমচন্দ্র, *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা,* কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪

কুণ্ডু, কমল কুমার, *জেলা মেদিনীপুর : স্বাধীনতার আন্দোলন,* তমলুক: দীপশ্রী প্রকাশন, ২০০১

গায়েন, হৃষীকেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভগবানপুর থানা,* কলকাতা: ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ

গোস্বামী, গোপীনন্দন, *বাংলার হলদিঘাট তমলুক,* মেদিনীপুর: ১৯৭৭

গুহ, নলিনী কিশোর, *বাংলার বিপ্লববাদ,* কলকাতা: মিত্রম, ২০০২

গুহ, রণজিৎ, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত,* কলকাতা: তালপাতা, ২০১০

গুপ্ত, রঞ্জন, *রাঢ় বঙ্গের জীবনযাপন : সমাজ, অর্থনীতি ও গণঅভ্যুত্থান,* কলকাতা: নিউ র‍্যাডিক্যাল পাবলিকেশন, ২০১৭

গুপ্ত, সমুদ্র, *বঙ্গ ভঙ্গ,* কলকাতা: আনন্দধারা, ১৯৬৮

ঘোষ, বারিদবরণ, *অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম,* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,* কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৭৮

ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, খণ্ড ৪,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮৩

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০০৭

ঘোষ, বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ,* নিউ দিল্লি: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৮

ঘোষ, সুনীতি কুমার, *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি রাজনীতি,* কলকাতা: নিউ হরাইজন বুক স্টল, ২০০১

চক্রবর্তী, শ্রুতিনাথ, *বিংশ শতকের তমলুক,* তমলুক: ১৩৮২ বঙ্গাব্দ

চক্রবর্তী, রথীন, *মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদপত্রের জন্মান্তর,* কলকাতা: নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, ২০০৯

চক্রবর্তী, দীপেশ, *ইতিহাসের জনজীবন এবং অন্যান্য প্রবন্ধ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১

চক্রবর্তী, সুধীর, *বালাহাড়ী সম্প্রদায় ও তাদের গান,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬

চক্রবর্তী, সুধীর, *বাংলার গৌণ ধর্ম সাহেব ধনী ও বালাহাড়ী,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬

চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *বাঙালির ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০২

চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬

চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *চৈতন্যের ধর্মান্দোলন: মূল্যায়ন,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫

চন্দ্র, অমিতাভ, *অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২

চ্যাটার্জী, জয়া, *বাংলা ভাগ হোল : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশভাগ ১৯৩২-১৯৪৭,* কলকাতা: এল. আলমা. পাবলিকেশনস, ২০০৩

চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র, *বাঙালির ধর্ম ও সমাজ: আদি মধ্যযুগ (১২০০-১৫০০),* কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৯৯

চট্টোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, *উনবিংশ শতাব্দীর সভা সমিতি ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৯৮৫

চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব, *বঙ্গভঙ্গের পূর্বাপর,* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব, *বাংলায় বিপ্লববাদের পালাবদল,* কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২

চট্টোপাধ্যায়, গৌরীপদ, *দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, খণ্ড ২,* মানিকপুর, মেদিনীপুর: ১৯৮৮

চট্টোপাধ্যায়, গৌতম, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ,* কলকাতা: ১৯৭৭

চট্টোপাধ্যায়, গৌতম(সম্পা.), *ভারত ছাড়ো আন্দোলন: বিপ্লবীদের মুখোমুখী,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০২

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *ইতিহাসের উত্তরাধিকার,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *জনপ্রতিনিধি,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি, *বাঙালি সংস্কৃতি,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ২০০৪

চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, *ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার কৃষি ইতিহাস,* কলকাতা: কে.পি.বাগচি, ২০০১

চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা ও গ্রন্থপঞ্জী,* নদীয়া: নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ২০০৮

চৌধুরী, কমল(সম্পা.), *বাংলার ইতিহাস: প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬

চৌধুরী, কমল, *মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথম পর্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮

চৌধুরী, রাধারমণ, *বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি: খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ,* বাঁকুড়া: গ্রন্থকার, ২০০২

চৌধুরী, নীরদচন্দ্র, *আত্মঘাতী বাঙালি,* কলকাতা: মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৯৮৮

জানা, যুধিষ্ঠির, *বৃহত্তর তমলুকের ইতিহাস,*কলকাতা: ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, *সংগ্রামী পুরুষ কুমারচন্দ্র,* তমলুক, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ১৯৮৪

তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, *স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনপঞ্জী,* পার্বতীপুর, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ১৯৮৭

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতার মুখ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩

ত্রিপাঠী, প্রসন্ন কুমার, বেরা, শ্যামাচরণ এবং দাসঅধিকারী, রাধানাথ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে পটাশপুর, খণ্ড ২,* প্রতাপদিঘী, মেদিনীপুর: পটাশপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৮৮

দত্ত, ভবতোষ, *বাঙালির মানব ধর্ম,* কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০০০

দাস, বনবিহারী (সম্পা.), *স্রোতের তৃণ,* কলকাতা: দেশপ্রাণ স্মৃতিরক্ষা সমিতি, ১৯৭২

দাস, বাণী, *মুক্তিসংগ্রামের অগ্রদূত,* কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৭

দাস, বসন্ত কুমার, *মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রাম- খেজুরি থানা,* আজানবাড়ী, মেদিনীপুর: ১৯৭৫

দাস, বসন্ত কুমার, *স্বাধীনতার সংগ্রামে মেদিনীপুর, খণ্ড ১,২,* মেদিনীপুর: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম সমিতি, ১৯৮০,১৯৮৪

দাস, চিত্তরঞ্জন, *মেদিনীপুরের বৈপ্লবিক ইতিহাস,* মেদিনীপুর: মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৬৭

দাস, ধীরেন্দ্রনাথ, *মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* মেদিনীপুর: শ্রীগুরু পুস্তকালয়, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ

দাস, হরিসাধন, *মেদিনীপুর দর্পণ,* মেদিনীপুর: ১৪০১ বঙ্গাব্দ

দাস, হরিসাধন, *মেদিনীপুর ও স্বাধীনতা,* মেদিনীপুর: ১৯৯৭

দাস, কানাইলাল, *বঙ্গভঙ্গ সংগ্রামে অখণ্ড মেদিনীপুর দর্পণ,* কলকাতা: অরুণিমা প্রকাশনী, ২০০৫

দাস, কানাইলাল, *দেবদেবীর পীঠস্থান মন্দিরময় নন্দীগ্রাম,* কলকাতা: জয়ন্ত শী, ২০০৫

দাস, ক্ষুদিরাম, *কবিকঙ্কন চণ্ডী,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৭

দাস, মন্মথ নাথ, *পটাশপুরের সেকাল-একাল,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩

দাস, মন্মথ নাথ, *প্রসঙ্গ : কাঁথি,* পূর্ব মেদিনীপুর: কাঁথি সাহিত্য পরিষদ, ২০০৩

দাস, নরেশ চন্দ্র, *নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ,* কলকাতা: দীপালি বুক হাউস, ১৯৯৭

দাস, পূর্ণ চন্দ্র, *কাঁথির লোকাচার,* কলকাতা: ১৯৫৮

দাস, সুস্নাত, *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম,* কলকাতা: নক্ষত্র প্রকাশন, ২০০২

দাস, সুস্নাত, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,* কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০৪

দাস, বিমল, *পেডি নিধন ও ভিলিয়াসের উপর আক্রমণ,* কলকাতা: স্টর্মিং অফ রায়টার্স বিল্ডিং ফ্রিডম জুবিলি সেলিব্রেশন কমিটি, ১৯৮০

দাসগুপ্ত, সতীশ চন্দ্র, *খাদি ও চরকার কাঁথা,* কলকাতা: গান্ধী সেন্টেনারি কমিটি, ১৯৬৯

দাসগুপ্ত, সত্যজিৎ(সম্পা), *মুখের কথায় ইতিহাস,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯৭

দত্ত, সত্যব্রত, *বাংলার বিধানসভা ও সংসদীয় রাজনীতি: ১৮৬২-১৯৫১: অধীনতা, সহযোগিতা, সংঘাত,* কলকাতা: বুক সিন্ডিকেট, ১৯৯৫

দে, অমলেন্দু, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১

দে, অমলেন্দু, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' (১৯০৬-১৯০৮) পত্রিকার অবদান,* কলকাতা: রিডার্স সার্ভিস, ২০০২

দে, অমলেন্দু, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাঙালি বুদ্ধিজীবী,* কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৮১

দে, অমলেন্দু, *পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক,* কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭২

দে, অমলেন্দু, *স্বাধীন বাংলাভূমি গঠনের পরিকল্পনা: প্রয়াস ও পরিণতি,* কলকাতা: ১৯৮৫

দে, বরুণ(সম্পা.), *মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্র সমাজ,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯২

দে, রাখাল চন্দ্র, *বন্দীর জীবন স্মরণিকা,* জলপাইগুড়ি: ১৯৭৪

ধর, ইরা এবং সামন্ত সুরতন, *অগ্নিযুগের দুই সৈনিক শহীদ প্রদ্যোত কুমার ও বিপ্লবী প্রভাতাংশু শেখর,* কলকাতা: ১৯৯৬

ধাড়া, সুশীল কুমার, *প্রবাহ, খণ্ড ১,* মহিষাদল, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ১৯৯০

নন্দী, অজয় কুমার, *অগ্নিহোত্রী : বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামী চরিতকথা,* কলকাতা: অশোক ভট্টাচার্য, ১৯৯৭

পাকড়াশী, সতীশ, *অগ্নিযুগের কথা,* কলকাতা: ১৯৭১

পাল, রাসবিহারী এবং মাইতি হরিপদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর, খণ্ড ৩,* কাঁথি, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ১৯৯২

পাল, প্রমথ নাথ, *দেশপ্রাণ শাসমল,* কাঁথি, মেদিনীপুর: ১৯৩৮, পুনর্মুদ্রণ ২০০৫

পালিত, চিত্তব্রত, *বিজ্ঞানের আলোকে ঔপনিবেশিক বাংলা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫

পালিত, চিত্তব্রত, *ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজচিত্র,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, *গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্মাননা গ্রন্থ: ইতিহাস চর্চার ধারা,* কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫

প্রামাণিক, প্রহ্লাদ কুমার, *দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

প্রামাণিক, প্রহ্লাদ কুমার, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোং, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

বদরউদ্দিন, উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক,* ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭৪

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সারথি, *আজকের পশ্চিমবঙ্গ : ক্ষমতার রাজনীতি জনতার রাজনীতি,* কলকাতা: অনীক, ২০০৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত, *উনিশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *অগ্নিযুগের বাংলায় বিপ্লবী মানস,* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৩

বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দলিতের পুরাণকথা,* কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৭

বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, *পলাশি থেকে পার্টিশন,* কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল কুমার, *বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ ও নবজাগরণ,* কলকাতা: পিরামিড প্রকাশনী, ১৯৮৬

বাড়ী, রাধাকৃষ্ণ, *তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* নিমতৌড়ী, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০০০

বাড়ী, রাধাকৃষ্ণ, *ফিরে দেখা,* কুলবেড়িয়া, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৬

বাড়ী, সুকুমার (সম্পা.) *অজেয় পুরুষ অজয় কুমার,* নিমতৌড়ী, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর তাম্রলিপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ১৯৯০

বর্মণ, ব্রজবিহারী, *ক্ষুদিরাম,* কলকাতা: বর্মণ পাবলিশিং হাউস, ১৯৪৭

বসু, অতুল, *মেদিনিপুরে বোমা ও পিস্তল,* বাড়ী, কলকাতা: ওরিয়েন্ট প্রেস প্রা. লি. ১৯৬৩

বসু, যোগেশ চন্দ্র, *মেদিনিপুরের ইতিহাস,* খণ্ড ১, কলকাতা: কালিকা প্রেস প্রা. লি., ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

বসু, প্রবোধ কুমার, *ভগবানপুরের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: ১৯৭৬

বসু, শ্যামাপ্রসাদ, *সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ : মেদিনীপুর ও মানভূম (১৯০০-১৯৪৭),* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩

বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস,* কলকাতা: অনুপ কুমার মাহিন্দার, ১৯৮৫

বসু, স্বপন, *গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৪

বিশ্বাস, মনোশান্ত, *বাংলার মতুয়া আন্দোলন: সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি,* কলকাতা: সেতু প্রকাশনী, ২০১৬

বিশ্বাস, সত্যরঞ্জন, *মাহিষ্য আন্দোলনের ইতিহাস,* কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ

বোস, নির্মল কুমার, *হিন্দু সমাজের গড়ন,* শান্তিনিকেতন: বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ১৯৪৯

ব্রহ্মচারী, বঙ্কিম, *মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী: সুতাহাটা থানা, খণ্ড ১,* চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর: ১৯৮৮

ভদ্র, গৌতম ও চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, *নিম্ন বর্গের ইতিহাস,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮

ভক্ত, বঙ্গভূষণ, *নন্দীগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রাম,* গোপালপুর, মেদিনীপুর : ১৯৮৯

ভারতী, সেবানন্দ, *তমলুকের ইতিহাস,* কলকাতা: ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

ভট্টাচার্য, নির্মল চন্দ্র, *বিস্মৃত বাংলা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৯

ভট্টাচার্য, সব্যসাচী, *বাংলায় সন্ধিক্ষণ ১৯২০-৪৭,* দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪

ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, *পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের ধারা,* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯১

ভট্টাচার্য, জয়ন্ত, *পশ্চিমবঙ্গ : জমির আন্দোলন ও ভূমি সংস্কার,* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৩

ভট্টাচার্য, তারাশংকর, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর,* কলকাতা: ১৯৭৩

ভট্টাচার্য, তরুণদেব, *পশ্চিমবঙ্গ দর্শন: মেদিনীপুর,* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম, ২০০১

ভৌমিক, শ্যামাপদ, *বৈচিত্রময় মেদিনীপুরের ইতিহাস, খণ্ড ১,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯

মজুমদার, কমল, *বাঙালির ইতিহাস,* কলকাতা: দ্য অথর, ১৯৭৬

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস, খণ্ড ৪,* কলকাতা: ১৯৮২

মণ্ডল, মনন কুমার, *পার্টিশান সাহিত্য: দেশ, কাল, স্মৃতি,* কলকাতা: গাংচিল, ২০১৪

মণ্ডল, চিত্ত, এবং মণ্ডল প্রথমা (সম্পা.), *পাবাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: বিজয় কৃষ্ণ দাস, ২০০৩

মণ্ডল, শশাঙ্ক, *বাংলার লবণ শিল্প,* কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০৩

মহাপাত্র, গৌরীশংকর, *কালের নিরীখে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ,* কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর: ২০০৩

মহাপাত্র, রাজর্ষি(সম্পা.), *অনন্য দেশসেবক অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়,* কুলবেড়িয়া, মেদিনীপুর: তাম্রলিপ্ত জনকল্যাণ সমিতি, ২০১৬

মহাপাত্র, রাজর্ষি, *মধ্যযুগের মেদিনীপুর,* ঘাটাল, মেদিনীপুর: সৃজন প্রকাশন, ২০২১

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, *ভারতের আদিবাসী ও দলিত সমাজ,* কলকাতা: পূর্বালোক পাবলিকেশন, ১৯৯৫

মাইতি, শংকরদেব, *ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও পূর্ব মেদিনীপুর,* কলকাতা: লাকি পাবলিশার্স, ২০১৬

মাইতি, হরিপদ এবং দাস, মন্মথ নাথ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস: ভগবানপুর থানা,* মেদিনীপুর: ১৯৮৮

মাইতি, হরিপদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস: ময়না থানা,* মেদিনীপুর: মেদিনীপুর ইতিহাস রচনা সমিতি, ১৯৮৬

মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, *অনন্য মেদিনীপুর,* কলকাতা: কল্লোল, ২০০১

মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, *বিয়াল্লিশের তমলুক ও তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার,* তমলুক: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৮১

মাইতি, প্রদ্যোত কুমার, *তমলুকের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সতীশ চন্দ্র,* তমলুক: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৭৩

মিত্র, আশোক, *পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা,* কলকাতা: অনু প্রেস, ১৯৬৮

মিত্র, মঞ্জুশ্রী, *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বিপ্লবী সমাজ,* কলকাতা: টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৯

মিত্র, সুকুমার, *গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা,* কলকাতা: ফার্মা কে এল এম, ১৯৯৮

মুখার্জী, যাদুগোপাল, *বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি,* কলকাতা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৮২

মুখোপাধ্যায়, অজয় কুমার, *বিয়াল্লিশের স্মৃতি থেকে,* তমলুক: তমলুক ক্লাব সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৭৩

মুখোপাধ্যায়, অমল কুমার, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ১৯৪৭-১৯৯৭,* কলকাতা: এ মুখার্জী এণ্ড কোং, ১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, *জাতিভেদপ্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ,* কলকাতা: কে পি বাগচি, ১৯৮১

মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, *উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি,* কলকাতা: ১৯৭১

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, *বঙ্গ বাঙ্গালা ও ভারত,* কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০০

মুখোপাধ্যায়, গোরাচাঁদ, *বাংলাদেশের কাহিনী,* কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭৬

মুখোপাধ্যায়, হরিদাস এবং মুখোপাধ্যায়, উমা, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

রক্ষিত রায়, ভূপেন্দ্র কিশোর, *ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব,* কলকাতা: রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ১৯৭০

রণদিভে, বি. টি., *জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক,* কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৯২

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩

রায়, সুপ্রকাশ, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,* কলকাতা: র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৯৭২

শাসমল, বিমলানন্দ, *স্বাধীনতার ফাঁকি,* কলকাতা: পুঁথি, ১৯৬৯

শাসমল, বীরেন্দ্রনাথ, *স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস,* কলকাতা: গোপীনাথ ভারতী, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

শীট, বিমল কুমার, *দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন,* কলকাতা: অর্পিতা প্রকাশনী, ২০০৯

শীট, বিমল কুমার, *হেমচন্দ্র কানুনগো: একটি জীবনালেখ্য,* কলকাতা: অর্পিতা প্রকাশনী, ২০১৩

সমাদ্দার, রঞ্জিত কুমার, *বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহ,* কলকাতা: ১৯৮২

সমাদ্দার, রঞ্জিত কুমার, *বাংলার গণসংগ্রামের পটভূমিকা,* কলকাতা: বি বি প্রকাশনী, ১৯৯১

সরকার, গোপাল চন্দ্র, *মাহিষ্য নামোদ্ধারের ইতিবৃত্ত,* কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ১৯২৮

সরকার, সুধীর চন্দ্র, *আমার দেশ, আমার কাল,* কলকাতা: ১৯৯৪

সরকার, তারক, *বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও দেশত্যাগ,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৯

সেন, গোপীনাথ, *মাস্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীর ভূমিকা,* কলকাতা: আদিবাসী কল্যাণ সমিতি, ১৯৭৫

সেন, প্রবোধ চন্দ্র, *বাংলার ইতিহাস সাধনা,* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২

সেন, রঞ্জিত (সম্পা.), *বাংলার সংস্কৃতি: আঠারো থেকে বিশ শতক,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮

সেন, রঞ্জিত, *বাংলাদেশের রাজস্ব শাসন: আঠারো শতক,* কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ২০০৬

সেন, সমর, *বাবু বৃত্তান্ত,* কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৭৮
সেন, সুনীল, *বাংলার কৃষক সংগ্রাম,* কলকাতা: চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ১৯৭৫
সামন্ত, অমিয় কুমার, *সংরক্ষণ ও মাহিষ্য সম্প্রদায়,* কলকাতা: বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি, ২০০৪
সামন্ত, অমিয় কুমার, *বিদ্যাসাগর ও ঔপনিবেশিক সমাজে বিদ্যাসাগরের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা,* কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪
সাহা, প্রভাত কুমার, *মধ্যযুগের ইতিহাসে সন্ধানে,* কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৮
সাহা রায়, রবিদাস, *বাংলার বারো ভুইঞা,* কলকাতা: শিবানি প্রকাশনী, ১৯৯৮
সাঁতরা, তারাপদ, *মেদিনীপুর: সংস্কৃতি ও মানবসমাজ,* হাওড়া: ১৯৮৭
সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, *স্বরাজের পথে,* কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৯৪
সান্যাল, হিতেশ রঞ্জন, *সামাজিক গতিময়তার ইতিহাস,* কলকাতা: বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০১৬
সিনহা, দীনেশচন্দ্র, *শ্যামাপ্রসাদ: বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ,* কলকাতা: গ্রন্থরশ্মি, ২০০০
সুর, অতুল, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস,* কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬
সুর, শ্যামলী, *ইতিহাসচিন্তার সূচনা ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, বাংলা ১৮৭০-১৯১২,* কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২
হালদার, গোপাল, *রূপনারায়ণের কূলে,* কলকাতা: পরিচয়, ১৯৮২
হালদার, জীবনতারা, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস,* কলকাতা: ১৯৭৭
হাসিম, আবুল, *আমার জীবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি,* ঢাকা: ১৯৭৮
হালদার, জীবনতারা, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস,* কলকাতা: সূত্রধর, ১৯৭৭
হোড়, সোমনাথ, *তেভাগার ডায়েরি,* কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯১

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঐতিহাসিক, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, কলকাতা

সুচন্দ্রা ঘোষ, ঐতিহাসিক, জুন, ২০১৭, কলকাতা

সুমিত সরকার, ঐতিহাসিক, আগস্ট ২০১৮, কলকাতা

রোমিলা থাপার, ঐতিহাসিক, মার্চ ২০১৮, কলকাতা

রজতকান্ত রায়, ঐতিহাসিক, আগস্ট ২০১৮, কলকাতা

রণবীর চক্রবর্তী, ঐতিহাসিক, এপ্রিল ২০১৮, কলকাতা

বিনয় ভূষণ চৌধুরী, ঐতিহাসিক, জানুয়ারি, ২০১৯, কলকাতা

Webliography

https://internetarchive.org

https://indianculture.gov.in/

http://socialjustice.nic.in

https://censusindia.gov.in/